‘পাঁচটি নভেলা’ বর্তমান সময়ের পাঁচজন লেখকের পাঁচটি উপন্যাসিকা। প্রেম-বিরহ, সমাজ-পরিপার্শ্ব বা কল্পবিজ্ঞানকে বিষয় করে বাংলা সাহিত্যে লেখালেখি কিছু কম হয়নি, সেদিক থেকে এই লেখাগুলোর বিষয় অভিনব কিছু নয়। তবু বর্তমান অস্থির সময়ের নিশ্চিত প্রাণলক্ষণ লেখাগুলোতে সুস্পষ্টভাবে বর্তমান। পাঁচজন লেখকের পেশা এবং পরিপার্শ্ব পৃথক হওয়ার কারণেই বিচিত্র উপাদানে লেখাগুলি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

আশা করা যায়, এই সময়ের লেখালেখি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে এ রকম আরও অনেক সংকলন ভবিষ্যতে সৃষ্টিসুখ থেকে প্রকাশিত হবে।

- রোহণ কুদ্দুস

উপন্যাসিকা সংকলন

পাঁচটি নভেলা

সম্পাদনাঃ রোহণ কুদ্দুস

প্রচ্ছদঃ রোহণ কুদ্দুস

একটি সৃষ্টিসুখ প্রয়াস

১৪৯ টাকা (ভারতীয় মুদ্রা)

১৪.৯৯ আমেরিকান ডলার

ISBN 978-163415469-7

পাঁচটি নভেলা

সম্পাদনাঃ রোহণ কুদ্দুস

সৃষ্টিসুখ

পাঁচটি নভেলা

সৈকত মুখোপাধ্যায়

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

মহুয়া মল্লিক

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

অভীক দত্ত

একটি সৃষ্টিসুখ প্রয়াস

www.sristisukh.com

প্রথম সংস্করণঃ জানুয়ারি, ২০১৫

সৃষ্টিসুখ প্রকাশন এলএলপি-র পক্ষে হাল্যান, বাগনান, হাওড়া ৭১১৩১২

থেকে রোহণ কুদ্দুস কর্তৃক প্রকাশিত

© সৃষ্টিসুখ প্রকাশন এল এল পি, ২০১৫

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 978-1-63415-469-7

প্রচ্ছদঃ রোহণ কুদ্দুস

মূল্যঃ ১৪৯ টাকা (ভারতীয় মুদ্রা) / ১৪.৯৯ আমেরিকান ডলার

সৃষ্টিসুখ-এর বইয়ের আউটলেটঃ ৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯ (৭৮২৯৭ ৪১৭৯৭)

মুদ্রকঃ সাইবার গ্রাফিক্স, ৩২/১ নৈনানপাড়া লেন, বরানগর, কলকাতা ৭০০০৩৬ (৯০৫১৪ ২৩০৭২)

বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ মেহদী হাসান খান, ওমিক্রন ল্যাব ও অভ্র কিবোর্ড ডেভালপমেন্ট টিম।

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রকম পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহার বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। আলোচনা বা সমালোচনার সুবিধার্থে বইটির কোনও বিশেষ অংশ উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সূচিপত্র

বেদনার রঙ	সৈকত মুখোপাধ্যায়	৫
শেষ বিচার	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য	৩৪
শূন্য গর্ভ	মহুয়া মল্লিক	৯৯
নিভৃতে যতনে	দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৯
শুরুয়াৎ	অভীক দত্ত	১৭১

বেদনার রঙ

সৈকত মুখোপাধ্যায়

এক

ঝিনুকের ফোনটা এসেছিল রবিবার দুপুর দুটো নাগাদ। গলাটা কেমন যেন ভারী ভারী। একটু চেপে কথা বলছিল, যেন অন্যদের লুকিয়ে। গাড়ির হর্নও শুনতে পাচ্ছিলাম। তার মানে কথা বলবার জন্যে ও ঘর থেকে ওদের এক চিলতে বারান্দাটায় বেরিয়ে এসেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার?"

ঝিনুক বলল, "বিকেলে সেন্ট্রাল পার্কে দেখা করতে পারবে? এই সাড়ে চারটে নাগাদ?"

অবাকই লাগল। ঝিনুকের বাড়িতে ওর আর আমার সম্পর্ক নিয়ে কোনও লুকোছাপা নেই। এই যে আমাকে সাড়ে চারটের সময় সেন্ট্রাল পার্কে দেখা করতে বলছে, এটা ও অনায়াসে ওর বাবা, মা বা দিদির সামনেই বলতে পারত। তাহলে?

তাছাড়া রোববারটা আমাদের দুজনেরই ছুটি থাকে বলে সন্ধেটা এমনিতেই আমরা একসঙ্গে সিটি সেন্টার বা অন্য কোনও মলে কাটাই। আজকেও সেরকমই ঠিক ছিল। সাতটা নাগাদ ওর সঙ্গে বেরোতাম। হঠাৎ সময়টা এগিয়েই বা দিল কেন?

জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার ঝিনুক? কোনও সমস্যা হয়েছে নাকি?"

একটু চুপ করে থেকে ঝিনুক বলল, "সেটা তোমার সঙ্গে দেখা হলে বলব। তুমি তাহলে সাড়ে চারটেয় সেন্ট্রাল পার্কে চলে এসো। রাখছি।"

ফোনটা হঠাৎ যেভাবে কেটে দিল, সেটাও ঝিনুকের পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

আমি আর ঝিনুক দুজনেই সল্টলেকে থাকি।

আমি এখানে এসেছি সবে দু বছর। আমার বাড়ি দুর্গাপুরে। পড়াশোনাও ওখানেই। দু বছর আগে সল্টলেকেরই তথ্যপ্রযুক্তি মহল্লায় মিকাডো সলিউশনস নামে একটি আই টি কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে এখানে চলে এসেছি। এখন সি কে ব্লকে একটা বাড়িতে আই টি সেক্টরেরই অন্য দুটো ছেলের সঙ্গে মেস করে থাকি। আমার সহবাসীদের নাম বিবেক দাশ আর মনীশ দেওয়ান। বিবেকের বাড়ি কটকে আর মনীশ

ইউ পি-র ছেলে। আমি বাঙালি। সব মিলিয়ে বাড়িটায় বেশ একটা কসমোপলিটান আবহাওয়া।

ঝিনুকের বাবার বেশ বয়স হয়েছে। দশ বছর আগে রিটায়ার করেছেন। তখনই সল্টলেকের পূর্বাচল হাউসিং-এ একটা ছোটো ফ্ল্যাট কিনে নিয়েছিলেন। তার আগেও ওরা অবশ্য বেশ কয়েক বছর ধরে সল্টলেকেরই বাসিন্দা ছিল। তখন ওরা থাকত সরকারি হাউসিং-এ। ওর বাবা সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমস্-এর অফিসার ছিলেন। আমার বাবাও তাই। অনেক বছর আগে দুজনে একসঙ্গে উত্তরবঙ্গের একটা শহরে পোস্টেড ছিলেন। বছর পনেরো আগে ঝিনুকের বাবা, মানে বিজয়জেঠু যখন আসানসোলে পোস্টেড ছিলেন, তখনও দুর্গাপুর থেকে বাবা ওদের কোয়ার্টারে গিয়েছেন কয়েকবার। একবার যেন আমিও গিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে। অনেকদিন আগের কথা, তাই খুব একটা নিশ্চিত নই এ ব্যাপারে। গিয়ে থাকলেও, তখনকার বারো বছরের বালিকা ঝিনুকের কথা কিছুই মনে ছিল না।

বাবা আর বিজয়জেঠুর সেই যোগাযোগটা চিঠি আর টেলিফোনের মাধ্যমে এখনও রয়ে গেছে। যখন প্রথম সল্টলেকে আসি, তখন বাবা-ই বলেছিলেন, "একবার বিজয়দার সঙ্গে দেখা করিস। উনিই তোর থাকার জায়গা টায়গার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।"

থাকার জায়গার ব্যবস্থা অবশ্য অফিস থেকেই হয়ে গিয়েছিল। তবে পিতৃবন্ধুর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগটা বন্ধ করিনি। আসলে ততদিনে আমি ঝিনুকের প্রেমে পড়ে গেছি।

ঝিনুক যে খুব সংজ্ঞা মেনে সুন্দরী তা নয়। হাইটটা তো বেশ কম। একটু চৌকো ছাঁদের মুখ। খুঁজলে এরকম আরও দু-চারটে খুঁত হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু ওকে যখন প্রথম দেখি, তখন ওসব আমার চোখেই পড়েনি। এখনও যে পড়ে, তা নয়। প্রথমদিনেই আমি দেখেছিলাম ওর ভীষণ মায়াবী দুটো চোখ, আর উজ্জ্বল হাসি। এখনও, এই দু বছর প্রেম করার পরেও, ঝিনুক সামনে এসে দাঁড়ালে আমার মনে হয় প্রচন্ড গরমের বিকেলে হঠাৎ একঝলক বৃষ্টি ভেজা হাওয়া এসে শরীরের সমস্ত তাপ শুষে নিল। ঝিনুক খুব ফরসা। ওর ত্বক এত পাতলা যে, অনেক জায়গায় সেই ত্বকের নীচে নীল শিরা দেখা যায়। বেশ কয়েক বছর আগে হিমালয়ের একটা গ্লেসিয়ারের পাশ দিয়ে ট্রেক করে যাচ্ছিলাম। তখন ছিল বসন্ত কাল। শীতের জমা বরফ গলতে শুরু করেছিল। দেখেছিলাম, প্রায় স্বচ্ছ বরফের চাদরের নীচ দিয়ে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি ঝর্নার নীলচে ধারা। ঝিনুকের হাতের পাতা কিংবা গলার নীচের নীল শিরাগুলো দেখলে আমার কেবলই সেই গ্লেসিয়ারটার কথা মনে পড়ে।

ঝিনুকের মনে সত্যি করেই খুব মায়া। সেটাই ওর চোখে ফুটে বেরোয়। ও যে আমাকে ভালোবেসেছে, তার শুরুটাও বোধ হয় ওই মায়া থেকেই। জানত তো, দিনের পর দিন রাস্তার ধারের ঝুপড়িতে চামড়ার মতো রুটি আর পেট-জ্বলা তড়কা খেয়ে থাকি।

আমার খাওয়া নিয়ে ঝিনুকের খুব চিন্তা। প্রায়ই আমার গালে গাল রেখে বলে, "আর একটু কষ্ট করো সোনা। বিয়েটা হয়ে গেলেই আমি তোমাকে বিউটিফুল সব ডিশ রেঁধে খাওয়াব।"

আমার সন্দেহ হয়। জিজ্ঞেস করি, "কী রকম বিউটিফুল?"

"হুঁউউউ... ধরো পেঁপের তরকারি, পাতলা করে মুসুরির ডাল, চারা মাছের ঝোল। আর শেষপাতে একটু টক দইয়ের ঘোল। দেখবে, রাম সিং-এর তড়কা খেয়ে খেয়ে লিভারে যে ফুটো-টুটো হয়েছে, ছ মাসের মধ্যে সব সেরে যাবে।"

আমি আতঙ্কিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলি, "জানো, আমার মা-ও আমাকে ওসব অখাদ্য কখনও খাওয়াতে পারেনি?"

ঝিনুক বজ্জাতের মতো হেসে বলে, "বিয়েটা হতে দাও। মা আর বউয়ের তফাতটা টের পাইয়ে দেব।"

ঝিনুকের দিদির নাম পলা। ওদের আর কোনও ভাই বোন নেই। ঝিনুকের মা আর পলার সঙ্গেও আমার খুব পটে গেল। ঝিনুকের বাবাও যে আমাকে অপছন্দ করেন তা নয়। তবে ভদ্রলোক ভারী পড়ুয়া মানুষ। আর আমরা যারা টেকনিক্যাল লাইনের ছেলেমেয়ে তাদের আবার বই পড়ার অভ্যেসটা কম। ফলে ওঁর সঙ্গে আমার ওয়েভলেংথ ম্যাচ করত না। এখনও ওদের বাড়ি গেলে একটু 'হাই হ্যালো' করে ওঁর সামনে থেকে কেটে পড়ি। কিন্তু ঝিনুকের মা আর ওর দিদি পলার সঙ্গে গল্প করতে বেশ লাগে। নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ে। সময়ের হিসেব থাকে না। অনেক সময় ওঁরাই বলেন, "যাও অনাবিল। ঝিনুক সেজেগুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু ঘুরে এসো।"

অমন সব দিনে বাইরে বেরিয়ে ঝিনুক মেজাজ দেখায়। বলে, "আমাকে আর দরকার কীসের? আমি যখন বাড়ি থাকি না, তখন এসে মায়ের সঙ্গে গল্প করে গেলেই পারো।"

কিন্তু বুঝতে পারি ওটা নেহাতই ছদ্মরাগ। ওর প্রিয়জনেরা যে আমার প্রিয় হয়ে উঠেছে এতে ঝিনুকের নিশ্চয় ভেতরে ভেতরে গর্বই হয়।

আমি সাড়ে চারটের একটু আগেই সেন্ট্রাল পার্কে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমি আসি করুণাময়ীর দিক থেকে অটো ধরে। ঝিনুকও অটো ধরেই আসে, ওদের হাউসিং-এর সামনে থেকেই অটো পাওয়া যায়। আমি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে

দেখছিলাম কী দ্রুত ভিড় বাড়ছে। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা অটো থেকে, ট্যাক্সি থেকে, বাস থেকে নেমে সেন্ট্রাল পার্কে ঢুকছে। টু-হুইলারের যাত্রীও কম নয়। তারপর সকলেই টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে পড়ছে।

যারা আসছে, তারা সবাই যে কাছাকাছি জায়গায় থাকে, তা নয় কিন্তু। ঝিনুক বলছিল, ওর এক কলেজের বান্ধবী বারাসত থেকে এখানে প্রেম করতে আসে। আসলে জায়গাটা যে শুধু সুন্দর তাই-ই নয়, নজরদারিটাও কম। ফলে যুবক যুবতীরা সহজেই শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হতে পারে। তাতে সেন্ট্রাল পার্কের বিভিন্ন গাছের আড়ালে, ঝোপের পেছনে যেসব দৃশ্য তৈরি হয়, সেগুলো বেশ অস্বস্তিকর। অবশ্য আমি মফস্বলের ছেলে বলেই হয় তো আমার অস্বস্তি লাগে। যারা ওইসব কাণ্ড করছে তাদের লজ্জা-টজ্জা আছে বলে তো মনে হয় না।

এই কারণেই আমরা এখানে খুব কম আসি। আমরা সাধারণত কোনও নিরিবিলি রেস্তোরাঁ কিংবা কাফেতে বসে গল্প করে সময় কাটাই। আর আমার যদি ঝিনুককে আদর করতে ইচ্ছে করে, কিংবা ঝিনুকের যদি ইচ্ছে করে আদর খেতে, কিংবা একসঙ্গে দুজনেরই যদি ইচ্ছে করে আদর করতে এবং আদর খেতে, তাহলে আমার অমন চমৎকার বাড়িটা তো আছেই। আমার দুই রুমমেট বিবেক আর মনীশের পার্মানেন্ট নাইট শিফট ডিউটি। ফলে সন্ধে আটটার পর থেকে ও বাড়ির বাসিন্দা আমি একাই। তবে সেরকম খেলার দিনেও হাতের সব তাস আমরা কখনওই ফেলিনি। আমি ঝিনুককে বলেছি, পানের পাতার আড়াল সরিয়ে যেদিন তোমার মুখটা দেখব, সেদিন সেই মুখে কিছু রহস্য যেন বাকি থাকে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই দেখি রাস্তা পেরিয়ে ঝিনুক আসছে।

এখন জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ। বর্ষা পুরোপুরি না এলেও বিকেলের দিকে আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। সেন্ট্রাল পার্কের আকাশছোঁয়া কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোর মাথা পেরিয়ে মেঘছেঁড়া আলোর একটা ফলা সোজাসুজি ঝিনুকের মুখে এসে পড়েছে। ঝিনুকের কপালের চারপাশের উড়োঝুরো চুলগুলো সেই ম্যাজিক আলোয় সোনার তারের মতো জ্বলছে। ওর ফরসা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। আমার সামনে এসে ঝিনুক এক লহমা দাঁড়াল। ওড়নার প্রান্তটা মুখের কাছে তুলে ঘাম মুছে নিয়ে বলল, “চলো, ভেতরে চলো।” বলেই আমার জন্যে অপেক্ষা না করেই গেটের দিকে হাঁটা লাগাল। আমি তার মধ্যেই দেখে নিয়েছি, ওর চোখ জলে ভারী হয়ে রয়েছে। বুঝতে পারছিলাম, ঝিনুক কাঁদবার জন্যে আড়াল চাইছে। কিন্তু কেন? কেন ঝিনুকের এত মন খারাপ?

আমরা সাধারণত লেকটাকে একটা চক্কর দিয়ে উলটোদিকে উইপিং-উইলোর গাছ দিয়ে ঘেরা একটা বেঞ্চের ওপর বসি। ওখানে লেকের জলটা প্রায় আমাদের পা ছুঁই-ছুঁই। আমাদের দুজনেরই খুব পছন্দের জায়গা ওটা। কিন্তু আজ ঝিনুক আমার হাতে একটা টান দিয়ে কাছাকাছি অন্য একটা বেঞ্চের দিকে নিয়ে গেল। সেখানে বসেই ফুপিয়ে কেঁদে উঠল ঝিনুক। আমি ওর পিঠে হাত রাখলাম। ওকে শান্ত হওয়ার সময় দিলাম। একটু বাদে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে ঝিনুক?"

ঝিনুক পার্স থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে বলল, "দিদিকে ছেলের বাড়ি থেকে দেখতে আসছে বলে আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হল। ভাবতে পারো? ওর কাছে ব্যাপারটা কতটা অপমানজনক ভাবো তো।" এই বলে আবার মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল ঝিনুক।

ঝিনুকের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে আমার একটু সময় লেগেছিল। তারপর হঠাৎই আমার চোখের সামনে ঝিনুক আর পলার চেহারাদুটো পাশাপাশি ভেসে উঠল। ঝিনুক ফরসা। পলা কালো। ঝিনুক তন্বী। পলা স্থূল। ঝিনুকের ত্বকে মোমের জেল্লা। পলার ত্বক খসখসে। ঝিনুক সুন্দরী... পলা কুৎসিত।

ঝিনুক সামনে ঘোরাঘুরি করলে ছেলের বাড়ির লোকেদের চোখে পলাকে আরও কুৎসিত লাগবে। তারা জেদ ধরে বসতে পারে, আপনাদের ছোটো মেয়েটিকেই আমাদের চাই।

তাই ঝিনুককে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। পলা জানে, ঝিনুক কেন বেরিয়ে যাচ্ছে। পলার বুকে ঠিক কতখানি রক্তক্ষরণ হচ্ছে?

আমার পুরুষমানুষের মন দিয়ে আমি বোধ হয় কোনওদিনই তার থই পাব না। তাই কোনও কথা না বলে চুপ করে সামনে তাকিয়ে রইলাম। সন্ধে নেমে এসেছে। লেকের জল থেকে একটা দুটো করে সাদা বক ডানা মেলল। কালো পানকৌড়িগুলোও তাদের সঙ্গ ধরল নিশ্চিন্তে।

দুই

দেখা না হলেও প্রতিদিনই আমার আর ঝিনুকের মধ্যে মোবাইলে বেশ কয়েকবার কথাবার্তা হয়। মঙ্গলবার ওকে যতবারই ফোন করলাম দেখলাম সুইচ অফ। সোমবারেও তো দেখা হয়েছে। তখন তো কোনও অসুবিধার কথা বলেনি। ওদের বাড়ির ল্যান্ড লাইনে ফোন করতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিলাম। মোবাইল বন্ধ রেখেছে মানে বুঝতেই পারছি, ও এখন বাইরের কারোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না। হয়তো আমার

সঙ্গেও না। ওর সেই ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়েই আমি সারাদিন আর যোগাযোগের চেষ্টা করলাম না।

সন্ধেবেলা অফিস থেকে বেরিয়ে ঝিনুকের মোবাইলে আবার ট্রাই করতেই সেটা বেজে উঠল। এবার ঝিনুক কল রিসিভ করল। আমি অটো না ধরে সেক্টর ফাইভের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম, যাতে ঝিনুকের সঙ্গে কিছুক্ষণ অন্তত নিশ্চিন্তে কথা বলা যায়।

ঝিনুককে জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার বলো তো? সারাদিন ফোন বন্ধ?"

ঝিনুক সঙ্গে সঙ্গে কোনও জবাব দিল না। একটু চুপ করে থেকে বলল, "দিদির শরীরটা হঠাৎই খুব খারাপ হয়ে পড়েছে।"

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "সে কী! কী হয়েছে?"

ঝিনুক বলল, "ফোনে বলতে পারব না।"

আমি বললাম, "তোমাদের বাড়িতে যাব?"

ঝিনুক তাড়াতাড়ি বলল, "না, না, তুমি এসো না। আমি বরং... আমি বরং ঘণ্টাখানেক বাদে তোমার মেসে চলে আসছি। সারাদিন বাড়িতে বসে আছি, একটু বেরোতে ইচ্ছে করছে। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে, এসো।" এই বলে আমি ফোনটা পকেটে পুরে হাত দেখিয়ে একটা অটো দাঁড় করালাম। ফিরতে ফিরতে সারা রাস্তাই ভাবলাম, পলার এমন কী অসুখ হয়ে থাকতে পারে, যার জন্যে ঝিনুক আমাকে ওর বাড়িতে যেতে বারণ করল? কোনও ফিমেল ডিজিজ না কি, যেটা আমাদের সামনে বলা অস্বস্তিকর?

আমি মেসে ফিরবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিবেক আর মণীশ প্রতিদিনের মতো টু-হুইলার নিয়ে বেরিয়ে গেল। মণীশটা খচ্চর আছে। ঠিক খেয়াল করেছে আমি বাড়ি ফিরেই ঝাঁটা নিয়ে ঘর ঝাঁট দিচ্ছি, অ্যাশট্রে সাফ করছি। ও জানে ঝিনুকের আসার কথা থাকলে আমি ব্যাচেলরস্ ডেনটাকে একটু সাফসুতরো করার চেষ্টা করি। না হলে ঝিনুক খুব রেগে যায়। রেগে যাওয়ার চেয়েও বড়ো কথা, নিজেই ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করে দেয়। বেরোবার আগে হারামি মণীশ চোখ টিপে বলে গেল, "দা কোস্ট ইজ ক্লিয়ার বস। এনজয় ইয়োরসেল্ফ।"

জানে না তো, বসের মনের ভেতরে কী তোলপাড় হচ্ছে।

জামা-কাপড় ছেড়ে বারমুডা আর টি-শার্ট গায়ে চড়িয়ে বারান্দায় বসে বসে ভাবছিলাম, কেন যে ঝিনুকের মতো এত ভালো মেয়ে এমন কষ্ট পাচ্ছে! ভাবছিলাম, আমার এ ব্যাপারে করণীয় কিছু আছে কিনা। একটু বাদেই ঝিনুক আমাদের বাড়ির গেট খুলে ভেতরে ঢুকল।

ঝিনুক আজ একটা ভারী অনুজ্জ্বল রঙের শালোয়ার কামিজ পরেছে। চুলগুলো গুছি করে একটা বড়ো ক্লিপ দিয়ে মাথার পেছনে টেনে আটকানো। এত ক্যাজুয়াল সাজে ওকে আগে কখনও দেখিনি। সাজগোজের ব্যাপারে ও বেশ মনোযোগী। ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল মনের দিক দিয়ে বেশ বিধ্বস্ত হয়ে রয়েছে। ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম। বললাম, "এবার একটু বলো তো, পলার এগজ্যাক্টলি কী হয়েছে? অসুখ বিসুখ তো মানুষের হয়েই থাকে। চিকিৎসা করালে আবার সেরেও যায়। তাই নিয়ে এত ভেঙে পড়বার কী হয়েছে?"

ঝিনুক বলল, "দিদির অসুখটা মনের। দিদি... দিদি বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছে অনাবিল। এই বলে শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল।"

এ এমন এক দুঃসংবাদ যা বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু কথাটা বলছে পলার মায়ের পেটের বোন। বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী?

একটু চুপ করে থেকে ঝিনুক বলল, "তোমাকে আগে বলিনি, বেশ কিছুদিন ধরেই ওর আচার আচারণে নানান অসঙ্গতি ধরা পড়ছিল। ও রাতে ঘুমোত না। বিছানা থেকে নেমে গিয়ে বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। আমি আর ও তো এক ঘরে শুই, তাই ব্যাপারটা আমারই প্রথম চোখে পড়ে। কতবার জিজ্ঞেস করেছি, কী হয়েছে রে দিদি? কিছুই বলত না। খালি বলত, ঘুম আসছে না।

"বলার অবশ্য দরকারও ছিল না। ওর কষ্ট আমি কি জানতাম না? ও আমার থেকে তিন বছরের বড়ো, মানে তিরিশ বছর বয়স হয়ে গেল ওর। কতগুলো ছেলের বাড়ি থেকে দেখে গেল। কেউই পছন্দ করে না।"

কথা বলতে বলতে ঝিনুকের গলাটা আবার বুজে এল।

"কী হল?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

তারপর একদিন দিদি বলল, "আমার জন্যে তোর আর অনাবিলের বিয়েটা হচ্ছে না। আমি তোদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছি।"

আমি ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বললাম, "তোকে কে বলল রে বিয়ের জন্যে আমার ঘুম হচ্ছে না? চল, আমরা দুজনেই বিয়ে না করে যেমন আছি তেমনি থাকি। করুণ হেসে আমার হাত ছাড়িয়ে চলে গেল।

"বুঝতে পারতাম মাঝরাত্তিরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব কথাই ও চিন্তা করে। তখনও ভাবিনি এর থেকে ওর মেন্টাল ডিসব্যালেন্স হয়ে যাবে। কয়েকমাস আগে থেকে অদ্ভুত সব কাজকর্ম শুরু করল। হয়তো একটা পাউডারকৌটা নিয়ে জানলার উপর রাখল। সেটাকে ওখান থেকে সরানো চলবে না। লিফটে ওঠার আগে প্রত্যেকবার

বাঁ পা-টা তিনবার মাটিতে ঠুকবে। বেসিনের কল খুলে জলের নীচে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে।

"গত রোববার বিকেলে ছেলের বাড়ির লোকেরা আসবার আগে আমার বেরিয়ে যাওয়াটা নিশ্চয় ওর মনে খুব জোর ধাক্কা দিয়েছিল। ওইদিন রাত থেকেই কথাবার্তার মধ্যেও পাগলামির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত সব কথা বলতে শুরু করেছে। বলছে, কোন গুরুদেব নাকি ওর মাথার মধ্যে নানান নির্দেশ পাঠাচ্ছে। সেই নির্দেশ মেনেই ওইসব কাণ্ড করছে। অ্যাশট্রের ছাই উপুড় করে ঢেলে দিচ্ছে টেবিলের ওপর। ভরদুপুরে ঘরের সব আলো জ্বেলে দিচ্ছে।"

ঝিনুকের কথা শুনতে শুনতে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল। এইসব ডিলিউশন, হ্যালুসিনেশন এইসবই সিজোফ্রেনিয়ার পূর্বলক্ষণ। আমি জানি, কেন না আমার এক পিসতুতো ভাই সিজোফ্রেনিক ছিল। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল সে। আমি বললাম, "ঝিনুক, পলার ইমিডিয়েটলি চিকিৎসার প্রয়োজন।"

"জানি। সেইজন্যেই তো কাল স্কুলে যেতে পারিনি। বাবা আর আমি ওকে নিয়ে বেকবাগানে এক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিলাম।"

"কী বললেন তিনি?"

"এমনি ওষুধ-টষুধ তো একগাদা দিয়েছেন। তাছাড়া যেটার ওপরে জোর দিলেন, সেটা হল ওকে কোনওভাবে এনগেজ করে রাখা। ওর মনটাকে কোনও ভাবে অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখা। সেটা কেমন করে সম্ভব বলো তো?"

আমি জানতাম পলা পড়াশোনায় ভালো ছিল। ইংলিশে অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেছিল। মুশকিল হচ্ছে, তারপরে চাকরির পরীক্ষাগুলোতে পাশ করতে পারেনি। এদিক ওদিক ছোটোখাটো প্রাইভেট ফার্মে দুয়েকটা চাকরি করেছিল, কিন্তু কোনওটাতেই বেশিদিন টিকতে পারেনি। ঝিনুকের কাছ থেকেই শুনেছি, চাকরি করতে পলার নাকি ভালো লাগে না। তারপর গত কয়েকবছর তো বাড়িতেই বসে আছে। এ মেয়েকে নতুন করে এখন কোনও চাকরিতে ঢোকানো সত্যিই কঠিন কাজ। আই টি সেক্টরে তো ও একেবারেই মিসফিট। তবু চেষ্টা তো করতেই হবে। দেখতে হবে আই টি সেক্টরের বাইরে পলার জন্যে হালকা ধরনের কাজ যদি কিছু পাওয়া যায়।

আমি ঝিনুকের পাশ থেকে উঠে কিচেনে গেলাম। অন্যদিন হলে ঝিনুকও আমার পেছনে পেছনে চলে আসত। আজ এল না। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল নড়াচড়া করতেই ইচ্ছে করছে না ওর; মনের ভার পাথরের মতো শরীরের ওপর চেপে বসে আছে। যাই হোক, নিজেই দু কাপ কফি বানিয়ে, কিছু কাজুবাদামের সঙ্গে প্লেটটা সাজিয়ে আবার শোবার ঘরে এসে ঢুকলাম। কফি বানাতে বানাতেই মনে পড়ছিল, এই

পলা গত ভাইফোঁটার দিনে আমাকে কী চমৎকার একটা পাঞ্জাবি গিফট করেছিল। ও আমার সঙ্গে তুই তোকারি করে কথা বলে। একদম নিজের দিদির মতো ব্যবহার।

কফি খেতে খেতে আমি আর ঝিনুক কিছুক্ষণ এটা সেটা গল্প করলাম। তার মধ্যেই কাশীবাবুর ফোন এল। কাশীবাবু একজন দালাল। ওঁকে রাজারহাটে তিরিশ চল্লিশ লাখের মধ্যে একটা ফ্ল্যাট দেখতে বলেছিলাম। বিয়ের পর আমি আর ঝিনুক সেখানে শিফট করে যাব। কাশীবাবু বললেন, রোববার বিকেলের দিকে আমরা ফ্রি থাকলে উনি আমাদের একটা ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে যাবেন।

ওঁকে না করে দিলাম।

পলা কখন কী রকম থাকে তার ঠিক নেই। এই অবস্থায় কোনও প্রোগ্রাম না করাই ভালো।

ঝিনুক পাশে বসে ফোনে আমার আর কাশীবাবুর কথোপকথন শুনছিল। এই উদ্যোগে ও ও প্রথম থেকেই আমার পাশে ছিল। এ তো আমাদের যৌথ উদ্যোগ – এই বাড়ি কেনা, গাড়ি কেনা, সুখের বাসা বানানো। ও সবই বুঝতে পারছিল। ফোন ডিসকানেক্ট করার পর বলল, "একটা কথা বলব?"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম।

"তুমি আমার সঙ্গে রিলেশনশিপটা ব্রেক করে দাও।"

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। এ আবার কী রকম কথা!

ঝিনুক বলল, "আমাদের ফ্যামিলির ঝামেলার মধ্যে তুমি কেন নিজেকে জড়িয়ে কষ্ট পাবে? তুমি এক্ষুনি একটা বাড়ি কিনতে পার। একটা গাড়িরও তোমার খুব প্রয়োজন, এখানে গ্যারেজ নেই বলে যেটা তুমি কিনতে পারছ না। তাই বলছিলাম তুমি অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করো। বিয়ে করে সংসার পাতো।"

আমি হেসে বললাম, "ওই যে বাংলা কাগজের বিজ্ঞাপনে যেমন লেখে? নির্ঝঞ্ঝাট... দায়মুক্ত? ওরকম মেয়ের কথা বলছ?"

"না। ইয়ার্কি নয়।" ঝিনুক মুখটাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলল। "কতদিন একলা একলা থাকবে?"

"একলা একলা নেই তো।" ঝিনুকের নরম শরীরটা দু হাতে জড়িয়ে নিয়ে বললাম। "তুমি তো আছ। নেই?"

ঝিনুকের হাতদুটোও আমার পিঠের দিক থেকে উঠে এসে আমার মাথার পেছনের চুলগুলোকে খামচে ধরল। মুখটা এগিয়ে এল আমার মুখের কাছে।

দীর্ঘ এক চুম্বনের পরে ঝিনুকের মুখটা দু হাতে ধরে বললাম, "তুমি কী সুন্দর, ঝিনুক!"

কথাটা বলা মাত্র কী যে হল! ঝিনুক আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী হল ঝিনুক?"

"কী হল জান না?" এত তিক্ততা ঝিনুকের গলায় আগে কখনও শুনিনি।

"সুন্দর, কেবলই সুন্দর! সুন্দর ছাড়া তোমরা আর কিছু বোঝো না, না? যারা সুন্দর নয়, তারা তাহলে যাবে কোথায়? তাদের ইচ্ছে করে না ভালোবাসা পেতে?"

ঝিনুক ফিরে যাবার পরেও অনেকক্ষণ একলা বারান্দায় বসে ভাবছিলাম, সত্যিই কি আমার আর ঝিনুকের মধ্যে পলা এসে দাঁড়াল?

মনকে প্রশ্ন করলাম, মন, কতদিন পলার আরোগ্যের জন্যে অপেক্ষা করতে পারবি?

মন কোনও উত্তর দিল না।

তিন

পলা আমার মুখের দিকে চেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না সে হাসিতে। বরাবর যেমন দেখেছি – পাহাড়ি ঝরনার মতো পরিষ্কার, ক্লান্তিহরা হাসি।

বলল, "অনাবিল, তুই একটা পাগল। আমাকে রিসেপশনে কে চাকরি দেবে? তাও আবার অত বড়ো হোটেলের? আমার মুখ দেখেই তো কাস্টমার ব্যাগ তুলে নিয়ে পালাবে।"

আমি পলার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, পালাবে? কেন পালাবে?

স্থূল এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণা ওই মেয়েটার মুখের মধ্যে বিন্দুমাত্র কাঠিন্য তো নেই। বরং রয়েছে পায়ের ওপর লাফিয়ে পড়া বেড়ালছানার মতো ভারী এক আমুদে ভাব। বেড়ালছানার মতোই মানুষের সঙ্গ ভালোবাসে পলা। ওকে দেখলে মানুষ পালাবে কেন?

পরক্ষণেই মনে হল, আমি তো ওর ভেতরের মানুষটাকে চিনি বলে এসব কথা ভাবছি। কিন্তু যারা ওকে চেনে না, তাদের মনে তো বিরাগ জন্মাতেই পারে।

বড়ো অসহায় লাগছিল। পলার সমস্যাটা এমন কিছু বড়ো সমস্যা নয়। বহু মানবীই প্রথাগত অর্থে অসুন্দরী। কিন্তু তারা ওসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে দিব্যি আছেন। পলা কিন্তু সেটা পারছে না। তার কারণটাও আমার কাছে পরিষ্কার। ঝিনুক।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই অহরহ পাশে সুন্দরী বোনটার উপস্থিতিই পলাকে এক অন্তহীন হীনম্মন্যতার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে। ঝিনুকই আমাকে বলেছে, ওরা দুই বোনে কতবার প্রতিবেশিনীদের ফিসফিস করে বলতে শুনেছে, "রত্নাদির দুটো মেয়ে দু' রকমের। বিজয়দা আর রত্নাদি দুজনেই এত সুন্দর দেখতে, তবু বড়ো মেয়েটাকে কী করে অমন পেত্নির মতো দেখতে হল বল তো।"

আরও একটু বড়ো হওয়ার পড়ে ফিসফিসানির মধ্যে লুকিয়ে থাকা না-বোঝা ইঙ্গিতগুলোও ওদের দুই বোনের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল – বড়োটা সত্যিই বিজয় সান্যালের মেয়ে তো?

ফিসফিসানি চলতেই থাকে। বিয়ের পরে পরেই ওরা তো অনেকদিন নর্থবেঙ্গালে ছিল। বিজয়দা অফিস বেরিয়ে গেলে কোয়ার্টারে রত্নাদি একা। হি হি হি... হা হা হা। চুপ চুপ, আস্তে।

ঝিনুক আমাকে বলেছে, এমন সব নিষ্ঠুর দিনে ওই-ই পলাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে থাকত। হাতের চেটো দিয়ে পলার কালো গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলের ধারা মুছিয়ে দিত।

বয়স বাড়ার পর কিন্তু পলাকে ঝিনুক আর কোনওদিন কাঁদতে দ্যাখেনি, বরং পলার হাসিটাই অস্বাভাবিক রকমের বাড়তে শুরু করেছিল। বাবা, মা, ঝিনুক সকলেই বুঝত ওই হাসি দিয়েই পলা কান্নাটাকে লুকিয়ে রাখছে।

আমি ঝিনুককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এসব ক্ষেত্রে যেটা হয়, বোনের ওপর হিংসে, সেটা কখনও পলার মধ্যে দেখোনি?"

ঝিনুক জোরে ঘাড় নেড়েছিল। বলেছিল, "বিশ্বাস করো, কক্ষনও না। ছোটোবেলা থেকে ওকে নিজেকে কখনও সাজতে দেখিনি। বোধ হয় ওই বয়সেই মাথায় ঢুকে গিয়েছিল, উজ্জ্বল রঙের ফ্রক ওর জন্যে নয়, লাল লিপস্টিক ওর জন্যে নয়। কিন্তু জানো, সাজগোজের পুরো শখটা মেটাত আমার ওপর দিয়ে। মায়ের ড্রেসিং-টেবিলের সামনে থেবড়ি কেটে বসে, তিন বছর বয়সি আমাকে সাজাত ছ বছরের পলা। চুনকাম করার মতো করে আমার মুখে পাউডার লাগাত, ধ্যাবড়া করে কাজল। তারপর আমাকে কোলে ঝোলাতে ঝোলাতে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বলত, "মা দেখ, আমার বোনু কী সুন্দর, না?"

মা ওর গাল টিপে দিয়ে বলত, "তুমিও তো খুব সুন্দর, মা।"

"না, আমি সুন্দর নই, বোনু সুন্দর।"

মোট কথা ঝিনুকের বক্তব্য, ও কোনওদিন পলার মধ্যে কোনওরকমের নীচতা দেখেনি।

তবু পলা আজ পাগল হয়ে যাচ্ছে।

ঝিনুক বাড়ি ছিল না, স্কুলে গিয়েছিল। তবু আজ আমি ওদের বাড়িতে এসেছিলাম। এসেছিলাম পলার একটা চাকরির খবর নিয়ে। দুর্গাপুরে ইদানীং অনেক নতুন নতুন হোটেল হচ্ছে। আমার এক জ্যাঠতুতো দাদা ওরকম একটা হোটেলের ম্যানেজিং কমিটিতে রয়েছে। ওকে পলার কথা বলেছিলাম। দাদা বলেছিল, "নিয়ে আয় দেখি। তবে ইংলিশে অনার্স করা মেয়ে বলছিস। অত শিক্ষিত মেয়ে তো এই কাজে লাগে না। কেন শুধুমুধু এখানে পড়ে থেকে জীবনটাকে নষ্ট করবে? অন্য কোথাও চাকরি খুঁজতে বল না।"

সেই প্রস্তাব শুনেই তো পলা ওরকম হেসে উঠল। বলল, অনাবিল, "তুই একটা পাগল।"

হয়তো পলাই ঠিক বলেছে। যে চাকরির মূল শর্তই হল চেহারা দিয়ে লোককে ইম্প্রেস করা, সেই চাকরিতে পলা আদৌ যোগ্য কিনা সন্দেহ। হয় তো আমার দাদাই ওকে চাক্ষুষ দেখলে বেঁকে বসবে। বলবে, "এরকম মেয়েকে রিসেপশন কাউন্টারে দাঁড় করাতে পারব না।"

এইসব ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হুঁশ ফিরল পলার কথায়। পলা এতক্ষণ আমার সামনে খাটের ওপর বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিল। দেখলাম কখন যেন ও খাট থেকে নেমে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সামনের মাঠে হাউসিং-এর ছোটো ছোটো ছেলেরা হই হই করে ক্রিকেট খেলছে। সেইদিকে তাকিয়ে পলা আমাকে বলল, "শুভেন্দুকে একটা খবর দিতে পারবি অনাবিল?"

কে শুভেন্দু? কোথায় শুভেন্দু? এ নাম তো আমি কোনওদিন ঝিনুক কিংবা পলার মুখে শুনিনি। অবাক হয়ে পলার দিকে চেয়ে রইলাম। পলা আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। সেইভাবেই ও বলে চলল, "শুভেন্দুকে বোলো, পলা সমস্ত কোলাব্যাঙের মুখে চুমু খেয়ে দেখেছে, একটা ব্যাঙও রাজপুত্র হয়ে যায়নি।"

পলা ঘুরে দাঁড়াল। এ এক অন্য পলা। এর চোখের মণি প্রায় পুরো সাদাটাকে ঢেকে ছড়িয়ে পড়েছে। শিথিল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে দু পাটি দাঁত। বড়ো ভয়ঙ্কর দেখতে লাগছে পলাকে।

পলা আবার বলল, "অনাবিল, তুমি শুভেন্দুকে বোলো। শুভেন্দুকে বোলো..."

পলার দুই হাতের পাতা গুটিয়ে শক্ত হয়ে আছে, কথা বলতে গেলে দাঁতে দাঁত লেগে কড়কড় শব্দ হচ্ছে। পলা আমার দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছিল আর আমি এক পা এক পা করে পেছনে হঠছিলাম।

হঠৎ বিড়বিড় করতে করতেই পলা চিল চিৎকার করে উঠল, “শুভেন্দুকে বলিস আমি ওকে চাই, ওকে চাই, ওকে চাইইইই।”

দৌড়ে আসা পায়ের শব্দ। পলার মা আর বাবা উদভ্রান্তের মতো ঘরে ঢুকলেন। বাবা বললেন, “সকালের ওষুধটা ওকে খাওয়াওনি?” মা বললেন, “খাইয়েছিলাম তো।” মা পলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে খাটের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বাবা জলের জগ থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে পলার মুখে চোখে ঝাপটা দিলেন। আমি ওদের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাচ্চা ছেলেগুলো খেলা থামিয়ে অবাক হয়ে এইদিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি জানি, কদিন বাদে ওদের ওই অবাক ভাবটার জায়গা নেবে নিষ্ঠুর হাসি। হয়তো ওদের মধ্যেই কোনও একজন একটা ঢিল ছুঁড়ে দেবে পলার দিকে। চেঁচিয়ে বলবে, “এই পাগলি!”

ঝিনুকদের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে মাথা নীচু করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে অটোয় উঠেছি, কখন যে ঝিনুকের স্কুলের সামনে গিয়ে নেমেছি কিছুই জানি না। পুরো পথটাই যেন ঘুমের মধ্যে চলেছিলাম।

মাথার মধ্যে শুধু একটা প্রশ্নই ঘুরছিল, কে শুভেন্দু?

কতক্ষণ স্কুলের গেটের উলটোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। হঠাৎই দেখলাম বড়ো লোহার গেটটা খুলে গেল। পিলপিল করে বেরিয়ে এল ছাত্রীরা। তাদের মধ্যে কেউ গার্জেনের সঙ্গে রিকশায় চাপল, অনেকেই উঠে বসল অপেক্ষমান স্কুলবাসগুলোর মধ্যে কোনও একটায়। ছাত্রীদের ভিড় ফাঁকা হয়ে যাওয়ার কতক্ষণ পরে কে জানে এক সহকর্মিনীর সঙ্গে বেরিয়ে এল ঝিনুক। আমাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর মুখে পরিষ্কার ভয় ফুটে উঠল। সঙ্গিনীকে কিছু বলে বিদায় করে, ও দ্রুত পায়ে রাস্তা পেরিয়ে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করল, “তুমি এসেছ কেন? কী হয়েছে? দিদি ঠিক আছে তো?”

আমি ঝিনুকের ওসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। বরং যে প্রশ্নটাকে এতক্ষণ বুকের মধ্যে চেপে রেখে দিয়েছিলাম সেটাই আমার বুক ফাটিয়ে বেরিয়ে এল, “শুভেন্দু কে?”

ঝিনুকের চোখদুটো ক্রমশ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। কতক্ষণ বাদে কে জানে, ও ধীরে ধীরে বলল, “তুমি ও নাম কোথায় শুনলে?”

আমি ঝিনুককে নিয়ে ফুটপাথের ধারে একটা চায়ের দোকানের দিকে এগিয়ে গেলাম। তখনও সন্ধে নামতে দেরি ছিল। দেরি ছিল রাস্তায় অফিস ছুটির মানুষের ঢল নেমে আসার। দোকানি সবে মাত্র তার বিস্কুটের বয়ামগুলো গুছিয়ে রাখছিল। আমাদের

দেখে বয়স্ক দোকানি বলল, "একটু বসুন বাবু, এখনই চা হয়ে যাবে।" আমার তাড়া ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম, অনেক কিছুই বলতে হবে ঝিনুককে, অনেক কিছুই আমাকে শুনতে হবে।

আমরা দুজন ফুলবাগান মোড়ের থেকে একটু দূরে একটা নির্জন গলির মুখে সেই ঝুপড়ি দোকানের সামনে পাতে রাখা বেঞ্চিতে বসলাম। আমি ঝিনুককে আজ দুপুরে ওদের বাড়িতে যে পরিস্থিতির সামনে পড়েছিলাম, সেই সবই আস্তে আস্তে বললাম। ঝিনুক ওর হ্যান্ডব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিল, তবু ওর চোখের নীচে জমে থাকা কালিমার এতটুকুও মুছল না।

ও বলল, "সে সব প্রায় চোদ্দো পনেরো বছর আগের কথা। তখন তুমি তো জানো, বাবার পোস্টিং ছিল আসানসোলে। আমরাও ওখানে থাকতাম। দিদি তখন ক্লাস টেনে পড়ে, আর আমি সেভেনে। শুভেন্দুদা আমাদের পড়াতে আসত। ওরও তখন একেবারেই কম বয়স, কুড়ি একুশ বছর হবে। তখনও বোধ হয় গ্রাজুয়েশন হয়নি। মনে আছে, খুব গরীব ঘরের ছেলে ছিল। ওর বাবা আমাদের বাবাদের অফিসে চা বিক্রি করতেন। তিনিও হঠাৎ কী যেন একটা অসুখে মারা গেলেন। ওদের তখন তিন চারটে ভাইবোন আর মা মিলে না খেয়ে থাকার দশা।"

"তারপর?"

"শুভেন্দুদা পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে দিদির হাতে ছোটো ছোটো চিঠি গুঁজে দিত। আমার চোখ এড়ায়নি এই কাণ্ড, কিন্তু আমি মাকে কিছু বলিনি। কেন বলব? আমার তো শুভেন্দুদাকে খুব ভালো লাগত। ভাবতাম, ও আমার জামাইবাবু হলে ভালোই হয়। ছোটো ছিলাম তো, জাগতিক হিসেব নিকেশ অত বুঝতাম না। কিন্তু মা নয়, বাবা-ই কী করে যেন একদিন সব কথা জানতে পেরে গেল।

"বাবার ওরকম রুদ্রমূর্তি তার আগে বা পরে আর কখনও দেখিনি। লিটারালি ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে শুভেন্দুদাকে বাড়ির বাইরে বের করে দিয়ে এসেছিল। বুঝতেই পারছ, শুভেন্দুদার টিউশনিরও ওইখানেই ইতি।"

"তারপর কী হল?"

"কী আবার হবে। বছরখানেক বাদে আমরা কলকাতায় চলে এলাম। তারপর থেকে তো আর দিদির মুখে কোনওদিনই শুভেন্দুদার কথা শুনিনি। ভেবেছিলাম, বেশিরভাগ 'কাফ লাভ' মানুষ যেমন দ্রুত ভুলে যায়, দিদিও নিশ্চয় সেরকমই শুভন্দুদার কথা ভুলে গেছে। কিন্তু আজ এত বছর বাদে আজ ও সেই মানুষটাকেই আবার খুঁজছে!"

এই মহা বিস্ময়ের খবরটা নিজের মনে নাড়াচাড়া করবার জন্যেই ঝিনুক যেন কথা থামিয়ে চুপ করে গেল।

দোকানি আমাদের দুজনের হাতে চায়ের ভাঁড় ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবছিলাম, ঝিনুক কি কথাটা ঠিক বলল? আমাদের, যাদের জীবনে একাধিকবার প্রেম এসেছে, তাদের বাল্যপ্রেম ভুলে যাওয়ার বিলাসিতা সাজে। কিন্তু যার আসেনি? যার সারা জীবনের সঞ্চয় বলতে একটিমাত্র প্রেমিক – অবিমৃশ্যকারী এক তরুণ? সে কেমন করে তাকে ভুলে যাবে?

চায়ের খালি ভাঁড়টা বালতির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে ঝিনুককে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাদের সেই শুভেন্দুদা এখন কোথায় আছে, কী করছে কিছু জানো?"

ঝিনুক ঘাড় নাড়াল। "কিচ্ছু জানি না। পনেরো বছর কোনও যোগাযোগ নেই।"

সেদিন আমরা আর বেশিক্ষণ ওখানে বসিনি। ঝিনুকের মনে যে বাড়ির জন্যে প্রচণ্ড উদ্বেগ হচ্ছিল, তা বুঝতেই পারছিলাম। ও-ই হাত দেখিয়ে একটা ফাঁকা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েছিল। আমরা সল্টলেকে ফিরে এসেছিলাম।

চার

অফিস থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিলাম। অনেকদিন বাড়ি যাইনি। দুর্গাপুরে যাইনি। তাছাড়া অন্য একটা প্ল্যানও ছিল।

শুভেন্দু সন্ধান।

দেরি করে হলেও দক্ষিণবঙ্গে অবশেষে বর্ষা নামল। করুণাময়ীর বাস টার্মিনাস থেকে সাড়ে ছটার আসানসোল স্পেশালটা যখন ছাড়ল, তখনই সারা আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। সারা রাস্তা সেই মেঘ, সেই বৃষ্টি আমাদের বাসের সঙ্গে সঙ্গে চলল। কালো মেঘের পটভূমিকা এক্সপ্রেস-ওয়ের দু পাশের ধানক্ষেতগুলোকে আরও সবুজ, আরও সুন্দর করে তুলেছিল। আমার খুব ভালো লাগছিল জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে। গত কয়েকদিনে ঝিনুকের বাড়িতে যে দৈবদুর্বিপাক নেমে এসেছে, তার ওজন আমারও মনের ওপর গুরুভার হয়ে চেপেছিল। এই আদিগন্ত সবুজের মধ্যে দিয়ে তীব্রবেগে নিজের বাড়ির দিকে ছুটে যেতে যেতে মনে হল, সেই ওজন যেন একটু একটু করে আমার মনের ওপর থেকে খসে পড়ছে।

কিন্তু হঠাৎই সুর কেটে গেল। যেন আমাকে পলার কথা মনে পড়িয়ে দেবার জন্যেই এক্সপ্রেস ওয়ের ধারে ধারে পর পর বিশাল বিলবোর্ড উঠে এল। তার প্রতিটাতেই একটাই বিজ্ঞাপন। ফরসা হওয়ার মলমের।

এ বিজ্ঞাপন কতবার কতভাবে দেখেছি – ম্যাগাজিনের পাতায়, এরকম বিলবোর্ডে। ওই বিষণ্ণ শ্যামলা মেয়েটার মুখ তো আমাদের সকলেরই মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনটা দেখে আজকের মতো এভাবে কখনও রাগে গা রি রি করে ওঠেনি। আজ উঠল। আজ নিষ্ফল ক্রোধে আমি বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু বুকের ভেতরে যে আজন্মলালিত ধারণা তার দিক থেকে মুখ ফেরাব কেমন করে? কেমন করে ভুলব, পাপের টাকার রং সব সময়েই 'কালো', শঠতার প্রতিশব্দ 'কালা' ধান্দা? কেমন করে শৈশবের রূপকথা ভুলে যাব, ডাইনিবুড়ি কালো আর রাজকুমারী ফরসা?

কেন আমি ঝিনুকের প্রেমেই পড়লাম, পলাকে ভালো না বেসে?

এইসব অন্ধকার দমবন্ধ করা চিন্তাগুলোর মধ্যে দিয়ে একঝলক তাজা হাওয়ার মতো একটা নামই কেবল বয়ে যাচ্ছিল – শুভেন্দু। সেই রূপতাপস, যে কালো ত্বকের ব্যবধান সরিয়ে পলার ভেতরের সৌন্দর্যকে খুঁজে নিয়েছিল।

তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। আমার মন বলছে, ওর হাতেই রয়েছে পলার আরোগ্য। পলাও সেটা জানে, তাই উন্মাদ রোগের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে প্রাণপণে সে শুভেন্দুকে চেয়েছিল, যেভাবে ডুবন্ত মানুষ পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কারওর হাত ধরতে চায়।

আমার মুখে হয়তো দুশ্চিন্তার কোনও ছাপ ছিল, মায়ের চোখ এড়াতে পারলাম না। রাতের খাওদাওয়ার পর নিজের ঘরে বসে ল্যাপটপ নিয়ে খুটখাট করছিলাম। সেই সময়েই দরজা ঠেলে মা ঘরে ঢুকল। বলল, "কী হয়েছে রে তোর? আসার পর থেকে মুখটা শুকনো দেখছি? অফিসের ঝামেলা?"

আমি ঘাড় নাড়লাম।

"তা হলে? ঝিনুকের সঙ্গে অশান্তি করেছিস নাকি?"

আমি হাত ধরে মাকে আমার পাশে বসিয়ে বললাম, "মা, তোমরা আর বিজয়জেঠুরা তো একসঙ্গেই কুচবিহারে ছিলে?"

"ছিলামই তো। কতদিন আগের কথা। তখন তুই কিংবা ঝিনুক জন্মাসনি। কেন রে?"

"পলা জন্মেছিল?"

মা অবাক হয়ে বলল, "ও মা, রত্নাদির তো পলাকে পেটে নিয়েই বিজয়দার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। ও জন্মাবে না?"

"উঃ, লাগছে।" বলে মা যদি চেঁচিয়ে না উঠত, তাহলে আমি বুঝতেই পারতাম না যে, উত্তেজনার চোটে মায়ের হাতটা আমি এত জোরে চেপে ধরেছি। হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললাম, "কী বললে, আরেকবার বলো।"

মা বলল, “কেন, ঝিনুক তোকে কিছু বলেনি? পলা তো বিজয়দার মেয়ে নয়, অশোকবাবুর মেয়ে। রত্নাদির সঙ্গে অশোকবাবুর ভাব ভালোবাসা ছিল। আমরা সবাই জানতাম। উনিও তোর বাবার সঙ্গেই চাকরি করতেন। আর রত্নাদি তখন কুচবিহারে সুনীতি অ্যাকাডেমিতে পড়াতেন। ওইখানেই যেন কীভাবে দুজনের আলাপ হয়েছিল।”

মায়ের কথায় মনে পড়ল, ঝিনুক আমাকে একবার কথায় কথায় বলেছিল, ওদের মামাবাড়ি কুচবিহারে। তবে এখন নাকি সেখানে কেউ নেই।

মাকে বললাম, “তারপরে?”

“তো, সেই অশোকবাবুর সঙ্গে রত্নাদির বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। বোধ হয় ফাগুন মাসে বিয়ের কথা ছিল, আর মাঘমাসে অশোকবাবু স্কুটার অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন।”

“তারপর?”

“বিজয়দা আর অশোকবাবু ছিলেন যাকে বলে গলায় গলায় বন্ধু। উনি নিশ্চয় জানতে পেরেছিলেন রত্নাদির পেটে অশোকবাবুর সন্তান। তখন এমন স্টেজ যে, সেই বাচ্চাকে জন্মাতে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। বিজয়দা বরাবরই খুব মহৎ মানুষ। রত্নাদিকে ওই অবস্থাতেই রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করলেন। তখন ওই হাউজিং-এ আমরা যে দু-চারজন থাকতাম, তারাই শুধু জানলাম ব্যাপারটা। তারপর ঝিনুক যখন জন্মাল তখন তো আমরা সবাই কুচবিহার থেকে চলেই এসেছি।”

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মা বলল, “তুই হঠাৎ পলার কথা জিজ্ঞেস করলি কেন? ওর কি কিছু হয়েছে?”

আমি মিথ্যে করে বললাম, “না, তেমন কিছু না। ওই বিয়ের ব্যাপারটা বরাবর কেঁচে যাচ্ছে আর কী।”

মা তাই শুনে দুঃখিত গলায় বলল, “মেয়েটারই কপাল খারাপ। রত্নাদিকে অত সুন্দর দেখতে কিন্তু ও একেবারে বাপের গায়ের রং পেয়েছে।”

“কেন, অশোকবাবু কি খুব কালো ছিলেন?”

“ওরে বাবা, সে একেবারে যম কালো।”

মা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পড়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। যে কথাটা নিয়ে অনেক ভেবেছি, কিন্তু মুখ ফুটে কোনওদিন কাউকে, এমনকী ঝিনুককেও বলতে পারিনি, আজ সেই কথাটার জবাব পেয়ে গেলাম। দুই বোনের রূপের মধ্যে এত তফাৎ কেন, সেই প্রশ্নের জবাব।

মনে মনে ভাবছিলাম ঝিনুকের বাবার কথাও। সেদিন যখন পলা অমন চিৎকার করে উঠেছিল তখন উনিও দৌড়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। তখন ওঁর মুখে যে উদ্বেগ, যে অসহায়তা দেখেছিলাম তা পলার মায়ের থেকে এক ফোঁটাও যে কম ছিল না , তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

সারা সন্ধে গুমোট করে থাকার পড়ে এতক্ষণে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। যেমন জলের শব্দ তেমনি বিদ্যুতের ঝলসানি। বুঝলাম এখন আর ঘুম আসবে না। বালিশের পাশ থেকে মোবাইলটা তুলে নিয়ে সময় দেখলাম- সাড়ে এগারোটা। খুব ইচ্ছে করল, ঝিনুককে একবার ফোন করতে। ও সাধারণত বারোটার আগে ঘুমোয় না।

একবার রিং হতেই উলটোদিক থেকে ঝিনুকের শান্ত গলা ভেসে এল, "ঘুমোওনি?"

"ঘুম আসছে না।"

"কেন?"

"প্রথমত বৃষ্টির শব্দ। দ্বিতীয়ত এই চিন্তায় যে, তুমি কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো?"

"এরকম চিন্তার কারণ?"

"আমাকে বলোনি কেন যে, পলা আর তুমি একই বাবার সন্তান নও?"

আমার প্রশ্ন শুনে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ঝিনুক বলল, "এই ঘটনাটা আমার কাছে একেবারেই তুচ্ছ একটা কাগুজে সত্য অনাবিল। বিশ্বাস করো। তার বেশি আর কিচ্ছু নয়। আমার সব সময়ে মনেও থাকে না যে, পলা আমার হাফ-সিস্টার। সেই জন্যেই বলিনি। বলার মতো কোনও প্রসঙ্গাই আসেনি কখনও।"

আমি চুপ করে রইলাম। ঝিনুক বলে চলল, "বাইরের লোকে আমাদের দু বোনের চেহারার তফাৎটা দেখতে পায়। নানান কথা বলাবলি করে। কিন্তু আমরা তো দেখতে পাই একে অন্যের ভেতরটা। সেখানটায় তো একই মায়ের রক্ত শিরায় শিরায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুজনেই উপুড় হয়ে শুতে ঘুমোতে ভালোভাসি, মাছ দেখলে দুজনেরই গায়ে জ্বর আসে। আমাদের প্রিয় রং পিঙ্ক। পেট্রলের গন্ধে আমাদের দুজনেরই গা গুলোয়। সেই বয়ঃসন্ধি থেকে আমাদের দুজনেরই পছন্দের পুরুষ টল, ডার্ক, হ্যান্ডসাম। এত মিল বোধ হয় যমজ বোনেদের মধ্যেও থাকে না।"

আবার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ঝিনুক এই আলোচনার উপসংহারের মতো সেই চরম সত্যটা উচ্চারণ করল, "শুধু আমাদের সব মিলগুলোকে ঢেকে রেখেছে যে চামড়ার পাতলা পরতটা, ওর ক্ষেত্রে সেটা সেই কবেকার মৃত এক অশোক রায়ের, আর

আমার ক্ষেত্রে সেই চামড়াটার সাপ্লায়ার বিজয় সান্যাল। বাবা আলাদা হওয়ার ফলাফল এইটুকুই। তাহলে কেন এই নিয়ে আলোচনা করতে যাব বলো তো?”

মনে মনে জানতাম, ঝিনুক যা বলছে তার প্রত্যেকটি বর্ণ সত্যি। ওদের পরিবারের মধ্যে পলাকে নিয়ে কোনও সংশয় নেই, সমস্যাও নয়। কিন্তু সমাজের চাপ? সেটাকে তো এড়ানো যায় না। প্রথমে পিতৃত্ব নিয়ে টিটকিরি, আর তারপর এই বোনের সঙ্গে রূপের তুলনা। এই সব মিলিয়েই পলা পাগল হয়ে যাচ্ছে।

ঝিনুককে জিজ্ঞেস করলাম, “পলার খবর কী? কেমন আছে ও?”

ঝিনুক বলল, “আজ সকালেই আবার ভায়োলেন্ট হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবুকে ফোন করতে একটা নতুন ওষুধ লিখে দিলেন। মনে হয় ট্রাঙ্কুলাইজার ধরনের কিছু হবে। ওই ওষুধটা খাওয়ার পর থেকেই খুব ঘুমোচ্ছে।” তারপর হঠাৎই মনে পড়ে যাওয়ার মতো করে বলল, “শোনো, তুমি যেন কবে ফিরছ?”

বললাম, “রবিবার রাতে। কেন?”

“সোমবার সন্ধেবেলায় একটু আমার সঙ্গে বেকবাগানে সাইকিয়াট্রিস্টের চেম্বারে যেতে পারবে? উনি ওইদিন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। বলেছেন পলাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। একটা সাইকো-অ্যানালিসিস ধরনের কিছু করবেন। কিন্তু আমার দিদিকে নিয়ে একা ওখানে যেতে ভয় করছে। রাস্তায় যদি আবার হঠাৎ ভায়োলেন্ট হয়ে যায়।”

আমি বললাম, “নিশ্চয় যাব। এ নিয়ে আবার বলার কী আছে? তারপর বললাম, তুমি আর এসব নিয়ে চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখো।”

ফোনের ও পার থেকে ঝিনুক আকুল গলায় বলল, “তুমি ঠিক বলছ অনাবিল? সত্যি বলছ, দিদি আবার ঠিক হয়ে যাবে?”

আমি জবাব দেওয়ার আগেই ফোনের মধ্যে দিয়ে নারী কণ্ঠের তীব্র চিৎকার ভেসে এল, “শুভেন্দুউউউ! শুভেন্দুউউউ!”

বুঝতে পারলাম, ঝিনুকের পাশে ঘুমিয়ে থাকা পলা তার ওষুধের ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আরও বড়ো এক মোহঘোর ওর চৈতন্যকে আক্রমণ করেছে। তার নাম শুভেন্দু।

আমি ফোনটাকে কানে চেপে ধরেই বলতে থাকলাম, “হ্যালো, হ্যালো! ঝিনুক, কী হল ঝিনুক? কথা বলছ না কেন?”

কোনও উত্তর নেই। শুধু নানা গলার আওয়াজ। একটা গ্লাস বা বাটি মেঝেতে পড়ে যাওয়ার ঝনঝন শব্দ। বুঝতে পারছি, ঝিনুক ফোনটা চালু অবস্থাতেই হাত থেকে

ফেলে দিয়েছে। ফেলে দিয়ে হয়তো এখন দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে পলাকে। ওকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে।

আমি আমার ফোনটাকে ডিসকানেক্ট করে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটা বেতের চেয়ারে বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সামনের দিকে। এত রাতে দুর্গাপুর টাউনশিপের রাস্তাঘাট শুনশান। আমাদের বাগানের আমগাছের পাতা থেকে বৃষ্টির জল ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। হাসনুহানা ফুটেছে। তার নেশা ধরানো গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে।

আজ রাতে আর ঘুম আসবে না। এইখানে বসেই ভোর হওয়ার অপেক্ষা করি। তাছাড়া এই মুহূর্তে আর কী-ই বা করার আছে আমার?

পাঁচ

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ বছরের কিছু কমই হবে। তবু ইতিমধ্যেই তিনি ভারী বিচ্ছিরি একটা ভুঁড়ি এবং টাকের মালিক। খালি গায়ে, একটা লুঙ্গি ভাঁজ করে পরে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মিস্তিরিদের ভাড়া বাঁধার কাজের তদারক করছিলেন।

"শুভেন্দু বর্মণ কি আপনিই?"

আমার প্রশ্নে তদারকির কাজে বিঘ্ন ঘটল। স্পষ্টতই বিরক্ত হলেন। বেশ খেঁকিয়ে উঠেই বললেন, "হ্যাঁ, কেন?"

"একটু কথা ছিল।"

"কী ব্যাপারে?"

"পলা সান্যালের ব্যাপারে।"

আমার এই জবাবে শুভেন্দুবাবুর মুখে অদ্ভুত পরিবর্তন হল। পরপর কতগুলো ভাব যে সেখানে খেলা করে গেল তা বলবার নয়। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে শেষ অবধি যেটা রয়ে গেল সেটা ভয়।

"একটু দাঁড়ান।" আমাকে বললেন। তারপর গলা তুলে বললেন, "বাবলু, আমার পাঞ্জাবিটা দে তো।"

বাবলু নয়, এক মহিলা বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই শুভেন্দুবাবুর ভয়ের কারণটা বুঝতে পারলাম। ছোটো ছোটো চোখ। ভোঁতা নাক মুখ। ভারী চেহারা। স্লিভলেস নাইটির এদিক ওদিক দিয়ে লাল টুকটুকে ব্রায়ের স্ট্র্যাপ, বগলের চুল, থলথলে বুকের ওপরের অর্দ্ধাংশ এই সব উঁকি মারছে। কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। মিসেস

বর্মণ গ্রিলের ফাঁক দিয়ে একটা পুঁটুলি পাকানো ফতুয়া শুভেন্দুবাবুর প্রায় মুখের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে খর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "এই বেলা একটার সময় আবার কোন রাজকার্যে চললে শুনি?"

শুভেন্দুবাবু দেখলাম অক্লেশে মিথ্যে কথা বললেন, "এই যে, ইনি বলছেন সস্তায় স্টোন চিপস দিতে পারবেন। একটু কথা বলে আসি।"

আর বেশি দেরি না করে ফতুয়াটা মাথা দিয়ে গলাতে গলাতেই হাঁটা শুরু করলেন। পেছন পেছন আমি। গলি থেকে মেন রোডে বেরিয়ে একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে দুজনে বসলাম। এই দুপুরে দোকানে অন্য কোনও খরিদ্দার ছিল না। তবু শুভেন্দুবাবু গলাটা খাদে নামিয়েই বললেন, "পলার ব্যাপারে এত বছর বাদে কী কথা?"

আমার কাঁধের শান্তিনিকেতনি ঝোলার মধ্যে জলের বোতল ছিল। শুভেন্দুবাবুর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে সেই বোতল বার করে এক ঢোঁক জল গলায় না ঢেলে পারলাম না। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঘোরাঘুরি করছি। কাল সারারাত বৃষ্টি হওয়ার পর আজ রোদটাও ফুটেছে বেশ চড়চড়ে। সেই রোদ্দুর মাথায় নিয়ে প্রথমে গিয়েছিলাম আসানসোল সেন্ট্রাল এক্সাইজের অফিসে। ভেবেছিলাম, পনেরো বছরের আগের সেই তরুণ চাকুরীপ্রার্থী যদি সেখানেই শেষ অবধি চাকরি পেয়ে গিয়ে থাকে।

কপাল ভালো। আমার আন্দাজ দেখলাম নির্ভুল। শুভেন্দুবাবু ওই দপ্তরেই কাজ করেন বটে, তবে আসানসোল অফিসে নয়। তাঁর পোস্টিং এখন রানিগঞ্জে।

রানিগঞ্জ অফিসে গিয়ে শুনলাম শুভেন্দু বর্মণ কয়েকদিনের ছুটিতে আছেন। বাড়ির ঠিকানা পেলাম অবশ্য রানিগঞ্জ স্কুলপাড়ায়। এইভাবেই পৌঁছেছি এখানে। কাজেই গলা শুকোনো তো স্বাভাবিক।

শুভেন্দু বর্মণ তখনও শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। আস্তে আস্তে তাঁকে সব কথাই খুলে বললাম। পলার পাগলামির কথা, ঘোরের মধ্যে শুভেন্দু শুভেন্দু বলে চিৎকার করে ওঠার কথা, সব। কিছুই লুকোলাম না।

আমার কথা শুনতে শুনতে শুভেন্দু বর্মণের মুখটা অদ্ভুতভাবে ভেঙেচুরে বদলে যাচ্ছিল। অবাক হয়ে দেখলাম, নিতান্ত বৈষয়িক, মিথ্যেবাদী এবং রুক্ষ মানুষটার মুখে বেদনার ছায়া পড়ল। আরও কী যেন একটা ছিল সেই মুখে।

তার পরের কথাটায় বুঝলাম যা ছিল তার নাম অপরাধবোধ।

শুভেন্দুবাবু একটানা অনেকক্ষণ কথা বললেন। যা শোনালেন তা সত্যিই এক নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি।

বললেন, “আজ এতদিন বাদে এ কথা বললে, কারোরই কোনও ক্ষতি নেই, না আমার, না পলার। পলাকে আমি কোনওদিনই ভালোবাসিনি। কেন বাসব? ওই কুৎসিত মেয়েকে ভালোবাসা যায়? আপনি পেরেছেন?

“যে সময় সান্যালসাহেবরা এখানে এসেছিলেন তখন সবে আমার বাবা মারা গেছেন। আমরা প্রচণ্ড দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। মা, ভাই, বোন আমি নিজে, সকলেই আধপেটা খেয়ে, কখনও না খেয়ে থাকি। বোনেদের স্কুলে পড়া বন্ধ হবার মুখে। সেইজন্যেই আমার একটা চাকরির দরকার ছিল, ভীষণ দরকার।

“আমি চাকরির লোভে পলার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছিলাম। পলা, ঝিনুক কিংবা ওদের মা, কেউ একটা কথা জানেন না। জানেন শুধু পলার বাবা। আমি তাঁকেই বলেছিলাম, আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিন। আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করব।

“ভদ্রলোক তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, আমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। একরকম ঘাড় ধরেই আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন, সেকথা শুনেছেন নিশ্চয়।

“এইমাত্র যে মহিলাকে আমার বাড়িতে দেখলেন, আমার স্ত্রী, সেও সেন্ট্রাল এক্সাইজের বড়ো অফিসারের মেয়ে। যে প্রস্তাবে সান্যালসাহেব রাজি হননি, সে প্রস্তাবে ওর বাবা রাজি হয়েছিল।”

একটু থেমে শুভেন্দু বর্মণ বললেন, “এক দিক থেকে বোধ হয় ভালোই হয়েছে বুঝলেন। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে পলা আরও আগেই পাগল হয়ে যেত।”

“কেন?” অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

শুভেন্দু বললেন, “একদিন না একদিন তো বুঝতে পেরে যেত তো, ওসব ভালোবাসা-টাসা কিছু নয়। পুরোটাই ধান্দাবাজি। এই আমার বর্তমান স্ত্রী যেমন বুঝতে পেরেছে। ও অবশ্য নিজে পাগল হয়নি, আমাকে পাগল করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। প্রচণ্ড ঘেন্না, প্রচণ্ড রাগ আমার ওপর। জ্বলে গেলাম একেবারে।

“তবু মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানেন? মনে হয় পলার সঙ্গে বিয়ে হলে হয়তো জীবনটা অন্যরকম হলেও হতে পারত। আমি তো জানি, ও আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসত। হয়তো ক্ষমা করে দিত আমাকে। আর আমিও হয়তো পাশাপাশি থাকতে থাকতে একদিন সত্যি করেই ওকে ভালোবেসে ফেলতাম।

“কিন্তু সেসব ভেবে আর লাভ কী? অনেক দেরি হয়ে গেছে। আপনি ভাই বাড়ি ফিরে পলাকে বলে দিন, শুভেন্দু বর্মণ জি টি রোডে লরি চাপা পড়ে মরে গেছে। সেটাই ভালো হবে।”

আমার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। দোকানির বাড়িয়ে দেওয়া চায়ের কাপ পড়ে রইল, আমি শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে আর দ্বিতীয় কোনও কথা না বলে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তার ধার দিয়ে মাথা নীচু করে হাঁটতে শুরু করলাম। পেছন থেকে একবার একটা অস্ফুট ডাক ভেসে এল, "এই যে ভাই শুনছেন?" কিন্তু তারপরে মাঝপথেই সেই ডাক থেমে গেল। শুভেন্দু বর্মণ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমার মনের অবস্থাটা।

চড়া রোদ্দুর মাথায় নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, পলার আর কী বাকি রইল? ধু ধু মরুভূমির মধ্যে যে একটুকরো শ্যামলিমার দিকে চোখ রেখে ও হাঁটছিল, আজ আমি জেনে গেলাম, সেটাও ছিল মরীচিকা।

আসানসোল থেকে কলকাতায় ফিরলাম রবিবার রাতে। এর মধ্যে ঝিনুকের সঙ্গে ফোনে অল্পসল্প কথা হয়েছে। শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা করার কথা ওকে কিছুই বলিনি, মানে বলতে পারিনি। বলতে গেলেই কে যেন গলা টিপে ধরছে।

সোমবার অফিস থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে পূর্বাচল হাউসিং-এর গেটে গিয়ে দাঁড়ালাম। আগেই ফোন করে ঝিনুককে বলে রেখেছিলাম আমি আসছি। ও আর পলা গেটের বাইরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। পলার পরনে একটা সাদার ওপর নীল সুতোর চিকনকারি কাজ করা চুড়িদার। আমাকে দেখে একগাল হাসল। স্বাভাবিক স্বচ্ছ হাসি। ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে বলল, "দিদিকে নিয়ে তোরা কী বিপদে পড়েছিস, বল?"

ঝিনুক বলল, "তোকে আর জ্ঞান দিতে হবে না। তাড়াতাড়ি চল। সাড়ে ছটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এখনই ছটা বেজে গেল।"

বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে ডাক্তার ব্যানার্জীর নাম আগেই শোনা ছিল। চেম্বারে ঢুকে দেখলাম মুখটাও চেনা টিভি-র কল্যাণে। আজকাল দুয়েকটা বাংলা চ্যানেলে মনের স্বাস্থ্যের ওপরে কিছু অনুষ্ঠান হয়। তারই একটায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে ইনি নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

চেম্বারের ভেতরে মৃদু সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছিল। ডাক্তার ব্যানার্জী ছাড়া আরও এক সুন্দরী মহিলা ওই ঘরের ভেতরেই ছিলেন। তাঁকে দেখে ঠিক সহকারিনী মনে হল না। পরে ঝিনুক বলেছিল, উনি নাকি ডাক্তারবাবুর স্ত্রী। উনিও পেশাদার কাউন্সেলর।

ঘরে ঢোকা মাত্রই ডাক্তারবাবু হাতের কাছে রাখা যার থেকে একটা করে টফি বের করে আমাদের তিনজনের হাতে ধরিয়ে দিলেন। মুখে স্নিগ্ধ হাসি। বুঝতে অসুবিধে হয় না, ঘরের এই মৃদু আলো, এই জ্ঞান, টফি এবং শান্ত হাসি — সবই রুগিদের টেনশন কমিয়ে আনার লক্ষ্যে।

ঝিনুকের হাত থেকে পলার আগের প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে, একপলক চোখ বুলিয়েই ডাক্তার ব্যানার্জী আমাকে আর ঝিনুককে বললেন, "আপনারা একটু বাইরে ওয়েট করুন, প্লিজ। আমি পলার সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা সেরে নিই।" তাঁর বলার ভঙ্গীতে পলাও হেসে উঠল। যদিও মনে মনে জানছিলাম, যেটা হবে, সেটা সাইকো অ্যানালিসিস। ডাক্তারবাবু জানেন, সেই মন-মন্থনের জেরে পলার অবচেতনের অন্ধকার থেকে এমন কোনও হলাহল উঠে আসতে পারে, যার বিষাক্ত ধোঁয়া অসহ্য লাগবে তার বোন কিংবা বোনের প্রেমিকের কাছে। সেই কারণেই আমাদের নির্বাসন।

আমি আর ঝিনুক বাইরে গদি আঁটা সোফায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আমাদের আশেপাশে আরও অন্তত জনা কুড়ি পেশেন্ট অপেক্ষা করছিল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম তাদের মধ্যে যুবক যুবতীর সংখ্যাই বেশি। পোশাক আশাক বলে দিচ্ছিল আর্থিক দিক থেকে তারা স্বচ্ছল। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরই পরনে ব্র্যান্ডেড জামা-কাপড়। তাদের শরীর থেকে ভেসে আসা নানান সুগন্ধির মিলিত গন্ধে ডাক্তার ব্যানার্জীর চেম্বারের বাইরেটা ম ম করছিল। শুধু তারা কেউই মাথা সোজা রেখে বসতে পারছিল না। তারা বসেছিল হাতের দুই তালুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে। মাঝে মাঝে যখন কয়েক মুহূর্তের জন্যে মাথা তুলছিল, তখন দেখছিলাম তাদের ছড়িয়ে পড়া চোখের মণিতে গাঢ় বিপন্নতা।

ঝিনুক অবাক হয়ে ওদের দেখছিল। বলল, "কী ব্যাপার বলো তো। এত কী সমস্যা এদের, যে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে আসতে হয়েছে?"

আমি ওই ছেলেমেয়েগুলোকে ভালো করেই চিনি, মানে ওদের টাইপটাকে। আমার কাজের জায়গার আশেপাশে ওদের দলে দলে আসা যাওয়া। খুব যদি ভুল না করে থাকি, ওরা সকলেই কল-সেন্টার আর বিপিওর নীচুতলার কর্মী। এক নতুন ধরনের ক্রীতদাসপ্রথার শিকার। প্রচন্ড কাজের চাপ, সামান্যতম বিচ্যুতিতেই ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার ভয় — এইসব থেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে।

ঝিনুক একটু বাদেই অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। আপনমনে বলল, "দিদি আবার ডাক্তারবাবুকে কী সব বলে বসবে কে জানে? আমার এতদিন বিশ্বাস ছিল আমরা দুবোন দুজনের মনের সমস্ত খবর রাখি। ওর এই শুভেন্দু শুভেন্দু চিৎকারের পর সে বিশ্বাস আমার ভেঙে গেছে।"

আমি হঠাৎ করেই বলে ফেললাম, "ঝিনুক, আমি শুভেন্দু বর্মণের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।"

ঝিনুক বজ্রাহতের মতো আমার দিকে চেয়ে রইল। যেন কথাটার মানে বুঝতেই ওর বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল।

আমি বললাম, “হ্যাঁ ঝিনুক, সত্যি। শুভেন্দু আমাকে বলেছেন উনি কোনওদিনই পলাকে ভালোবাসেননি। শুধু চাকরির লোভে ওকে ফাঁসাতে চেয়েছিলেন।”

ঝিনুক কোনও উত্তর দিল না। শুধু শূন্য দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারলাম, ও ও বোধ হয় আমারই মতো বিশ্বাস করেছিল, আসানসোল শহরের কোনও এক কোণে, একজন সরল সুন্দর মানুষ এখনও তার প্রথম প্রেমের পথ চেয়ে বসে আছে। তার কাছে পৌঁছতে পারলেই পলা সমস্ত হীনম্মন্যতার হাত থেকে মুক্তি পাবে। পলা সেরে উঠবে।

ঝিনুকের সেই শেষ খড়কুটোটা আমি এইমাত্র কেড়ে নিলাম। কিন্তু আমিই বা কী করব? সত্যি কথা বলা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল কী?

আমাদের আত্মনিমগ্নতা ভেঙে দিয়ে পলা চেম্বারের বন্ধ দরজা খুলে বাইরে বেরোল। হাত নেড়ে ঝিনুককে ডেকে বলল, “শিগগির ভেতরে যা। তোর সঙ্গে ডাক্তারবাবু কথা বলবেন।”

আমিও ঝিনুকের সঙ্গে যাবার জন্যে উঠে পড়েছিলাম। ও-ই আমাকে ইশারায় বলল, দরকার নেই। বুঝলাম এক মুহূর্তের জন্যেও পলাকে একা কোথাও রেখে যেতে ও রাজি নয়।

ঝিনুক ভেতরে চলে গেল। পলা সোফায় আমার পাশে বসল। তারপর হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা ছোটো গোল আয়না বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের মুখে কী সব দেখতে দেখতে খুব ক্যাজুয়ালি আমাকে বলল, “শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করে এলে? কী বলল?”

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না!

“বলল তো, যে ও আমাকে কোনওদিনই ভালোবাসেনি? শুধু চাকরির লোভে আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করত?”

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমি পলার মুখের দিকে তাকালাম। পলাও আয়না থেকে মুখ সরিয়ে আমার চোখে চোখ রাখল। সেই চোখে এক বিন্দু অস্বাভাবিকতা নেই। বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল করছে দুটো মণি।

জানতাম, যে কোনও উন্মাদনার মধ্যে ক্ষণিক শান্ত বিরতি আসে – ‘লুসিড ইন্টারভাল’। তার রূপ যে এরকম হয় জানতাম না।

ছয়

পিচ রাস্তার শেষে অ্যাম্বাসাডরটাকে ব্রেক কষে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। বলল, "এরপর আর গাড়ি যাবে না স্যার। সরু রাস্তা তো, তাছাড়া দু পাশে গড়খাই আছে। বাকিটুকু পায়ে হেঁটে চলে যান। আমি এখানে ওয়েট করছি।"

গাড়িটা আমরা ভাড়া করেছিলাম রামকানালি স্টেশন থেকে। ড্রাইভার ছেলেটির নাম মোহন। সে বেশ হাসিখুশি এবং ভদ্র।

আমি আর ঝিনুক গাড়ি থেকে নামলাম। আমাদের সামনে দিয়ে সরু মোরামের রাস্তা এঁকেবেঁকে কিছুটা গিয়ে তারপর একটা ছোটো টিলার পেছনে হারিয়ে গিয়েছে। যেখানটায় মোহন গাড়ি দাঁড় করিয়েছে সেই পিচরাস্তা আর মোরামপথের সংযোগস্থলে একটা টিনের সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'এস ও এস ভিলেজ। এ হোম ফর ডেসটিটিউট চিলড্রেন। সাধুশালতোড়া। পুরুলিয়া।' নামের নীচে একটা তিরচিহ্ন নির্দেশ করছে ওই টিলার পেছনে হারিয়ে যাওয়া পথটাকে। অতএব আমরা দুজন সেইদিকেই পা চালালাম।

এখন শীতের পড়ন্ত দুপুর। রোদ্দুরের রঙ হলুদ হয়ে এসেছে। সেই হলুদ রোদ্দুরের ছটা পথের দু পাশের ইউক্যালিপটাস আর আকাশমণি গাছের পাতার ফাঁকফোকর গলে মাঝে মাঝেই ঝিনুকের গালে, গলায় এসে পড়ছে। আমি হাঁটতে হাঁটতেই আড়চোখে ওকে দেখছিলাম। সিঁথিতে একটা সিঁদুরের রেখা, কপালে একটা টিপ, গায়ে একটা বিয়েতে পাওয়া মেরুন শাল – এই কটা মাত্র জিনিসই যেন আমার অতিচেনা মেয়েটাকে আমার কাছে অচেনা করে দিয়েছে। ভালোলাগায় আমার বুক ভেসে যাচ্ছিল। এত সুন্দর কেউ হয়!

এত সুন্দর এই জায়গা, এত গাছপালা, এত পাখির ডাক, আর এত ঘন নীল আকাশ যে, আমরা কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের দুজনেরই বুকে পাথর হয়ে বসে থাকা সেই কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম, পলা আর কলকাতায় নেই। ওর এখনকার ঠিকানা ওই সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে – 'এস ও এস ভিলেজ, সাধুশালতোড়া, পুরুলিয়া'।

টিলাটাকে পাক দিয়ে উলটোদিকে পৌঁছতেই দেখতে পেলাম এই প্রকৃতির সঙ্গে একদম মানানসই এক ছোট্ট জনবসতি। ঠিক মাঝখানে এক অনাড়ম্বর গীর্জা। দুধসাদা চুড়োয় ঝলমল করছে সোনালি ক্রুশ। গীর্জাকে ঘিরে লাল টালি দিয়ে ছাওয়া অনেকগুলো বড়ো বড়ো দরমার ঘর। ওইগুলোই নিশ্চয় বাচ্চাদের থাকবার জায়গা,

কর্মীদেরও। এছাড়াও রয়েছে সবজিবাগান, কুয়োতলা, পোলট্রিঘর, গোয়াল। সব মিলিয়ে ঠিক যেন আমাদের ছোটোবেলায় সাজানো এক ঝুলন।

ঝিনুকের আর তর সইছিল না। ঢালু রাস্তা বেয়ে দ্রুত পা চালিয়ে ও প্রায় দৌড়েই পৌঁছে গেল ভিলেজের গেটের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। তারপর গেট পেরিয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্টের সিস্টার অ্যাগনেসকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম আমরা আসছি। আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত বাড়িয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন। মনে হল যেন ঝিনুকেরও কত কালের চেনা। অথচ উনি চেনেন কেবল আমাকে। আমি আর ঝিনুকের বাবা যখন তিনমাস আগে পলাকে এখানে রেখে যেতে এসেছিলাম তখন আলাপ হয়েছিল। ঝিনুক তখন আসেনি। আসতে পারেনি।

আজকেও যে এসেছে, সে-ও আমি অনেক বোঝানোর পর। আমি ওকে বলেছিলাম, "পলা খারাপ নেই ঝিনুক। বিশ্বাস করো, আমরা ওকে বনবাসে দিয়ে আসিনি। তুমি একবার নিজের চোখে দেখে আসবে চল তোমার দিদি কেমন আছে।"

বলেছিলাম, "তাছাড়া এই রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ডাক্তার ব্যানার্জী। তিনি কি পেশেন্টের ক্ষতি হয় এমন কিছু চাইবেন?"

আমি এই মুহূর্তে আর একবার আড়চোখে ঝিনুকের মুখের দিকে তাকালাম। ওর মনটাকে আমি খুব ভালো করে বুঝি। তাই খুব যদি ভুল না করি তাহলে এই মুহূর্তে ও কী ভাবছে আমি বলে দিতে পারি। ও ভাবছে, সিস্টার অ্যাগনেসকে ঠিক দিদির মতো দেখতে।

হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, এই কথাটা ঝিনুকের মনে না এসে যায় না। আমি যখন প্রথম সিস্টার অ্যাগনেসকে দেখি, তখন ওই আদিবাসী সন্ন্যাসিনীকে দেখে আমিও একই কথা ভেবেছিলাম। ঠিক পলার মতোই ঘোর কৃষ্ণ গায়ের রঙ, ঠিক সেইরকমই উজ্জ্বল সরল হাসি, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

এখন ঠিক পলার মতোই পরম আদরে উনি ঝিনুককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

দরজার বাইরে অনেকগুলি কচিকাঁচা কৌতূহলী মুখ উঁকিঝুঁকি মারছিল। তাদেরই একজনকে উনি বললেন, চট করে পলাদিকে ডেকে আনতে।

আমরা বসার পর উনি বললেন, "অনাবিল, আপনি বৃথাই পলাকে নিয়ে চিন্তা করছিলেন। পলা ইজ অ্যাবসল্যুটলি ও কে। বিশ্বাস করুন, এখানে আসার পর থেকে ও ভীষণ আনন্দে রয়েছে, খুশিতে রয়েছে। শুধু একটা কথা বলি, ডোন্ট গেট হার্ট।"

আমি বললাম, "না না, সে কী..."

"পলার সঙ্গে খুব বেশি যোগাযোগ রাখবেন না। ফোন করবেন না, এখানে আসবেনও না।"

ঝিনুকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এরকম নিষ্ঠুর কথার জন্যে ও প্রস্তুত ছিল না।

সিস্টার অ্যাগনেস একটা হাত আলতো করে ঝিনুকের হাতের পাতার ওপর রাখলেন। বললেন, "বুঝতেই তো পারছ, তোমাদের সঙ্গে ওর অনেক অপমানের কথা অ্যাসোসিয়েটেড। তোমাদের দেখলে, তোমাদের গলা শুনলে ওর সেই কথাগুলো মনে পড়ে যাবে। ও আবার অস্থির হয়ে উঠবে। তোমরা তো নিশ্চয়ই সেটা চাও না।"

ঝিনুক মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। আমি ওর পিঠে হাত দিয়ে বললাম, "শান্ত হও। পলা আসছে।"

সত্যিই পলা আসছিল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, উঠোন পেরিয়ে ও আসছে। ধীর পায়ে এদিকে এগিয়ে আসছে পলা। ঝিনুক তাড়াতাড়ি আঁচলে ভালো করে চোখদুটো মুছে নিয়ে সোজা হয়ে বসল।

পলা ঘরে ঢুকল। ওর হাঁটাচলা তাকানোর মধ্যে কোনও আবেগের বাড়াবাড়ি নেই। শান্তভাবেই এসে ঝিনুকের পাশের একটা চেয়ারে বসে পূর্ণ দৃষ্টিতে বোনের মুখের দিকে তাকাল। শান্ত একটা হাসি ফুটে উঠল পলার ঠোঁটে। ঝিনুকের চিবুকটা হাতের আঙুলে ধরে বলল, "কী সুন্দর লাগছে তোকে বোনু। একদম ছোটোবেলায় যেরকম সাজিয়ে দিতাম সেইরকম।"

বুঝতে পারলাম আপ্রাণ চেষ্টায় ঝিনুক চোখের জলকে ধরে রেখেছে। ও-ও খুব স্বাভাবিক গলাতেই বলল, "তুই কিন্তু একটু রোগা হয়েছিস। ভালোই লাগছে দেখতে।"

পলা এবার আমার দিকে তাকাল। আমিও ওর চোখের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে চেষ্টা করলাম সেখানে কোনও বেদনার, কোনও আক্ষেপের চিহ্ন আছে কিনা। না, নেই। বরং এক অদ্ভুত আনন্দ টলটল করছে ওর দু চোখের মণিতে। একটানা অনেকদিন জ্বর ভোগ করার পরে জ্বরছাড়ার সকালে যেরকম একটা অলস আরাম সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে সেরকমই একটা আরাম যেন ওকে জড়িয়ে রয়েছে বলে মনে হল।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

পলা কিছু না বলে আমাকে দেখছিল। ও নিশ্চয় বুঝতে পারছিল আমি কী ভাবছি। একটু বাদে বলল, "কী রে, অত চিন্তা করিস কেন সবকিছু নিয়ে?"

বললাম, "কোথায় চিন্তা করি?"

"আমি বুঝতে পারি। সবকিছু নিয়ে অত ভাবিস না। আর এখন তো রাস্তার হোটেলে খেতে হচ্ছে না। তাও মোটা হচ্ছিস না কেন?"

ঝিনুক যা পেরেছে, আমি কি তা পারব না? ভগবান, আমার বুকের ভেতর থেকে যে প্রবল কান্না গলার দিকে উঠে আসছে তা কি আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারব না?

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। বললাম, “একটা সিগারেট খেয়ে আসি তোমরা গল্প করো।”

সিস্টার অ্যাগনেস বললেন, “তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু। চা দিতে বলেছি।”

এরপর আমরা আর বেশিক্ষণ বসিনি। মোহন বলে দিয়েছিল, আসানসোল লোকাল ধরতে হলে সন্ধের একটু আগে বেরোলেই ভালো।

আবার সেই মোরামের রাস্তা। পেছন ফিরে দেখলাম এস ও এস ভিলেজের সীমানার বেড়ার গায়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে কচিকাঁচাদের দল। হাত নাড়ছেন সিস্টার অ্যাগনেস। তাদের সবারই গায়ের রঙ কালো। তাদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছে পলা।

এখন আর ওকে যন্ত্রণা দেবার মতো কোনও ফরসা বোন নেই।

❑ ❑ ❑ ❑

শেষ বিচার

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

[১]
'সত্য'ই ঈশ্বর

এক বসন্তের সকালে এই গল্পের সূচনা হয়েছিল বলসার শহরের উপকণ্ঠে এক ফলবাগিচায়। শহরের শাসনকর্ত্রী জাইমেলের এই ব্যক্তিগত বাগিচায় সচরাচর বহিরাগতদের ঢোকবার অধিকার নেই। সুগন্ধী ফুল ও ফলে ভরা পুষ্পবিতানটি অতএব ভারী নির্জন ও মনোরম।

বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি ফলবান আমগাছের নীচে, কাজ করা শ্বেতপাথরের বেঞ্চে বসে দুটি তরুণ-তরুণী গভীর আলোচনায় মগ্ন। বসবার ঘনিষ্ট ভঙ্গীটি দেখলে অনুমান করা যায় তারা প্রেমিক-প্রেমিকা। তবে তাদের আচরণে একটি রক্ষণশীল শালীনতার ছাপ রয়েছে। তরুণীটি রাজ্ঞী জাইমেলের একমাত্র কন্যা। তরুণটির এইরকম কোন কূলগৌরব না থাকলেও তার সুন্দর রূপ, দৃঢ় শরীর ও সুভদ্র আচরণে দর্শকের মনে সন্দেহ থাকে না যে সে সর্বাংশেই এই তরুণীর উপযুক্ত।

তবে মনোরম প্রকৃতি, কাম্য নির্জনতা ও প্রিয়সান্নিধ্য – পুষ্পধনুর শরসন্ধানের এই সবকটি শর্তের যৌথ উপস্থিতিতে দুটি তরুণতরুণীর মধ্যে যে ধরনের বাক্যালাপ হওয়াই স্বাভাবিক, সেই ধরনের কোনও বাক্যালাপ সেই মুহূর্তে তাদের মধ্যে চলছিল না। সেনেগ সবে সেইদিনই সকালে ভর্স্ট গ্রাম থেকে সাতদিনের সফর সেরে ফিরেছে। যে মহা আশ্চর্য বস্তুটি দেখবার জন্য সে সেই গ্রামে গিয়েছিল তারই বিবরণ দিচ্ছিল সে তার বান্ধবীটিকে।

"জামিলা তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না এই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকটি কী বিচিত্র যন্ত্রই না আবিষ্কার করেছেন! ধন্য তাঁর প্রতিভা! একটি সাধারণ লোহার নলের দুইপ্রান্তে দুইখণ্ড কাচ লাগিয়ে তার মধ্যে দিয়ে তাকালে অতিদূরকেও অতি নিকটে দেখা সম্ভব হচ্ছে।"

জামিলা আতংকিত মুখে সেনেগের দিকে ফিরে দেখল একবার। তারপর বলল, "বোলো না সেনেগ! ওই পাপকথা মানায় না তোমার মুখে। তুমি না একদিন

বলসারের যুবরাজ্ঞীর স্বামী হবে? বলসারের রাজদণ্ড যার হাতে উঠবে, সে কেমন করে এমন ঈশ্বরবিরোধী বাক্য উচ্চারণ করে?”

“ঈশ্বরবিরোধী! মানে?”

“মানে বুঝলে না প্রিয়?” জামিলা তার দীর্ঘপক্ষ আয়ত চোখদুটি এদিক ওদিক ঘুরিয়ে একবার দেখে নেয় চারদিকে, কেউ শুনে ফেলল নাকি তাদের বাক্যালাপ! তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, “ঈশ্বর আমাদের চোখ দিয়েছেন। তার নির্দিষ্ট ক্ষমতাও স্থির করে দিয়েছেন। যতটুকু দেখি তার চেয়ে বেশি দূরে দেখা যদি মানুষের পক্ষে উচিত হত তবে তো ঈশ্বরই আমাদের চোখকে আরও শক্তিশালী করতেন! তিনি তা করেননি যে, তার নিশ্চয় কোনও কারণ আছে প্রিয় সেনেগ। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে অধিক দূরে দেখবার যন্ত্র তৈরি করা – এ শয়তানের কারসাজি। না সেনেগ! এ কখনও।”

সেনেগের চোখ দুটি হাসছিল। দুই হাতের মধ্যে জামিলার হাত দুটি পরম আদরে জড়িয়ে ধরে সে বলল, “এতেই ভয় পেয়ে গেলে? বিচিত্র সেই যন্ত্রটি আরও কী কী করতে পারে তা যখন শুনবে?”

“না না, বোলো না সেনেগ!” দুই হাতে কান চাপা দিয়ে আর্তনাদ করে উঠল জামিলা। তার প্রিয় পুরুষটি যে কেন এমন রহস্যময় সব কথা বলে! ধর্মভীরু পরিবারের মেয়ে সে। দেবগৃহের শিক্ষা এতকাল তাকে যা শিখিয়েছে, কিংবা প্রধান পুরোহিত রাজকীয় ধর্মসভায় দৈব তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে ঈশ্বরের যা যা বাণী ও নির্দেশ শোনান তার প্রতিটির বিপরীত কথা বলে সেনেগ। কোথা থেকে যে এত দুঃসাহস পায়! আর সেইজন্যই বুঝি সে তার এত প্রিয়। সেইজন্যেই বুঝি তার বুকটিতে মাথা রাখতে এত ভালো লাগে জামিলার। হবেও বা!

সেনেগ অবশ্য থেমে থাকবার পাত্র নয়। অনর্গল বলে চলেছে তার ভর্স্ট গ্রামের অভিজ্ঞতার কথা। শুনতে শুনতে পাথর হয়ে যাচ্ছিল জামিলা। এ তো সাক্ষাৎ বিবহেল বিরোধী কথা। শয়তান ভর করেছে এর ঠোঁটে!

“রাতের অন্ধকারে আকাশে যে আলোকবিন্দুগুলি জ্বলে, সেইগুলির দিকে ওই আশ্চর্য যন্ত্রটি ফিরিয়ে ধরে রাতের পর রাত তাকিয়ে থেকেছি! মহাবিজ্ঞানী কপালার কাছে জেনেছি ওই আলোকবিন্দুগুলি আসলে এক একটি বিশাল জ্বলন্ত অগ্নিগোলক। দূরে বলে ক্ষুদ্র দেখায়। আর, জানো জামিলা, কপালা বলেন, প্রাণদায়িনী নক্ষত্র জিনিয়ান মোটেই সিন্টানিকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করে না। কারণ সিন্টানির চেয়ে বহুগুণে বড়ো তার আয়তন। বরং এই সিন্টানি গ্রহই ক্রমাগত ঘুরে চলেছে জিনিয়ানকে ঘিরে। এর গাণিতিক প্রমাণ রচনা করার কাজে এখন তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। সেই ব্রত উদযাপনের চেষ্টাতেই তিনি আবিষ্কার করেছেন ওই বিচিত্র নলযন্ত্র। তিনি বলেন, আমাদের এই গ্রহটি

বাদে আরও কুড়িটি গ্রহ আছে আমাদের জিনিয়ানের গ্রহমণ্ডলে। এটি সপ্তম। কপালার আবিষ্কৃত ওই নলযন্ত্র দিয়ে তাদের সকলকে আমি দেখেছি। কেউ সুবিশাল, দৈত্যসদৃশ। কেউ বা নিতান্তই বামনাকার। কারও চারদিকে বা উজ্জ্বল অঙ্গুরীয়সদৃশ বর্ণপ্রভা ছড়িয়ে আছে। আবার জিনিয়ান অস্ত গেলে সন্ধ্যার আকাশে যে দেবী ইরো স্নিগ্ধ আলো দেন, তাঁর বক্ষে রয়েছে অতিকায় সমস্ত পর্বত। দেবী নন, আমাদের এই সিন্টানিগ্রহের মতোই আরেকখানি জড়পিণ্ড সেটি। সিন্টানিকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।"

তার কথার মাঝখানেই হঠাৎ সুতীব্র আর্তনাদ করে ওঠে জামিলা, "শুনব না এই পাপ উক্তি। বিশ্বের ছাতে ওই আলোকময় চন্দ্রাতপটি ঈশ্বর বিছিয়ে রেখেছেন তাঁর সন্তানদের মঙ্গলের জন্যই। নয়তো স্বর্গের চোখ ঝলসানো প্রভায় অন্ধ হয়ে যেত আমাদের নশ্বর চোখ। তাই ওই আড়ালের আয়োজন। কেবলমাত্র মৃত্যুর পরে বিদেহী পুণ্যাত্মাদের জন্যই সরে যায় ওই আবরণ। মহাপুরোহিত চিরকাল এই কথাই বলে এসেছেন। এ-ই মহাসত্য!"

কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে থেকে তারপর সেনেগ বলল, "না জামিলা। এ সত্য নয়। মহাবিজ্ঞানী কপালা যা বলেছেন তার পক্ষে কিছু কিছু প্রমাণও তিনি দিয়েছেন তাঁর দূরদর্শক নল দিয়ে। অথচ, আকাশের ওপারে স্বর্গ যে আছে তার কোনও প্রমাণ দিতে পারবেন আমাদের মহাপুরোহিত? বলো জামিলা।"

কোমল অথচ এক আশ্চর্য দৃঢ় গলায় জামিলা বলল, "হ্যাঁ সেনেগ। অকাট্য প্রমাণ আছে। তুমি কি জানো না প্রিয় সেনেগ, আজ থেকে দীর্ঘ এক হাজার বছর আগে ঈশ্বর এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের রূপ ধরে এসে আদি পিতা ভিনটরকে ধর্মোপদেশ দিয়ে সৃষ্টি রহস্য জানিয়েছিলেন? সেইসব ধর্মোপদেশ গ্রন্থিত আছে বিবহেলের পাতায়। তার সপ্তম অধ্যায়টি খুলে দেখ। সেখানে সন্ত ভিনটরের লিখে যাওয়া বিবরণী থেকেই তোমার প্রমাণ তুমি পেয়ে যাবে।"

"টাইকরের গুহা থেকে উদ্ধার হওয়া ওই পুঁথিটির সব কথাই যে সত্যি তার প্রমাণ কী?"

"সেনেগ, আমি সাক্ষাৎ বিবহেলের কথা বলছি।"

"শুনেছি জামিলা। তবু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, বিবহেলে যে শুধু সত্যি কথাই লেখা রয়েছে তারই বা প্রমাণ কোথায়?"

"তুমি বিবহেলকে অস্বীকার করছ সেনেগ?"

"না। কেবল তার সত্যতার প্রমাণ চাইছি।"

"তুমি নাস্তিক!"

“না জামিলা। আমি ধার্মিক। প্রমাণ আমার ঈশ্বর। যুক্তি আমার পূজার উপচার। তার বাইরে কোনও বজ্রধারী দোপেয়ে ঈশ্বর অথবা তাঁর বাণীতে আমার কোনও বিশ্বাস নেই।”

হঠাৎ জামিলা তার হাতটি সেনেগের মুখের ওপর রেখে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, “ও কথা উচ্চারণ কোরো না সেনেগ। ঈশ্বর রুষ্ট হবেন। নেমে আসবে বজ্রাঘাত। তারপর শেষ বিচারের দিনে...”

“কী ভয়ানক! তাই নাকি? আমার যে বড়ো ভয় করছে! আমায় আশ্রয় দাও দেবী।”

যেন কতই না ভয় পেরেছে এমন ভঙ্গীতে যুবতীর আরও কাছে ঘেঁষে আসে যুবকটি। তারপর দু হাতে জড়িয়ে ধরে তার প্রিয়তমা নারীটিকে। তাদের অর্ধস্বচ্ছ মসৃণ ত্বকের সিলিকন কণাগুলিতে শেষ বিকেলের আলো পড়ে স্বর্ণাভ ঝিলিমিলি তোলে। তারপর একসময় দুটি ঠোঁট অন্য দুটি ঠোঁটে এসে বসে। এইবারে আর কথা নয় কোনও-

[২]

প্রজেক্ট সিন্টানি

“মাননীয় স্পিকার, জিরো আওয়ারে আমার একটি প্রশ্ন আছে। সেটি উত্থাপন করবার অনুমতি চাই।”

মহানামের ভ্রূ দুটি কুঁচকে উঠল। হ্যারল্ড পাইতর লোক সুবিধের নয়। টেক্সাস অঞ্চল থেকে সিনেটে মহাপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসছে গত পাঁচ শতক ধরে। টাকার কুমীর। পূর্বপুরুষের তেলের ব্যবসা ছিল। সপ্তবিংশ শতাব্দীতে তেলের পাট চুকেবুকে যেতে পাইতর পরিবার কোল্ড ফিউশনের ব্যবসায় এসে ঢোকে। তার চার শতাব্দী পরে হ্যারল্ডের প্রপিতামহ স্টিফেন পাইতর, আলফা সেন্টাউরিকে ঘিরে প্রথম ডাইসন রিঙটি বসান। এখন তো পৃথিবীর মোট শক্তি উৎপাদনের অর্ধেক আসে পাইতরের ডাইসন রিং ইনক্ থেকে।

লোকটা নিজে কোনওদিন কোনও মৌলিক কাজকর্ম করল না। তারাশোষা এনার্জির টাকায় ধরাকে সরাজ্ঞান করে চলে। ঐ টাকার জোরেই পাঁচ শতাব্দী ধরে বিশ্বসংসদের সদস্য হয়ে বসে আছে। যে কোনও ভালো কাজ করতে গেলে সবার আগে বাধা দেবে ওই হ্যারল্ড পাইতর। আজ আবার কী মতলব ভেঁজেছে কে জানে!

মনের ভাবটা মুখে প্রকাশ পেতে না দিয়ে মহানাম বললেন, "লিখিত না মৌখিক?"

"মৌখিকই চলবে। সামান্য একটা প্রশ্ন। অনুমতি হয় তো..."

মহানাম আড়চোখে একবার রাষ্ট্রপতির দিকে চেয়ে নিলেন। মহাথের রালাবাস ঘুঘু রাজনীতিক। মনের ভাব মুখে ফুটতে দেন না। তবে সেই নিস্পৃহতার মুখোশটির মধ্যে দিয়েও একটা চাপা উদ্বেগের আভাস মহানামের চোখ এড়াল না। আক্রমণটা কোন দিক দিয়ে আসে তাই ভাবছেন নিশ্চয়।

একটুক্ষণ থেমে থেকে সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন পাইতর। তারপর বললেন, "আমি জানতে চাই, জনতার টাকায় আর কতকাল সরকার সাদা হাতি পুষে চলবেন? ভদ্রমহোদয়গণ, আমি প্রজেক্ট সিন্টানির কথা বলছি।"

সভাকক্ষে একটা সমবেত গুঞ্জনধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল। সিনেটর পাইতরের আক্রমণগুলো সবসময়েই একেবারে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আসে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

গলা খাঁকারি দিয়ে মহানাম বললেন, "কিন্তু সিনেটর, একটা বিশুদ্ধ অ্যাকাডেমিক প্রজেক্ট নিয়ে এই প্রশ্ন কেন উঠেছে? জ্ঞানের অনুসন্ধানের জন্যে..."

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে পাইতর বললেন, "ওইখানটাতেই আমার আপত্তি মাননীয় স্পিকার! আমি ব্যবসায়ী মানুষ। জনতার অর্থ যেখানে খরচ হচ্ছে, সেখানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমি চাইব প্রত্যক্ষ লাভ। কিছু অকম্মা ইতিহাসওয়ালার শখ হয়েছে মানুষের আদি পূর্বপুরুষ কীভাবে সভ্য হল সেই কথা জানবেন। কোন মানুষ? না, প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই সত্তর আশি বছর আয়ুর প্রায় অমানুষ দোপেয়েরা। জেন্টলমেন, দু হাজার বছর আগে, খ্রিস্টীয় পঞ্চবিংশ শতকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন প্রথম দীর্ঘজীবনের কৌশল আবিষ্কার করলেন, তখন থেকেই প্রকৃত মানবসভ্যতার সূচনা।"

"ভুল করছেন বন্ধু।" ধীরস্থির একটা গলা ভেসে এল হলের পেছন দিক থেকে। ভানিসা উইলিনা কথা বলছেন। অ্যান্টার্কটিক মাতৃতন্ত্রের নির্বাচিত সিনেটর। ঠান্ডা মাথা ও তীক্ষ্ণ যুক্তিবোধের জন্য সুনাম আছে সংসদে। নিজে নামকরা ঐতিহাসিক। প্রজেক্ট সিন্টানির বর্তমান ডিরেক্টরও বটে। কৌতূহলী চোখগুলি একবার তাঁর দিকে ঘুরে দেখল। তীক্ষ্ণ একটা বাগযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে এবারে।

"ভুল? না মহোদয়া। আমি ব্যবসায়ী। হিসেবের ভুল আমার হয় না।"

"তা জানি। কিন্তু মানবসভ্যতার সূচনাবিন্দু নিয়ে আপনি যে রায় দিলেন এইমাত্র, সেটি অবশ্যই ভুল। তার কারণ, এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষ বা হোমো সেপিয়েন্সদের সূচনা তারও বহু আগে। অবশ্য ইতিহাসবিদের চেয়ে আপনার

অর্থবল অনেক বেশি সেই দাবিতে যদি আপনি নিজেকে তাঁদের চেয়ে বড়ো ইতিহাসবেত্তা বলে প্রতিষ্ঠা করতে চান তবে সেটা অন্য কথা।”

পাইতর মুহূর্তমাত্র থমকে থেকে তারপর একটু নরম গলায় বললেন, “নিজের অজান্তে যদি আপনাকে কোনও আঘাত দিয়ে থাকি তবে তার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু ঘটনা হল, খ্রিস্টীয় পঞ্চবিংশ শতকের পূর্ববর্তী সময়ের সম্বন্ধেও তো যথেষ্টই তথ্য রয়েছে আমাদের ভাণ্ডারে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে ছাপাখানা আবিষ্কার হবার পর থেকে আদিম পদ্ধতিতে হলেও মানুষ তার খুঁটিনাটি ইতিহাস লিখে রেখেছে। আপনারা কি তারও আগের ইতিহাস জানতে চান? মাপ করবেন মহোদয়া, বৃক্ষচারী নরবানরদের ইতিহাস খোঁজবার জন্য করদাতাদের পকেট কাটা যাচ্ছে দেখলে একজন সিনেটর হিসেবে তাতে বাধা দেওয়া আমার কর্তব্য বলেই আমি বিবেচনা করি।”

একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে নিজের উদ্যত রাগটা সংবরণ করলেন ভানিসা উইলিনা। তারপর ঠান্ডা গলায় বললেন, “মাধ্যমিক শিক্ষার ইতিহাসের প্রোগ্রামটি যদি আর একবার যে কোনও শিক্ষাগণকের কাছে গিয়ে ঝালিয়ে আসেন মহামান্য পাইতর, তাহলে জানতে পারবেন, যে সময়টির কথা আপনি বললেন ইতিহাসের পাঠক্রমে তাকে বলা হয় রেনেসাঁ। বহু উত্থানপতন ও বৌদ্ধিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষ পৌঁছেছিল উত্থানের সেই বিন্দুটিতে। কাঁচা মাংসখেকো অর্ধমানব পূর্বপুরুষের বৃত্তান্তে আমাদেরও কোনও আগ্রহ নেই। আমাদের মতে সভ্যতার প্রকৃত যাত্রা শুরু হয়েছিল খ্রিস্টীয় শতক-গণনার সাড়ে তিন হাজার বছর আগে, মানুষ যখন প্রথম নগরসভ্যতার পত্তন করল সেই সময়টি থেকে। তখন থেকে রেনেসাঁর সময় পর্যন্ত সভ্যতা এগিয়েছে বটে, কিন্তু তথ্যসঞ্চয়ের উপযুক্ত উপকরণ ও প্রযুক্তি না থাকায় এই সময়ের নথিভুক্ত ইতিহাসের ধারাটি খাপছাড়া ও অনেক অংশেই অনুমাননির্ভর। মাননীয় পাইতর, আমরা ব্যবসা বুঝি না। আর্থিক লাভক্ষতির হিসেবও করতে শিখিনি। আমরা শুধুমাত্র আমাদের পূর্বপুরুষের মানসিক ও সামাজিক বিবর্তনটি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে চাই। আর সেই জন্যই খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার সাল থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী অবধি কোন পথে হেঁটে মানুষ এসে পৌঁছল রেনেসাঁর বিস্ফোরণ বিন্দুটিতে সেই ইতিহাসকে একটা সুসংহত আকার দেওয়া বিশেষভাবে জরুরি বলে মনে করেন পণ্ডিতসমাজ।”

পাইতর গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর ডেস্কের গণকযন্ত্রটিতে আঙুল চালাচ্ছিলেন। এইবার মুখ তুলে বললেন, “মাননীয়া উইলিনা, আমায় যদি পাঁচ মিনিট সময় দেন তবে কিছু তথ্য আমি হাউজের সামনে পেশ করতে চাই। দয়া করে এই প্রজেকশনটি আপনারা দেখুন।”

তাঁর হাতের ইশারায় মুহূর্তে অন্ধকার নেমে এল সংসদ ভবনে। তারপর অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো আসনগুলির সামনের প্রক্ষেপণভূমিতে ধীরে ধীরে ভেসে উঠল ধীরবেগে ঘুরন্ত বায়ুমণ্ডলহীন একটি পাথুরে গ্রহের ত্রিমাত্রিক চিত্রপ্রক্ষেপ। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পাইতরের গলা ভেসে আসছিল, "মহোদয়গণ। এই হল সিন্টানি গ্রহ। জিনিয়ান নক্ষত্রকে ঘিরে ঘোরা কুড়িটি প্রাণহীন প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে সপ্তম। স্বাভাবিক মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর একশ ভাগের একভাগ। এগারোশ বছর আগে, ৩৪৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রজেক্ট সিন্টানির সূচনা ঘটানো হয়েছিল এই মৃত বস্তুপিণ্ডটির বুকে। প্রথমে এর কেন্দ্রে শক্তিশালী গ্র্যাভিটি জেনারেটর বসিয়ে মাধ্যাকর্ষণকে পৃথিবীর সমান করা হল। আপনারা জানেন নিশ্চয়, এই জেনারেটরগুলির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কী ভীষণ ব্যয়সাধ্য!"

গ্রহের ছবিটি স্বচ্ছ হয়ে গিয়ে তার ভেতরে বসানো একটি অতিকায় যন্ত্র দৃশ্যমান হয়েছে ততক্ষণে, "তারপর, আবারও বিপুল ব্যয়ে সেখানে গড়ে তোলা হল পৃথিবী সদৃশ ভূপ্রকৃতি, জলমণ্ডল ও আবহমণ্ডল।"

ঘূর্ণায়মান গ্রহটির দেহে তখন রঙ লেগেছে ফের। মহাকাশ থেকে দেখা পৃথিবীর অপরূপ লাবণ্যময় নীল-সাদার বর্ণবৈচিত্রটি গড়ে উঠেছে তার গায়ে। ঠিক যেন আর একটি পৃথিবী।

সেইদিকে আঙুল তুলে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন পাইতর, "৩৪৪২ খ্রিস্টাব্দে গ্যালাক্সির কেবল এই বাহুটিতেই নব্বই হাজারের কিছু বেশি পৃথিবীসদৃশ অথচ মানববসতিহীন জলগ্রহ আমাদের সন্ধানে ছিল। সংখ্যাটা এখন বেড়ে তিন লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছেছে। তাদের মধ্যে এখন অবধি মাত্রই দশ হাজার গ্রহকে আমরা উপনিবেশ স্থাপনের কাজে লাগাতে পেরেছি। অব্যবহৃত ওইসব অজস্র জলগ্রহের কোনও একটিকে এই পরীক্ষার জন্য বেছে নিলে কি এই বিপুল অর্থনাশ আটকানো যেত না?"

"আপনি জানেন সিনেটর, তা সম্ভব নয়। কারণ..."

"জানি মাননীয় রাষ্ট্রপতি। মানুষের বাসোপযোগী কোনও গ্রহকে নিয়ে কোনও পরীক্ষার অনুমতি নেই আমাদের আইনে। একটা সময় ছিল যখন প্রাচীন অনুসন্ধান প্রযুক্তির সাহায্যে এক দশকে একটি পৃথিবীসদৃশ জলগ্রহ খুঁজে পাওয়াও ছিল মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ আইন সেই আদিম যুগের ২৫২৯ খ্রিস্টাব্দের 'টরিসেলা' কনভেশনের ফসল। তারপর প্রযুক্তি অনেক এগিয়েছে। অবমহাকাশীয় পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হবার পর ৩১০০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই গড়ে দিনে একটি করে জলগ্রহের সন্ধান বের করে চলেছে আমাদের অবজারভেটরিগুলো। অথচ অজস্র গ্রহসম্পদের সন্ধান পাবার পরেও সেই প্রাগৈতিহাসিক আইনটিকে বদলানো হল না। আর সেই অদূরদর্শিতার ফল ভুগলেন আমাদের করদাতারা।

"কিন্তু মূর্খামির এখানেই শেষ হল না। এরপর, অকল্পনীয় অর্থব্যয়ে প্রস্তরখণ্ডটিকে গড়ে তোলা হল পৃথিবীর প্রতিরূপ হিসেবে – পার্থিব জীবজগতসহ। মাটির গভীরে বিভিন্ন স্তরে নানাজাতের কৃত্রিম জীবাশ্ম ও আদিম মানুষের ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি ছড়িয়ে রেখে তৈরি হল তার জীববিবর্তনের কৃত্রিম ইতিহাস। এর খরচ জোগালেন আমাদের করদাতারা।

"অর্কমণ্য, সমাজের বোঝা, এমন মানুষের অভাব এই গ্রহে নেই। তাদের একটা দলের স্মৃতি বদলে দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ হিসেবে স্বচ্ছন্দে পাঠিয়ে দেওয়া যেত এই গ্রহটিতে। তাতে সমাজের মঙ্গলও হত, আবার ইতিহাসবিদ পণ্ডিতরা তাদের পুনর্বিবর্তনকেই অধ্যয়ন করে তাঁদের অনর্থক জ্ঞানপিপাসা সার্থক করতে পারতেন। কিন্তু সংসদে সে প্রস্তাব ওঠানো হলেও তা গ্রহণ করা হল না। তাতে নাকি মানবসম্পদের নিম্ন মানের জন্য সঠিক ফল পাওয়া যাবে না। সমাজের বিকাশ নাকি অন্য পথ ধরবে। হাঃ!"

"কথাটা অবশ্য ঠিকই..." পেছনের সারি থেকে হনসু দ্বীপের সিনেটর জিওডন তানাকার গলা ভেসে এল, "যেমন ধরুন, একই পদ্ধতিতে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকে আমেরিকান ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ইউরোপ থেকে নিম্নস্তরের ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরের দল পাঠানোর ফলে সেখানে সুসভ্য ও সুসংস্কৃত ইউরোপীয় সমাজ নতুন করে গড়ে উঠতে পারেনি। তার বদলে সৃষ্টি হয়েছিল..."

হুলটা নিশানায় বিঁধল গিয়ে ঠিকই। ঘাড় ঘুরিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তানাকার দিকে তাকিয়ে হুংকার ছাড়লেন পাইতর, "আপনি কী ইঙ্গিত করতে চাইছেন সেনেটর তানাকা? সাহস থাকলে সোজাসুজি..."

"জেন্টলমেন, গ্রহসংসদ জাতিগত বিবাদের স্থান নয়।" মহানাম বাধা দিলেন, "প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাবেন না। আপনি বলুন মান্যবর পাইতর।"

ছিঁড়ে যাওয়া বক্তৃতার সুতোটি ফের ধরে নিলেন পাইতর, "তার বদলে আবারও বিপুল খরচে তৈরি হল সিলিকনভিত্তিক বিকল্প মানবযন্ত্র। কৃষি, পশুপালন ও কিছু প্রাচীন প্রযুক্তির জ্ঞান দিয়ে তাদের প্রোগ্রাম করে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল সিন্টানির বুকে। আর সেই থেকে এই অর্ধপশু মানবযন্ত্রগুলি বংশবিস্তার করে চলেছে ওই গ্রহটির বুকে। তাদের একের পর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, তাদের বিবমিষা উদ্রেককারী হিংস্র ও অসভ্য জীবনযাত্রা এবং চিন্তাভাবনার যাবতীয় তথ্য গত এক সহস্রাব্দী ধরে সঞ্চয় করে রাখা হচ্ছে গোপন সরকারি যন্ত্রমস্তিষ্কে। তাতেই নাকি ধরা পড়বে প্রাক রেনেসাঁ মানবসমাজের বিবর্তনের সম্পূর্ণ ইতিহাস! অথচ তাদেরই অর্থে তৈরি এই বিশাল প্রজেক্টের ফলাফল জানবার কোনও অধিকার দেওয়া হয়নি জনসাধারণকে। মাননীয়

স্পিকার, আমার প্রশ্ন হল কেন এইবারে এই পরীক্ষাটিকে বন্ধ করে দিয়ে জনতার অর্থের অপচয় রোধ করা হবে না?”

সিন্টানির ত্রিমাত্রিক ছবিটি উধাও হয়ে সভাকক্ষের আলোগুলি ফের জ্বলে উঠেছে। মরা মাছের মতো চোখদুটি মেলে নীরবে বসে ছিলেন হ্যারল্ড পাইতর। সেইদিকে তাকিয়ে মাসকয়েক আগের একটা সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেল মহাথের রালাবাসের। আজকের দিনটা সেই সন্ধ্যারই পরিণতি তাহলে! তাঁকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করে খাবার টেবিলেই প্রস্তাবটা রেখেছিলেন পাইতর। সিন্টানি গ্রহটাকে তিনি লিজ নিতে চান। তার সমস্ত বাসিন্দাসহ। জিনিয়ান নক্ষত্রের বিকিরণমান ও ভর অবিকল আলফা সেন্টাউরির মতোই। শক্তিশোষক প্ল্যান্ট তৈরির জন্য এই মাপটি আদর্শ। সিন্টানিকে ভিত্তি করে জিনিয়ানকে ঘিরে দ্বিতীয় একটি ডাইসন রিং বসাতে চান পাইতর। জিনিয়ানীয় নক্ষত্রমণ্ডলের একশ আলোকবর্ষ ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা দু হাজারেরও বেশি উপনিবেশগ্রহে শক্তি সরবরাহ করা যাবে এই প্ল্যান্টটি থেকে। লভ্যাংশের শতকরা দু ভাগ মহাথেরকে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। সেইসঙ্গে বোরিয়া গ্রহের সুবর্ণসাগরের তটে একটি বিলাসগৃহ। মহাথের রালাবাস প্রত্যাখ্যান করবার আগে দুবার ভাবেননি। অর্থ দিয়ে কেউ তাঁকে কিনতে চাইতে পারে এটা তাঁর স্বপ্নেরও অতীত ছিল। তাছাড়া, এ রকম অসাধারণ একটা প্রজেক্টকে এইভাবে বেচে দিতে তিনি পারবেন না।

সেই প্রত্যাখ্যানেরই বদলা নিচ্ছেন তবে পাইতর। ধুরন্ধর রাজনীতিকটি খুব ভালো করেই জানেন তাঁর কথাকে সরাসরি বাতিল করে দিলে রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটবে রালাবাসের। মুখে একটা ধারালো হাসি ফুটিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

ধীরে ধীরে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রাষ্ট্রপতি রালাবাস। মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় বললেন, “প্রশ্নটা যেহেতু রাষ্ট্রীয় প্রজেক্ট নিয়ে, অতএব আপনারা বা আমার ব্যক্তিগত মতামতে কোনও কাজ এতে হবে না। আপনি যদি প্রস্তাব করেন, তবে এ ব্যাপারে একটা মতদানের আয়োজন করা যেতে পারে। তার রায় আমার দপ্তর নিঃশর্তে মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।”

“দাঁড়ান দাঁড়ান মহামান্য রাষ্ট্রপতি। সংসদে আপনার দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংবাদ আমার অজানা নেই। কাজেই মতদানের ফলাফল কী হবে তা আমার ভালোই জানা আছে। তাতে আমি রাজি নই...”

বলতে বলতেই স্পিকারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে পাইতর বললেন, “মতদানের বদলে আমি আরও একটি প্রশ্ন রাখতে চাই এ বিষয়ে। অনুমতি পাব কী?”

মহানাম মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। আইন অনুসারে সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন করবার অধিকার সিনেটরদের আছে।

"মাননীয় রাষ্ট্রপতি, স্বাভাবিক অবস্থায় আর ঠিক কতদিন আয়ু নির্দিষ্ট রয়েছে এই প্রজেক্টটির?"

"যতদিন না সিন্টানিজ সমাজ রেনেসাঁর বিন্দুটিতে এসে পৌঁছয়।"

"সেটা ঠিক কতদিন তা আপনি আমাদের জানাবেন কি?"

"মাননীয় পাইতর, ভবিষ্যদ্দর্শনের কৌশল আমার জানা নেই।"

"হুম। তাহলে প্রশ্নটা একটু অন্যভাবে রাখব। মাননীয়া ভানিসা উইলিনা, আপনি তো প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ। আপনার শেষতম গবেষণাগ্রন্থ 'রেনেসাঁ ও তার পরে' বইটির কপি সংসদের অর্কাইভে রয়েছে। তার সত্তর নম্বর পাতার একটি প্রক্ষেপণ আমাদের দেখাবেন কি?"

নিজের ডেস্কের দু-একটি বোতামের ওপর হালকাভাবে আঙুল চালালেন ভানিসা। প্রক্ষেপণক্ষেত্রে আলোর অক্ষরে কিছু বাক্যের সারি ফুটে উঠল।

"বেশ। এইবার মহোদয়গণ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ লাইনদুটির দিকে একবার দেখুন। আমার ইতিহাসবেত্তা বন্ধুটি এইখানে লিখেছেন – 'প্রকৃত অর্থে জ্ঞান ও জীবনচর্চার ওপর চার্চের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মানুষের যুক্তিবাদী বিরোধ প্রকাশই ছিল, অজ্ঞতার যুগ থেকে মানবজাতির পুণর্জাগরণ বা রেনেসাঁর সূচনাবিন্দু।'

"মহোদয়গণ, আপনারা ইতিহাসের পন্ডিত নন। আমিও নই। তবুও সাধারণ ধ্যানধারণা থেকেই আমি ডক্টর উইলিনার বক্তব্যটিকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাই। আপনারাও আশা করি এই সরল সত্যটিকে সমর্থন করবেন। যদি কেউ এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন তবে হাত তুলে ইঙ্গিত করবেন দয়া করে।"

কোনও হাত উঠল না। মিনিটখানেক অপেক্ষা করে পাইতর বললেন, "আচ্ছা শ্রীমতি উইলিনা, আপনার এই তত্ত্বটি কি প্রজেক্ট সিন্টানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?"

"অবশ্যই।" ভানিসা সতর্কভাবে মাথা নাড়লেন।

"সেক্ষেত্রে সিন্টানিজরা তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে মুহূর্তে যুক্তিবাদী বিরোধ প্রকাশ শুরু করবে সে মুহূর্তে আপনার পরীক্ষা শেষ, সেইটা ধরে নিতে পারি কি?"

"হ্যাঁ।"

"সেক্ষেত্রে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল সিন্টানি গ্রহটি নিয়ে কী করা হবে সে বিষয়ে যদি একটু আলোকপাত করেন..."

"সিনেটর পাইতর, যে ঘটনাটি এখনও সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে, এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে বিচার বিবেচনা করাটা সংসদের সময়ের অপচয় বলে আমি মনে করছি।" আলোচনায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন স্পিকার মহানাম।

পাইতর তাঁর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন,"আমার প্রশ্নটির পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে মাননীয় স্পিকার, এবং যথাসময়েই আমি তা সংসদের সামনে পেশ করব।"

তারপর ফের ভানিসার দিকে চোখ ফেলে বললেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর দিন শ্রীমতী উইলিনা। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে সিন্টানিগ্রহকে নিয়ে কী করা হবে?"

"আমি এখনও ঠিক..."

"ভেবে উঠতে পারেননি। তাই তো? আচ্ছা, আমি সাহায্য করছি। আর্ন্তগ্রহ গবেষণাবিধির ৩৪৬ নং ধারাটি যদি দেখেন, তাতে বলা আছে গবেষণার প্রয়োজনে কোনও গ্রহের প্রকৃতিতে যদি বদল আনা হয়, তবে পরীক্ষা শেষ হবার পরে হয় তাকে কোনও লাভজনক কাজে লাগাতে হবে অথবা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার পূর্বতন অবস্থায়।

"এইবার বলুন মহোদয়া, একটা অর্ধসভ্য, কৃত্রিম মানবসভ্যতাযুক্ত গ্রহকে কোন অর্থকরী কাজে লাগাবেন আপনারা?"

"আমি আবার মনে করিয়ে দিতে চাই মান্যবর পাইতর, আমরা ইতিহাসবিদ। ব্যবসায়ী নই।"

"ঠিক। অন্যদিকে, আমি ব্যবসায়ী, ইতিহাসবিদ নই। আমি প্রস্তাব রাখছি, প্রজেক্ট শেষ হলে সিন্টানিকে আমি তার বাসিন্দাদের সমেত লিজ নিতে চাই। তাদের কাজে লাগিয়ে এই গ্রহটিকে ভিত্তি করে জিনিয়ান নক্ষত্রের চারপাশে দ্বিতীয় একটি ডাইসন রিং প্রতিষ্ঠা করে শক্তি উৎপাদন করবার একটি পরিকল্পনা আছে আমার।"

ভানিসা মনশ্চক্ষে দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছিলেন। দানবিক যন্ত্রগুলো নক্ষত্রটিকে ঘিরে ধরে ক্রমাগত শুষে নিচ্ছে তার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিচ্ছুরণ। তারার আলো নিভে গেছে। তীব্র ঠান্ডায় জমে গেছে সিন্টানির বুক। আর তারই ওপরে দিনরাত পরিশ্রম করে চলে একদল দাস। ভবিষ্যৎ ও বর্তমানহীন একটা অস্তিত্ব শুধু।

উত্তেজিত ভাবে তিনি বলে উঠলেন, "তা হতে পারে না সিনেটর পাইতর! গ্রহের আবহাওয়া বদলে যাবে। সিন্টানির মানুষরা..."

"'যন্ত্ররা' বলুন শ্রীমতী উইলিনা! যতই মানুষের মতো দেখতে হোক, ওরা তো মানুষের হাতে তৈরি যন্ত্রমাত্র! সামান্য একটা জেনেটিক পরিবর্তন, ব্যস! অতিশীতল আবহাওয়ায় বসবাসের উপযুক্ত হয়ে যাবে সিন্টানিজ রোবটবাহিনী। সেই পরিবর্তনের খরচও না হয়..."

"দুঃখিত সিনেটর পাইতর। আইনের চোখে যা-ই হোক না কেন, আমাদের কাছে সিন্টানিজরা মানুষই বটে। তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এইভাবে শোষণ

করতে দিতে আমি রাজি নই। প্রয়োজনে আমি আমার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করব।” ভানিসা উইলিনার উত্তেজিত গলা সভাগৃহের দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলছিল।

পাইতর শীতল দৃষ্টিতে গোটা সভাটির দিকে ঘুরে দেখলেন একবার। আশাভঙ্গের সমস্ত জ্বালা এসে জড়ো হয়েছে সেই দৃষ্টিতে। তারপর কেটে কেটে বললেন, “সেক্ষেত্রে সিন্টানিকে আপনাদের ফিরিয়ে দিতে হবে তার পূর্বতন চেহারায়। এ ব্যাপারে আইন কতটা কঠোর তা শ্রীমতী উইলিনার জানা আছে নিশ্চয়। আর সেইসঙ্গে এ-ও জানিয়ে রাখছি, আইনে বদল এনে সিন্টানিকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টা হলে আমাকেও ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। লাভহীন উদ্যোগে জনতার অর্থের অপচয় আমি আটকাবই।”

অর্থাৎ সিন্টানি তোমার ভোগে না লাগলে কারও ভোগেই লাগতে পারবেনা, এই তো? মনে মনে কথাকটা আউড়ে নিয়ে মহানাম মুখ খুললেন, “সিনেটর পাইতর। আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে রয়েছে যে বিষয়টি, উপযুক্ত কারণ ছাড়া তাকে নিয়ে এখনই আলোচনা চালিয়ে যাবার অনুমতি আমি আপনাকে আর দিতে রাজি নই। আমাদের সময়ের দাম আছে। এখন—”

“আলোচনাটি কেন এই মুহূর্তেই প্রাসঙ্গিক, এইবারে সেই কারণটিতেই আসছি মাননীয় স্পিকার। তার আগে জানিয়ে রাখি, প্রজেক্ট সিন্টানির তথ্যভান্ডার জনসাধারণের নাগালের বাইরে হলেও নির্বাচিত সিনেটরদের তা দেখবার অধিকার আছে। সেই অধিকারটি কাজে লাগিয়ে সিন্টানি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ও রেকর্ডিংয়ের ওপর আমি নিয়মিত চর্চা করে থাকি। আজ থেকে সাত পার্থিব মাস আগেকার একটি দিনের খানিকটা রেকর্ডিং আমি আপনাদের দেখাতে চাই।”

বলতে বলতে সংসদভবন ফের অন্ধকার হয়ে এল। প্রক্ষেপণক্ষেত্রে ভেসে উঠেছে একটা বাগানের ছবি। সুপরুষ এক তরুণের বাহুলগ্না সুন্দরী তরুণীটি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে শুনে চলেছে তরুণটির কথা। “প্রমাণ আমার ঈশ্বর। যুক্তি আমার পূজার উপাচার। তার বাইরে কোনও বজ্রধারী দোপেয়ে ঈশ্বর অথবা তাঁর বাণীতে আমার কোনও বিশ্বাস নেই...”

*****

আলো জ্বলে উঠেছে বহুক্ষণ আগে। প্রক্ষেপণক্ষেত্রের ছবিগুলিও উধাও। গোটা সভা নির্বাক হয়ে সেই শূন্য জায়গাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। নীরবতা ভাঙলেন মহানাম। নীচু গলায়, প্রায় আত্মগতভাবে বলে উঠলেন, “এত তাড়াতাড়ি! কিন্তু...”

"না মাননীয় স্পিকার। এতে 'কিন্তু'র কোনও স্থান নেই। সিন্টানির আকাশে নিয়ম করে নজরদারি করে চলা কুড়িটি গুপ্তচর উপগ্রহের মধ্যে একটির রেকর্ডিং এই দৃশ্যটি। আর তাই থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হচ্ছে, রেনেসাঁর সূচনাবিন্দুটিতে এসে পৌঁছে গিয়েছে সিন্টানির সমাজ।"

"কিন্তু, মাত্র এক হাজার বছরে! কেমন করে..."

"সে প্রশ্ন আমাকে কেন করছেন? আমি সামান্য ব্যবসায়ীমাত্র। বিজ্ঞান তো আমি বুঝি না! তার জবাব তো দেবেন প্রজেক্টের ডিরেক্টর। এই প্রজেক্টের খুঁটিনাটি বিবরণ তো ওঁর জানবার কথা। আমার নয়। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকুই – প্রজেক্ট সিন্টানি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।"

ভানিসা উইলিনার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল। হাত দিয়ে সেগুলিকে মুছে ফেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। "মাননীয় স্পিকার। এ বিষয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নেবার সময় আসেনি। একটি তরুণের একটামাত্র উক্তিকে ভিত্তি করে এতবড়ো একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। আমাদের আরও তথ্য চাই।"

মহানাম কিছু বলবার আগেই পাইতর ফের কথা বললেন, "ঠিক কী কী তথ্য আপনার দরকার তা একটু বলবেন শ্রীমতী উইলিনা?"

"বলব। মানুষের প্রাচীন ইতিহাসের টুকরো-টাকরা যেটুকু পাওয়া যায়, তা যদি ঘেঁটে দেখেন, তাহলে দেখবেন, ইতিহাসে এই সূচনাবিন্দুটি বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। মানুষ বারবার চ্যালেঞ্জ করে বসেছে ঈশ্বরের ক্ষমতাকে। কিন্তু তারপর আবার তা ফুরিয়েও গিয়েছে। তার কারণ, এই চ্যালেঞ্জ একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তার সঙ্গে আসতে হবে বিজ্ঞানের উপযুক্ত উন্নয়ন ও জনতার সমর্থন। বৌদ্ধিক ও প্রযুক্তিগত, এই দুটি বিবর্তন একসাথে না ঘটলে এবং জনতার মধ্যে তা কিছুটা শেকড় না ছড়ালে প্রকৃত রেনেসাঁ আসা সম্ভব নয়। তাই আমাদের এবারে অপেক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে এই মনোভাবটি জাগবার সাথে সাথে ওই সমাজে উপযুক্ত প্রযুক্তিরও বিকাশ ঘটে কিনা, নাকি আশা জাগিয়ে তা ফের ফুরিয়ে যায়! মহামান্য পাইতর, আপনাকে আরও কিছুটা ধৈর্য ধরতে হবে। অন্তত কিছুকাল..."

*****

ভানিসার বাড়িটি নগরের উপকণ্ঠে। একাই থাকেন। আজ রাতটি তিনি বড়ো অশান্তিতে রয়েছেন। জানালার বাইরে থেকে দূরাগত গুম গুম শব্দ উঠছিল। ঝড় উঠেছে। ঝড় উঠেছে তাঁর মনের মধ্যেও। গত আড়াই শতাব্দী ধরে চলতে থাকা ঘনিষ্ঠতার ফলে সিন্টানিজরা

কখন যে পরীক্ষার গিনিপিগের বদলে তাঁর কাছে নিজের সন্তানের স্থানটি জুড়ে বসেছে তা টের পাননি ভানিসা। আজ পাইতর তাঁর মুখের সামনে আয়নাটি ধরে দিয়েছেন। নিজের অজান্তেই যে অনুভূতিটা গড়ে উঠছিল মনের মধ্যে এবারে আর তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সিন্টানিজদের দ্রুত সামাজিক বিবর্তন তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি এক মুহূর্তের জন্যও। কারণটাও তিনি অনুমান করতে পারেন। গত সহস্রাব্দীতে সিলিকনভিত্তিক যে জৈব রোবটগুলি তৈরি হত, তাদের নিউরোনের কর্মক্ষমতা সাধারণভাবে প্রাকৃতিক মানুষের অর্ধেক হত। প্রাকৃতিক মানুষের ক্ষেত্রে নিউরোনের পরিমাণ মস্তিষ্কের আয়তনের শতকরা দশভাগ। মানুষের সমান বুদ্ধিবৃত্তি রাখবার প্রয়োজনে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সিন্টানিজদের ডিজাইনে তা শতকরা কুড়িভাগ রাখা হয়েছিল।

এইখানেই সম্ভবত হিসেবে একটা ভুল রয়ে গিয়েছিল। পার্থিব জৈব রোবটেরা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আদেশপালনের কাজই করত কেবল। সিন্টানিজরা কিন্তু নিজেরা প্রকৃতির মুখোমুখি হয়ে স্বাধীনভাবে লড়াই করেছে। ফলে তাদের মস্তিষ্কের বিবর্তন নিঃসন্দেহে মানুষের হিসেবমতো ধরাবাঁধা পথে চলেনি। সেক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রজন্ম অতিক্রান্ত হতে তাদের নিউরোনের কর্মক্ষমতা বেড়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আর মস্তিষ্কে নিউরোনের সংখ্যা মানুষের তুলনায় দ্বিগুণ হওয়ায় তার কর্মক্ষমতায় সামান্যতম বৃদ্ধিও তাদের মানুষের চেয়ে বৌদ্ধিক ক্ষমতায় বেশ কয়েক পা করে এগিয়ে দেবে। সেক্ষত্রে তাদের সমাজের বির্বতনের গতি দ্রুততর হওয়াটাই স্বাভাবিক। সন্তানের দ্রুত উন্নতি দেখবার আনন্দেই বিভোর হয়েছিলেন এতকাল ভানিসা। তার উন্নতির ফল কী হতে পারে তার দিকে একেবারেই চোখ বুজে ছিলেন।

একটা গ্রহ হয় তার উন্নত বুদ্ধিমান বাসিন্দাদের নিয়ে একজন লোভী মানুষের দাসগ্রহে পরিণত হবে অথবা তার সমস্ত ভূপ্রকৃতি ও জীবজগত সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে পড়ে থাকবে একটা পাথরের পিণ্ড!

ভাবতে গিয়ে মেরুদণ্ড দিয়ে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছিল ভানিসার। এ হয় না, হতে পারে না। যে কোনও মূল্যে বাঁচাতে হবে এদের। দরকার হলে সভ্যতার স্বাভাবিক বিকাশের গতিকে বাধা দিয়ে, রেনেসাঁকে পিছিয়ে দিয়ে হলেও সমূলে ধ্বংসের মূল্যে অগ্রগতির দাম চোকাতে হয় যদি, তবে তার চেয়ে আদিম জীবনে সুখে বাঁচা বহুগুণে শ্রেয়। বেঁচে থাক ওরা। ভালো থাকুক।

ঘুম আসছিল না কিছুতেই। বেশ কিছুক্ষণ এপাশওপাশ করে ভানিসা উঠলেন। মৃদু আলোকিত দেওয়ালটি একপাশে সরে গেল তাঁর আঙুলের স্পর্শে। অবমহাকাশীয় মনোপ্রক্ষেপক যন্ত্রটি তার বিশাল ধাতব ঔজ্জ্বল্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভেতরের ঘরটিতে।

কম খরচে দূরবর্তী উপনিবেশগুলির প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য প্রত্যেক সিনেটর এই যন্ত্রটি পেয়ে থাকেন সরকারি খরচে।

তার নীচে রাখা চেয়ারটিতে এসে বসলেন ভানিসা। আজ এটি অন্য কাজে লাগবে। একটা ছোটো যন্ত্রাংশ এসে তাঁর রেটিনা স্ক্যান শেষ করে তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠল একবার। স্বয়ংক্রিয় বুদ্ধিমান যন্ত্র চিনতে পেরেছে ভানিসাকে। এবারে সে তাঁর আদেশ মেনে কাজ করবে। একটা অর্ধস্বচ্ছ টুপি এসে স্থির হল তাঁর মাথার ওপরে।

সময় হয়েছে। চোখ বুজে গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন ভানিসা। জৈব মন মিশে গেল প্রক্ষেপকের যান্ত্রিক মনের সঙ্গে। তারপর তাঁর চিন্তাস্রোতটিকে ধরে নিয়ে কোটিগুণ বিবর্ধিত করে বহির্বিশ্বে ছুঁড়ে দিল যন্ত্রটি। দেশকালের বাধা পেরিয়ে অবমহাকাশের অজ্ঞেয় পথ ধরে সেই চিন্তার ধারা অতিআলোকগতিতে বয়ে চলল জিনিয়ান নক্ষত্রের কোলের সপ্তম গ্রহটির উদ্দেশ্যে।

[৩]

রেনেসাঁর বীজোদগম

সকালটি ভারী সুন্দর। রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল বুঝি। বাগানের গাছগাছালির পাতা এখনও ভেজা রয়েছে। আকাশ পরিষ্কার। সেনেগ একটা ছোটো খুরপি হাতে বাগানে একটি ফুলগাছের গোড়ায় মাটি খুঁড়ে দিচ্ছিল। কাজ করতে করতেই মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। যতই যুক্তিবাদী হও, বংশানুক্রমে সঞ্চিত সংস্কার যাবে কোথায়? আসলে কাল ও পরশু, পরপর দুরাত দেখা স্বপ্নটি তাকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে। যুদ্ধের দেবী আলিয়ানার স্বপ্ন। রুদ্রমূর্তি দেবী তার মাথার ওপরে বজ্র উদ্যত করে বলেছেন, “সাবধান সেনেগ। ঈশ্বরের শক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলো না। অভিশাপ নেমে আসবে। সমূলে ধ্বংস হবে তোমরা। সাবধান।”

দেবীর সেই ভয়াবহ কণ্ঠের রুদ্ররোষ এখনও তার কানে বাজছে। ভোরবেলার স্বপ্ন। সত্যি হবে কি? ভাবনাটা মনে আসতেই আবার হাসি পেল তার। ভাবালু মনের বিকার। যুগযুগ ধরে শিখে আসা সংস্কার, জামিলার ভয়ার্ত মুখ ও সাবধানবাণী সব মিলিয়ে এই স্বপ্নের সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই। তবু, কোথায় যেন একটা ক্ষুদ্র কাঁটা খচখচ করে মনের মধ্যে।

সাত শতাব্দী আগে সন্ন্যাসী পত্রার্কা ‘স্বপ্নসন্দেশ’ নামে একটা পুঁথি লিখেছিলেন। তার একটি প্রাচীন কপি সম্প্রতি উদ্ধার হয়েছে। সমুদ্রপারে কালিলি নগরীর

ধর্মীয় শাসক ওবিয়ামের রাজকীয় লাইব্রেরিতে গত ছ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সংরক্ষিত ছিল তা। মাত্রই গত সপ্তাহের বৈঠকে গুরুদেব জেসিয়াস ওবেরন তার থেকে পাঠ করে শুনিয়েছেন, সেই সুদূর অতীতে কী আসাধারণভাবেই না স্বপ্নের শরীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন ঋষি পত্রার্কা।

কিন্তু সে হল সাত শতাব্দী আগের কথা। তারপর বহুকাল ধরেই তো অজ্ঞতার রাজত্ব চলেছে সিন্টানির বুকে। সেই অন্ধকার সময়ে এই সব প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান হারিয়েই গিয়েছিল একেবারে। আজ আবার নতুন করে তার সন্ধান পাওয়া শুরু হলেও বহুপুরুষের জমানো কুসংস্কারের প্রভাব যাবে কোথায়? অতএব সব বুঝেও...

পিঠে একটা মৃদু স্পর্শ পেয়ে ঘুরে তাকাল সেনেগ। তার ছোটো বোনটি কখন যেন পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। রুজবল তার বড়ো প্রিয়। তুলতুলে দেহটিকে কোলে তুলে নিয়ে তার গালে একটা চুমু খেয়ে সে বলল, "ফুল নেবে রুজবল?"

উত্তরে ঠোঁট ফুলিয়ে সে বলল, "যাও। চাই না আমার ফুল। বড়ো যে হলুদ গোলাপটা রেখেছিলাম আমার জামায় পরব বলে, তুমি কেন সেটা জামিলা দিদিকে দিয়ে দিলে সেদিন?"

"ও! সেইজন্য রাগ হয়েছে বুঝি? তুমি তো জানো না রুজবল, তোমার জামিলাদিদিকে কেমন ঠকিয়েছি আমি! লালরঙের যে বিরাট গোলাপটা আমি শুধু তোমারই জন্য ফুটিয়ে রেখেছি পশ্চিমের বাগানে, তার কথা একদম না বলে তাকে আমি বলেছি ওই বিশ্রী হলদে গোলাপটাই নাকি বাগানের সেরা ফুল। কেমন বোকা বানিয়েছি জামিলাদিদিকে বল?"

রুজবল তার তুষারশুভ্র একটি আঙুল নিজের লালাভ, নরম গালে ঠেকিয়ে বলল, "ও, তাই বুঝি? তাহলে চলো, লাল গোলাপটা তুলে দেবে!"

"তার আগে বল তো কেন এসেছিলে বাগানে?"

"আগে ফুল দাও।"

খানিক বাদে, বাগানের অন্যপ্রান্তে এসে টকটকে লাল গোলাপটি তার সবুজ বর্ণের পোশাকে গেঁথে দিয়ে সেনেগ বলল, "এইবারে বলো রুজবল।"

ভারী খুশি হয়েছে তার বোনটি। দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে টুলটুলে মুখটি তার গালে ঠেকিয়ে বলল, "জেনেভদাদা এসেছে। পুবের রোদঘরে বসে আছে তোমার জন্য। বলল তৈরি হয়ে নিতে। কোথায় নাকি যাবে তোমায় নিয়ে।"

"ওই যা! একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ সংঘের বৈঠক আছে যে! রুজবল, লক্ষ্মীটি, দৌড়ে যাও তো একবার, আমার তলোয়ারশুদ্ধু বেল্টটা নিয়ে এস তাড়াতাড়ি।"

বড়ো দেরি হয়ে গেছে আজ । বোনটিকে তলোয়ার আনতে পাঠিয়ে সেনেগ হন্তদন্ত হয়ে অশ্বশালার দিকে পা বাড়াল। গুরু জেসিয়াস ওবেরন সময়ের ব্যত্যয় একেবারেই পছন্দ করেন না। আজ জেনেভ ডাকতে না এলে সমস্যা হত একটা।

*****

"তুমিও শেষে মনোবিকলনের শিকার হলে প্রিয় সেনেগ? না না লজ্জা পেও না। সুদীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত বিশ্বাসের প্রভাব একটা থাকবেই। তারই প্রভাবে তোমার অন্ধবিশ্বাসী মন তোমার যুক্তিবাদী মনকে দাবিয়ে রাখবার একটা চেষ্টা করেছে মাত্র। তারই ফল এই দুঃস্বপ্নগুলি। এ এক ধরনের মনোবিকলন। মনের অসুস্থতা।"

"মনের... অসুস্থতা! বুঝলাম না দেব। মহর্ষি পত্রার্কার গ্রন্থে তো..."

"পত্রার্কা স্বপ্নের কারণগুলিকে বায়ু, পিত্ত ও কফ সংক্রান্ত ত্রিদোষের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাজের ওপর ভিত্তি করে সেটিকে এবারে এগিয়ে নিয়ে গেছেন আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু সাটিয়া মহামন্দিরের অধ্যক্ষ পন্ডিত জরাধ্রু। এই নতুন পুথিঁটি দেখো।"

জেসিয়াস ওবেরন আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে একটি ছাপানো পুঁথি নামিয়ে আনলেন তাক থেকে। হাতে লেখা পুঁথির বদলে এই ছাপাই পুঁথি এসে বড়ো সুবিধে হয়ে গেছে আজকাল। আইবর দ্বীপের বাসিন্দাদের সৃষ্টি ছাপাই যন্ত্রটি সওদাগরের হাতে করে এই দেশে এসে পৌঁছেছে আজ মাত্রই বছরখানেক হল। এর মধ্যেই ছাপানো পুঁথির জনপ্রিয়তা বাড়ছে হু হু করে।

"পুঁথিটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাও সেনেগ। সেখানে জরাধ্রু প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, মনও একটি যন্ত্রবিশেষ। সম্ভবত মস্তিষ্কের ভেতরকার কোনও কোষকলায় তার অবস্থান। আর দশটি দেহযন্ত্রের মতো তারও বৈকল্য আসে। অসুখ হয়। উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে তার নিরাময়ও সম্ভব। আজ সিমোক তার নতুন উদ্ভাবনটি প্রদর্শন করবার পর আমরা এই বইটি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ পাঠ করে শোনাব। সংঘের প্রায় সব সদস্যই গত দুদিনে ধরে দৈবী দুঃস্বপ্নে ভুগছে কেন তার কোন ব্যাখ্যা এতে পেলেও পাওয়া যেতে পারে।"

সেনেগ বিস্মিত হয়ে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। ওরাও দুঃস্বপ্ন দেখেছে তবে! অ-লৌকিক জাতের ভয়টা কমে এসে নতুন একটা সন্দেহ তার মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করছিল। মনের অসুখ যখন সম্ভব, তখন অজ্ঞাত কোন মহামারী নয়তো এটি? কিছুকাল আগের বিচিত্র সেই মস্তিষ্কজ্বরের মহামারীতে তারা সকলেই নিজের নিজের

প্রিয়জনকে হারিয়েছে। এই গ্রহের অর্ধেক বাসিন্দা সেই মহামারীর মুখে প্রাণ দিয়েছিল। স্বয়ং গুরু ওবেরন তার শিকার হয়েছিলেন। একরাত্রের মধ্যে তাঁর পরিবারের সব সদস্যই মারা যায় সেই রোগের প্রকোপে। অথচ তাঁর স্ত্রী ইলানা ছিলেন দেবী আলিয়ানার মন্দিরের অন্যতম প্রধান উপাসিকা! স্বয়ং দেবীও বাঁচাতে পারেননি তাঁকে সেই মহামারীর হাত থেকে।

উদ্বিগ্ন গলায় সে বলল, "নতুন আবিষ্কার প্রদর্শনের চেয়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা বেশি জরুরি নয় কি? আমি প্রস্তাব রাখছি, আবিষ্কারের প্রদর্শন মুলতুবি রেখে এই বিষয়ে আগে আলোচনা করে নেওয়া হোক। সম্ভবত স্বপ্নরোগের শিকার আমার অন্যান্য বন্ধুরাও এ বিষয়ে একমত হবেন।"

জেসিয়াস গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন, "তোমার কথার যৌক্তিকতা আমি অস্বীকার করি না সেনেগ। আলোচনাটি করবার জন্য আমিও উন্মুখ হয়ে আছি। কারণ, দৈবী দুঃস্বপ্নের শিকার আমি নিজেও। কিন্তু একজন গুরুত্বপূর্ণ অতিথির জন্য আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ভর্স্ট গ্রাম থেকে জ্যোতির্বিদ কপালা এসে পৌঁছোচ্ছেন আজ দ্বিপ্রহরে। অতি ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের শিকার হয়েছেন তিনিও। দেখছেন, স্বর্গের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবার শাস্তিস্বরূপ নরকাগ্নিতে জীবন্ত দগ্ধ করা হচ্ছে তাঁকে। গত পরশু এই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে আতংকিত হয়ে তিনি কাল আমায় একটি পত্র পাঠিয়ে জানিয়েছেন আমার পরামর্শ নিতে আজ দ্বিপ্রহরে এসে তিনি পৌঁছচ্ছেন বলসারে। তাঁর জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন।"

বলতে বলতেই সামনের সারিতে বসে থাকা একজন সদস্যের দিকে ইশারা করলেন তিনি, "এসো সিমুক, কপালা এসে পড়বার আগে যে সময়টুকু পাওয়া যায় তাতে তুমি তোমার উদ্ভাবিত যন্ত্রটি দেখাও আমাদের!"

সিমুক ছেলেটি বয়সে নিতান্তই তরুণ। এখনও কুড়ি ছোঁয়নি। একটি মাঝারি আয়তনের বিচিত্রদর্শন ধাতব কলসি হাতে নিয়ে উঠে এসে সামনে দাঁড়াল সে।

"এটি কী যন্ত্র সিমুক?"

উত্তরে লাজুক হেসে সে বলল, "এর নাম আমি রেখেছি বাষ্পধনু। সাধারণ বাষ্পকে প্রয়োগ করে যে কী অমিতশক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করা যায়, এখন তার প্রমাণ দেব আমি।"

ঘরের মাঝখানে একটি ছোটো অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তার ওপর কলসিটিকে ঝুলিয়ে দিল সে। তার একপাশে একটি ছোটো চোঙ আধহাত পরিমাণ বের হয়ে রয়েছে। চোঙের দুধারে দুটি ছোটো ছোটো ধাতব দণ্ড আটকানো। সেই দুটি ধরে ঝুলন্ত যন্ত্রটিকে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়ে চোঙকে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করা যায়। জল ঢেলে তার অর্ধেক

অংশ ভর্তি করে কলসির ঢাকনাটিকে ভালো করে প্যাঁচ কষে আটকে দিল সে। তারপর একটি মাপমতো তৈরি লোহার গুলি নিয়ে ভরে দিল নলটির মুখে। এইবারে একটি কাঠের খণ্ডকে ঘরের দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এসে কলসির দণ্ডদুটিকে ধরে চোঙটি সেই কাঠের খণ্ডের দিকে তাক করে হাঁটু গেড়ে বসল সিমুক। বাকি দর্শকরা ততক্ষণে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে তার নির্দেশে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জল ফোটাবার শব্দ উঠল। অবরুদ্ধ বাষ্পের ধাক্কায় থরথর করে কাঁপছে কলসিটি। তারপর সহসা একটা ভয়াবহ শব্দ করে চোঙের মুখ দিয়ে ছিটকে এল উচ্চচাপের বাষ্পের স্রোত আর তার ধাক্কায় লোহার গুলিটা ছিটকে গিয়ে গভীরভাবে গেঁথে গেল কাঠের খণ্ডটির গায়ে। পেছন থেকে সিমুকের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল, "মান্যবর, ভেবে দেখুন, লোহার গুলি ও ক্ষুদ্র পাত্রের বদলে দানবাকৃতি বাষ্পকলস ও লৌহগোলক ব্যবহার করলে কত সহজেই দূর থেকে শত্রুর দুর্গ গুঁড়িয়ে দেওয়া সম্ভবপর হবে; সম্মুখযুদ্ধে প্রাণহানির ভয় থাকবে না আর। বর্বর সিহামুরদের আক্রমণে শৈশবেই আমার বাবা ও দাদা সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। আমার একমাত্র বোনটি কোন দেশে ক্রীতদাসীর জীবন কাটাচ্ছে কে জানে! এইবারে এই অস্ত্রের সহায়তায় বলসারের অজেয় বাহিনী সদম্ভে আক্রমণ করবে সিহামুরদের ঘাঁটি। তারপর তাদের প্রতিরোধ ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে শত্রুর রক্তে... ও হো হো..."

আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে সিমুকের। গোটা ঘরটি তখন করতালিধ্বনিতে ভরে উঠেছে। জেসিয়ার ওবেরন উঠে এসে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটি মানুষকে ঘিরে তখন দাঁড়িয়ে উঠেছে ঘরের সকলে মিলে। অবরুদ্ধ গলায় জেসিয়াস বলে চলেছিলেন, "ধন্য তুমি সিমুক। ধন্য তোমার পিতামাতা। আমি নিশ্চিত, এইবারে সংঘের অন্যান্য সদস্যরাও তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তিকে ব্যবহার করে নানাভাবে বাষ্পের শক্তিকে কাজে লাগাতে শুরু করবেন। বলসারের নেতৃত্বে সভ্যতার জয়রথ পূর্ণগতিতে এগিয়ে চলবে সিন্টানির বুকে।"

হঠাৎ সেই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যেই দূর থেকে ভেসে এল দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের শব্দ। তীব্রবেগে এইদিকেই ছুটে আসছে কেউ। ছোটবার শব্দ থেকেই আরোহীর ব্যস্ততা অনুভব করা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোড়াটি এসে থামল সভাগৃহের পাশে। তার তরুণ আরোহী সেনেগের পরিচিত। কপালার পুত্র রিসান। ঘোড়া থেকে নেমে এসে দ্বাররক্ষকের হাতে রাশটি ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুতপায়ে ঘরে এসে ঢুকে সোজা জেসিয়াস ওবেরনের সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে অবরুদ্ধ গলায় সে বলে উঠল, "বাবা..."

"কী হয়েছে তাঁর? কোন দুর্ঘটনা কি? খুলে বলো রিসানা।" তাকে কাঁধ ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিতে দিতে জেসিয়াস প্রশ্ন করলেন।

"না। আপনার কাছে আসবার পথে রাজ্ঞী জাইমেলের সেনারা তাঁকে বন্দী করেছে কিছুক্ষণ আগে। ঈশ্বরবিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাঁর বিচার হবে।"

যেন বজ্রপাত হল ঘরটির মধ্যে। আকস্মিকতার ধাক্কা খানিকটা কাটিয়ে উঠে অবরুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ওবেরন, "কোনও অত্যাচার হয়েছে কি?"

"না। বন্দী করবার সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সেনারা তাঁকে সসম্মানেই নিয়ে গেছে। যাবার আগে তিনি আমায় নির্দেশ দিয়ে গেছেন যেন তাঁর বন্দীদশায় আপনার আশ্রয়ে থাকি আমি। আপনি কি আমায় সেই অনুমতি দেবেন পিতা?"

ঘরের লোকজন এইবারে একসঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেছে। সেইসব কথার কোনওকিছুই আর স্পষ্টভাবে কানে যাচ্ছিল না সেনেগের। একটা সন্দেহ ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল তার মনের মধ্যে। তবে কি জামিলাকে কিছুকাল আগে তার বলা কথাগুলিই কোনওভাবে...

সকলের চোখের আড়ালে ঘর থেকে বার হয়ে এল সেনেগ। তারপর বন্ধনরজ্জু থেকে নিজের ঘোড়াটি খুলে নিয়ে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল প্রাসাদের দিকে।

*****

শৈশব থেকেই এই বাড়িতে অবারিত দ্বার সেনেগের জন্য। আজও তার ব্যত্যয় হল না। দ্বাররক্ষীর হাতে ঘোড়ার রাশটি ধরিয়ে দিয়ে অন্দরে ঢুকে বাঁদিকে জামিলার মহলের দিকে চলল সে। সমস্ত বাড়িটিতেই আজ কেমন যেন একটা আতংকের ছায়া। বড়ো বেশি নীরবতা চারদিকে। অথচ দিনের এই সময়টিতে প্রাসাদের এই অংশটি সর্বদাই সরগরম হয়ে থাকে।

নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল জামিলাও। আজ সেনেগকে দেখেও তার চোখেমুখে সেই চিরপরিচিত নিঃশব্দ হাসিটি ছড়িয়ে পড়ল না। উদ্বেগের মলিন ছায়া পড়েছে তার দীর্ঘপক্ষ চোখদুটিতে।

তার সামনে গিয়ে কোনও ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি জিজ্ঞাসা করল সেনেগ, "কেন এমন হল জামিলা? নির্বিরোধী একজন জ্ঞানতপস্বীকে এইভাবে অত্যাচার করলে তোমাদের ঈশ্বর কি রুষ্ট হবেন না রাজ্ঞী জাইমেলের প্রতি? এই অধর্ম তিনি করতে পারলেন কী করে?"

অশ্রুভরা জ্বলন্ত চোখদুটি তার দিকে তুলে ধরে জামিলা বলল, "অধর্ম কে করেছে তার বিচার তো মহাদেবী আলিয়ানার হাতে সেনেগ! মা তো কেবল তাঁর আজ্ঞাবাহী ভৃত্যমাত্র! আজ ভোরে তিনি আর্বিভূতা হয়েছিলেন মার স্বপ্নে। ভয়াবহ সেই

দুঃস্বপ্নে মা দেখলেন, কপালার হাতে ধরা একটা বিচিত্র নলযন্ত্রের ভেতর থেকে বের হওয়া আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে গোটা সিন্টানি। তাই দেখে উল্লাসে মত্ত একদল মানুষ। তাদের সকলের সামনে রয়েছেন কপালার অভিন্নহৃদয় বন্ধু জেসিয়স ওবেরন আর তাঁর চ্যালাচামুণ্ডার দল। শয়তানের উপাসনাসঙ্গীত গাইছে তারা সকলে মিলে। আর, তাদের দলে... সেনেগ... প্রিয়তম... তুমিও ছিলে! ওহ্‌হ্‌!"

দু হাতে মুখ ঢাকল জামিলা। খানিক পরে নিজেকে সামলে নিয়ে ফের বলল, "হঠাৎ সেই ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হয়ে এসে ক্রন্দনরতা দেবী আলিয়ানা মহাশূন্যে মিলিয়ে গেলেন। তারপর অন্ধকার আকাশ থেকে নেমে এল বিশাল বিশাল অগ্নিপিণ্ড...

"বলো সেনেগ! এখনও কি তোমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, সিন্টানির আসল শত্রু কারা? যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের নামে কারা ঈশ্বরবিরোধী ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে সিন্টানির বুকে? প্রধান পুরোহিত কুভুলা বারিকসকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল আজ ভোরে। স্বপ্নের বিচার করে তিনি জানিয়েছেন, ভর্স্ট গ্রামের ওই লোকটি শয়তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। শয়তানী ক্ষমতায় তার জাদুনলের দৃষ্টি আকাশের আবরণ ভেদ করে পৌঁছেছে স্বর্গের অন্দরমহলে। তাই ব্যথিত হয়েছেন দেবী আলিয়ানা। তাঁর অদৃশ্য হওয়া ও অগ্নিআচ্ছন্ন সিন্টানির অর্থ, শেষ বিচারের দিন সমাগত। স্বর্গ খুলে যাবে। সেই পথে নেমে আসবে অগ্নিময় দৈব রথ। তারপর প্রতিটি সিন্টানিজের পাপপুণ্যের হিসেব নিয়ে বিচার বসবে। বিচার শেষ হলে তাদের আত্মাদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে যাবেন দেবদূতেরা। তারপর ঈশ্বরের রুদ্ররোষ আগুনের রূপ ধরে নেমে এসে সব ছারখার করে দেবে... সব শেষ হয়ে যাবে সেনেগ...

"কুসঙ্গে তুমিও পড়েছ। ওই জেসিয়াস ওবেরন হলেন কপালার বাল্যবন্ধু। শয়তানের আর এক উপাসক। জেনে রেখ, কপালার বিচারের পর শিগগিরই তারও পালা আসবে। ওর সঙ্গ তোমাকে ছাড়তে হবে প্রিয়তম। নইলে বিপদে পড়বে তুমি। এতদিন শুধু আমার মুখ চেয়েই মা..."

"আমায় ক্ষমা করে এসেছেন, তাই বলতে চাইছ তো?"

জামিলা কঠিন মুখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ। বলসারের রাজদণ্ড একদিন তোমার হাতে উঠতে চলেছে। ধর্মবিরোধী কাজের জন্য আজ যদি তোমায় বন্দী করা হয়, তবে ভবিষ্যতে তা বলসারের প্রশাসনকেই দুর্বল করবে। শুধুমাত্র সেই জন্য মা, তোমার ধ্যানধারণা, কাজকর্মের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে থেকেছেন এতদিন। তবে, সবকিছুরই একটা সীমা আছে। শোনো সেনেগ। সিন্টানির নিরাপত্তার মূল্য আমার কাছে সবচেয়ে বেশি। তোমার চেয়েও। ওই লোকগুলোর সঙ্গ তোমাকে ছাড়তে হবে।"

"সম্ভব নয় জামিলা। বলসার বা সিন্টানির নিরাপত্তার চেয়েও মানুষের আত্মসম্মান নিয়ে আমার দায়বদ্ধতা বেশি। বিবহেলে বলে, ঈশ্বর খেয়ালের বশে নিজের মতো দেখতে কিছু পুতুল গড়ে তাতে প্রাণ দিয়ে আমাদের গড়েছিলেন। আমরা তাঁর হাতের পুতুল। কিন্তু তা সত্য নয়। সিন্টানিজরা স্বাধীন জীব। কারও হাতের পুতুল আমরা নই। ঈশ্বর নেই জামিলা; আর থাকলেও তিনি শক্তিহীন। নইলে যখন সেই মস্তিষ্কজ্বরের মহামারীতে আমার বাড়ির সবগুলো মানুষ মৃত্যুপথযাত্রী, তখন সদ্যোজাত বোনটিকে কোলে নিয়ে বসে কত ডেকেছি তাঁকে, কিন্তু কিছু তো করতে পারেননি তোমার ঈশ্বর! সামান্য রোগের বিরুদ্ধে নিজের সন্তানদের রক্ষা করবার শক্তি যাঁর নেই, তাঁকে কেন পুজো করব বলতে পার? সারসার মৃতদেহের সামনে বসে সেইদিন আমি ঈশ্বরে আস্থা হারিয়েছিলাম জামিলা।

"তারপর ধীরে ধীরে বিশ্বাস এসেছে বিজ্ঞানে, বুঝতে পেরেছি, মানুষের মধ্যেই আছে আসল শক্তি। দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। গোটা সিন্টানিকে আমরা সেই কথা জানাতে চাই। জানাতে চাই, ভগবান মানুষেরই কল্পনার ফসল, তার স্বপ্নের মূর্তরূপ। জানাতে চাই, সিন্টানির আকাশের বাইরে স্বর্গ নেই, আছে অনন্ত মহাকাশ, আছে অজস্র দুনিয়া, যা হয়তো একদিন মানুষের দখলে আসবে। না জামিলা। আমাদের পথ আলাদা। তোমাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু তার দোহাই দিয়ে আমার আদর্শ, আমার বিশ্বাসকে তুমি আমায় ছাড়তে বোলো না।"

"তাহলে যে আমাকে ছাড়তে হবে! বলসারের রাজত্ব ছাড়তে হবে! পারবে সেনেগ?"

দুটি নরম হাত মধুর আলিঙ্গানে জড়িয়ে ধরে তরুণটির গলা। একটি পা তুলে শরীরটিকে তার শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তার চোখের কাছে চোখদুটি তুলে ধরে চেয়ে থাকে জামিলা।

তার হাতদুটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সেনেগ। তার দেহভঙ্গী ও দৃষ্টি শতমুখে একটি কথাকেই প্রকাশ করে চলে বারংবার – জামিলা হেরে গেছে। কানদুটো গরম হয়ে উঠছিল জামিলার। যাকে একটিবারমাত্র দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে গোটা বলসারের পুরুষকূল, তার আলিঙ্গানকে কেউ যে অস্বীকার করতে পারে এ কথা তার কল্পনারও বাইরে ছিল।

রাগলে পরে ভারী সুন্দর দেখায় জামিলাকে। নাকের পাটাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। আগুন ছুটছে দু চোখে। তার নিজের জামিলা! অথচ কত দূর! চোখ ভরে তাকে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সেনেগ। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "আমায় ক্ষমা

কোরো। কিন্তু সত্যি বলে যাকে একবার জেনেছি তাকে অস্বীকার করব কী করে? তাতে নিজেকেই প্রবঞ্চনা করা হবে যে!”

তার মুখখানিকে দু হাতে ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরল জামিলা। তারপর চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, “আর আমি? আমাদের জীবন? সেগুলো কি সত্যি নয়? কত স্বপ্ন দেখেছি আমরা সেনেগ, আমাদের আগামী জীবন নিয়ে। সেগুলো সব মিথ্যে হয়ে গেল? জেসিয়াস ওবেরন আর কপালার বিজ্ঞান ও যন্ত্রের সত্যের জন্য তুমি আ-আমাকে ছাড়বে! সেনেগ! তুমি...”

দ্বিতীয়বার তার হাতদুটি ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সেনেগ। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেও খোলা দরজার মুখে দাঁড়ানো জামিলার গলার স্বর তার কানে এসে বিঁধছিল, “সেনেগ, শোনো, আমি তোমায় ভালোবাসি... সেনেগ... তাকে এভাবে অসম্মান কোরো না! ঈশ্বর রুষ্ট হবেন। তিনি এর শাস্তি দেবেন। ভালোবাসাই সবচেয়ে বড়ো সত্য সেনেগ।”

কথাগুলি অবশ্য তরুণটির হীরকসদৃশ উজ্জ্বল, মূল্যবান ও কঠিন হৃদয়ে তখন বিশেষ সাড়া জাগাতে সক্ষম হল না। সত্যের জন্য এহেন কঠোর একটি আত্মত্যাগ করতে পেরে সে তখন এক স্বর্গীয় অনুভূতির স্বাদ পাচ্ছে। সামনে তার তখন খুলে গেছে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের আদর্শের জন্য আত্মত্যাগের উজ্জ্বল, বন্ধুর অথচ উপভোগ্য এক পথ।

*****

“মহান রাজ্ঞী, বিবহেলের সুস্পষ্ট বক্তব্য হল, পৃথিবীর আকাশ স্বর্গের আবরণমাত্র। তার পেছনে রয়েছে মানুষের অন্তিম গন্তব্য – স্বর্গ। জীবন্ত মানুষের দৃষ্টির আড়ালে তাকে রাখবার জন্যই ঈশ্বর আকাশের আবরণ সৃষ্টি করেছেন। রাত্রে স্বর্গনগরীর দীপালোকগুলি দেখা যায় সমস্ত আকাশ জুড়ে। তাকে পূজা করা আমাদের কর্তব্য। শয়তানের পূজারি কপালা সেই স্বর্গীয় গবাক্ষগুলিকে কাছে থেকে দেখবার জন্য এক কুৎসিত জাদুনলের সৃষ্টি করেছে। তার সাহায্যে সেই গবাক্ষগুলির ভেতর দিয়ে স্বর্গের অন্দরমহলে তার অপবিত্র দৃষ্টি ফেলে সে বিবহেলকে অবমাননা করে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আর এই যন্ত্র সৃষ্টি করবার পথে প্রতি পদে তাকে সহায়তা করেছেন যিনি তাঁর নামটিও আমরা অনুমান করে নিতে পারি। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের নামে ভুলিয়ে এই নগরের বহু তরুণকেই শয়তানের পথে টেনে নিয়ে চলেছেন তিনি। শৃগালধূর্ত এই শয়তানের চরের অপকর্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ জোগাড় করার চেষ্টা চলেছে। ঈশ্বর সহায় হলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সে চেষ্টা সফলও হবে। তখন তাঁরও বিচারের দিন আসবে।

"তবে আজ ঈশ্বর তাঁর ন্যায়দণ্ড উত্তোলন করেছেন শয়তানের দূত আবে কপালার প্রতি। আমি আমার বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ কপালার সৃষ্ট জাদুনলটির ক্ষমতা এই সভায় প্রদর্শন করে দেখাতে চাই।"

"অনুমতি দেওয়া হল।" রাজ্ঞী জাইমেল নিজেও কৌতূহল অনুভব করছিলেন এই জাদুকরী যন্ত্রটির প্রতি। জাদুর প্রতি আকর্ষণ বোধ হয় মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র।

কয়েক মিনিট পরে মহাপূজারি ফিরে এলেন একটি লম্বাটে নল হাতে করে। তার দুপাশে দুটি গোলাকার কাচখণ্ড আটকানো। একটা মাথা অন্য মাথাটি থেকে বেড়-এ একটু ছোটো। সসম্মানে সেটি রাজ্ঞী জাইমেলের হাতে তুলে দিয়ে মহাপূজারি বললেন, "ভালো করে দেখুন রাজ্ঞী। সাধারণ একটা কাচলাগানো নল মাত্র। কোন যন্ত্রের কারিকুরি এতে নেই।"

"বেশ। কিন্তু এটি কীভাবে কাজ করে?"

"সহজ ব্যাপার। জানালা দিয়ে বহুদূরের টারগ্লা পর্বতশিরার যে নীলচে দাগটা দেখা যাচ্ছে সেই দিকে নলটি তুলে ধরে তার কাচের ভেতর দিয়ে তাকালেই বুঝতে পারবেন।"

রাজ্ঞী জাইমেল সেইমতো নলটি চোখের সামনে ধরে এক মুহূর্তের জন্য জানালা দিয়ে তাকিয়েই সভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন। অতিদূরে সেই পর্বতের দেহের প্রতিটি পাথরের খণ্ড, বৃক্ষলতা, এমনকী একটি গাছের গায়ে পাখির একটি বাসা অবধি তাঁর চোখে পড়েছে তার ভেতর দিয়ে। তাঁর আতঙ্কে অবশ আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে নলটি পাথরের ওপর ঠংঠং শব্দ করে গড়িয়ে গেল একদিকে। তার কাচদুটি চূর্ণ হয়ে গেছে।

গড়িয়ে আসা নলটির সামনে থেকে সভয়ে সরে যাচ্ছিল বিচারসভায় আসা কৌতূহলী দর্শকের দল। লৌহমানবী জাইমেল, তলোয়ারের এক আঘাতে দুষ্কৃতির শিরচ্ছেদ করতে যাঁর চোখের একটি পাতাও কাঁপে না, সেই জাইমেলের মুখে আতঙ্কের ছায়া দেখে ভয়ের একটা শিরশিরানি ছড়িয়ে পড়ল গোটা সভাতেই। রাজ্ঞীর গতরাত্রের স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার কথা তাদের অজানা নেই আর।

তারপর হঠাৎ জনতার মধ্যে থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে একটা চিৎকার ভেসে এল। মধ্যবয়স্ক একজন পুরুষ একখণ্ড পাথর মাথার ওপর তুলে ধরে ছুটে আসছিলেন জনতার ভিড় ঠেলে। সামনে এসে পৌঁছে তিনি আবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, "শয়তানী জাদুযন্ত্র নিপাত যাক। শয়তানের পূজারির মৃত্যু চাই। আর তারপর হাতের পাথরটি দিয়ে বারংবার আঘাত করতে লাগলেন পড়ে থাকা নলটির ওপরে। দর্শকের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ দাবনলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সেই ধ্বনি। মন্ত্রোচ্চারণের মতোই একসঙ্গে উচ্চারিত

হচ্ছিল জনতার দাবি, “আমরা কপালার বলি চাই। অগ্নিকুণ্ডে তাকে জীবন্ত উৎসর্গ করা হোক দেবী আলিয়ানার মূর্তির পদতলে। একমাত্র তাতেই দেবীর রোশ প্রশমিত হবে।”

*****

সেনেগ কাঁদছিল। অবাধ্য অশ্রুকণাগুলি একে একে ঝরে পড়ছে তার দু গাল বেয়ে। কাঁদছে অনেকেই। তবে সে অন্য কারণে। ধর্মের শত্রুর নিপাতের আয়োজন দেখে ভক্তির আবেশে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়েছে তাদের চোখ থেকে। ফলে সেনেগের চোখের জলকে সন্দেহ করবার কোনও কারণ তাদের ছিল না। দুটি হাতে মুখ ঢেকে সে নীরবে মিছিলের পিছুপিছু পথ হাঁটে যূথবদ্ধ জনতার সাথে। বধ্যভূমির দিকে মৌন মৃত্যুমিছিল চলেছে। আর কপালাকে একখণ্ড কাঠের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে সেটিকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মিছিলের শুরুতে। তাঁর বিধ্বস্ত দেহটির ওপরে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে কিল, চড়, থুতুর বন্যা।

হঠাৎ কোন এক অন্ধ আবেগের বশে ভিড় ঠেলে কোনওমতে মিছিলের শুরুতে ছুটে গেল সেনেগ। আঘাত করবার ছলে স্পর্শ করেছিল কপালার রক্তাক্ত মাথাটি স্পর্শ করে সকলের অগোচরে ডাকল, “মহান কপালা।”

চোখদুটি সামান্য খুলে গেলল ঋষিপ্রতিম মানুষটির। অর্ধস্ফুট দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বড়ো কষ্টে উচ্চারণ করলেন, “মাভৈঃ। বিজ্ঞানের জয়।” বাক্যটি শেষ হবার আগেই একখণ্ড পাথর উড়ে এসে সরাসরি আঘাত করল তাঁর মুখে। আর কথা বললেন না মানুষটি।

নীরবে সরে এল সেনেগ। তার কর্তব্য সে স্থির করে নিয়েছে। একজন মানুষের প্রাণ গেলে কী আসে যায়? তার নিজের হৃদয়টিকেও তো সে নিজে হাতে উপড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে মাত্রই কটি দিন আগে। সে-ও তো যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাধনার জন্যই! এই তপস্যা তাকে করে যেতেই হবে এখন থেকে...

স্তূপাকার কাঠের ভেতর কপালাসহ উৎসর্গ কাষ্ঠটিকে খাড়া করে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। কপালার চেতনা ফিরে এসেছে। নিভে ওঠবার আগের মুহূর্তের প্রদীপশিখাটির মতোই উজ্জ্বল দৃষ্টি, রক্তাক্ত চুলদাড়ির মধ্যে দিয়ে সামনে প্রসারিত।

তারপর স্তূপে আগুন লাগানো হলে, তার লেলিহান শিখার মধ্যে মিলিয়ে যেতে যেতে উন্মত্ত জনতার সম্মিলিত চিৎকারকে ছাপিয়ে উঠল তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ, “একটি নশ্বর দেহকে ধ্বংস করে সত্যকে রোখা যায় না। হাজার হাজার মানুষ গোটা সিন্টানি জুড়ে

সত্যের সাধনা করে চলেছে আজ। মহাপুরোহিত আর তাঁর বিবহেলের সাধ্য নেই যে তাকে...”

বাকি কথাগুলি চাপা পড়ে গেল লকলক করে জ্বলে ওঠা আগুনের শব্দে। তার লেলিহান শিখা তখন আকাশ ছুঁয়েছে।

[৪]

শেষ বিচারের পথে

“মহামান্য স্পিকার ও মাননীয় সেনেটরমণ্ডলী। সিন্টানির নারকীয় নরমেধযজ্ঞের যে দৃশ্যগুলি আপনাদের এতক্ষণ দেখালাম সেগুলি গত ছ মাস ধরে বিভিন্ন সময়ে রেকর্ড করা। দূরবীক্ষণ আবিষ্কারক কপালাকে পুড়িয়ে মারবার পর থেকে রাজকীয় সেনা ও সাধারণ মানুষ মিলে বলসারের গোটা সাম্রাজ্যটি জুড়ে এই হত্যাকাণ্ডগুলি চালিয়েছে এই ছ মাস জুড়ে। গ্রহটির প্রতিটি জনবসতিতে একে একে ছড়িয়ে পড়েছে ধর্মের নামে এই নরহত্যার ঢেউ। বিজ্ঞান বা নব্য ভাবনার সঙ্গে সামান্যতম যোগ আছে এমন অসংখ্য সিন্টানিজের প্রাণ গেছে এতে। অনেক নির্দোষও মারা পড়েছেন নিছক সন্দেহের বশে। রেনেসাঁর প্রথম প্রচেষ্টা এই গ্রহে ব্যর্থ হয়ে গেছে মহামান্য স্পিকার। আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে এবারে। অন্তত আরও কয়েকটা শতাব্দী...”

“ঠিক কত শতাব্দী সেটা তো নিশ্চয় বলতে পারবেন না, তাই না শ্রীমতী উইলিনা?” হ্যারল্ড পাইতরের শীতল কণ্ঠটি ভেসে এল পেছন থেকে।

“না মহামান্য পাইতর। এই পরিস্থিতিতে এ পরীক্ষাটি কবে শেষ হবে তা আমার পক্ষে এখনই বলা সম্ভব হবে না।”

“কিন্তু আমার পক্ষে বলা সম্ভব।” পাইতর মহানামের দিকে ঘুরে তাকালেন, “মহামান্য স্পিকার, আমি প্রয়োজনীয় গণনাগুলি শেষ করেছি। আর শুধু পরীক্ষা সম্পূর্ণ হবার সময়টিই নয়, এই পরীক্ষার পরিণতিটিও আমার কাছে এখন পরিষ্কার।”

“আপনার কথায় যথেষ্ট কৌতূহল অনুভব করছি মাননীয় সিনেটর। যদি একটু খুলে বলেন।”

“হ্যাঁ বলব। তবে তার আগে সিনেটর উইলিনা প্রদর্শনীর তৃতীয় হত্যাকাণ্ডের রেকর্ডিংটি আরও একবার দেখতে অনুরোধ করব।”

প্রক্ষেপণক্ষেত্রে একটি বাজারের দৃশ্য ভেসে উঠেছে। খোলা তলোয়ার হাতে একদল সৈন্য তার একপাশের একটি ঘরের ভেতর থেকে হিঁচড়ে বের করে আনল একজন বৃদ্ধকে। বুকের কাছে ভাঁজ করা একখণ্ড কাগজ প্রাণপণে চেপে ধরে রয়েছেন তিনি। কাগজটি তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খুলে ধরল একজন সৈন্য।

"এই জায়গায় ছবিটা স্থির করে রাখছি একটু। ভদ্রোমহোদয়গণ, আগের বার দ্রুতবেগে ঘটনাক্রমের সঙ্গে এগিয়ে যাবার দরুণ কিছু খুঁটিনাটি হয়তো আপনাদের নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকবে। এবারে একটু খেয়াল করে সৈন্যাটির হাতে ধরা কাগজের ছবিটি দেখুন। ছবিটা একটু বড়ো করবেন দয়া করে।"

গোটা প্রক্ষেপণক্ষেত্র জুড়ে এইবারে কাগজখণ্ডটির বিবর্ধিত ছবি ভেসে উঠেছে। সভাগৃহ থেকে একটা সম্মিলিত গুঞ্জনের শব্দ উঠল। কাগজটির গায়ে একটি সাধারণ তিনচাকা যানের ছবি। তার আসনের নীচে পেছনের চাকাদুটির মাঝখানে বসানো রয়েছে একটা বিচিত্রদর্শন ধাতব কলস। কলসের এক পাশের গর্ত দিয়ে একটি মোটা ধাতব দণ্ড অর্ধেক বের হয়ে আছে। দণ্ডটির মাথা যানের একটি চাকার পরিধির কাছাকাছি আটকানো। ফলে দণ্ডটি আগেপিছে যাওয়া আসা করলে গাড়ির চাকা তার ধাক্কায় ঘুরতে থাকবে। কলসের নীচে, শক্ত করে আটকানো একটি ধাতব পাতের ওপর একটি অগ্নিকুণ্ড।

"হ্যাঁ মহোদয়গণ। ভালো করে দেখুন। বাষ্পচালিত গাড়ি আবিষ্কারের পথে এরই মধ্যে এগিয়ে গিয়েছে সিণ্টানিবাসীরা। তবে সে প্রসঙ্গে কিছু বলবার আগে আর একবার ঘটনাটি শেষ অবধি দেখে নেওয়া যাক।"

ছবিগুলি ফের চলতে শুরু করেছে। ঈশ্বরের আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে জোরে ছোটবার শয়তানী যন্ত্র আবিষ্কার করবার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের সাজা পড়ে শোনানো হল বৃদ্ধকে। তারপর দুজন সৈন্য মিলে তাঁকে দুপাশ থেকে চেপে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখল একটা দেওয়ালের গায়ে। একটা বিচিত্রদর্শন গাড়ি ততক্ষণে টেনে এনে রাখা হয়েছে সামনে। তার ওপরে জ্বলছে একটি অগ্নিকুণ্ড। অগ্নিকুণ্ডের ওপরে ছবির ধাতুকলসটির মতো দেখতে একটি কলস, তবে আয়তনে অনেক ছোটো। কলসের দুপাশে দুটো ছোটো ছোটো দণ্ড লাগানো। একটি ছোটো নল দিয়ে ধুমায়িত বাষ্প বের হচ্ছে ক্রমাগত। একটি চিমটে দিয়ে তার মুখে একটি ধাতব গুলি আটকে দিয়ে দন্ডদুটি ধরে বৃদ্ধের দিকে নলটি তাক করে দাঁড়াল একজন সৈন্য। কয়েক মুহূর্ত পরে তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ করে নল থেকে ছিটকে গেল লোহার গুলি। পেছন পেছন বার হয়ে আসা বাষ্পস্রোতকে সঙ্গে নিয়ে আঁকাবাঁকা একটি দীর্ঘ শ্বেতসর্পের মতো গিয়ে আঘাত হানল বৃদ্ধের বুকে। রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লেন মানুষটি। সমবেত জনতার একটি অংশ তখন জয়ধ্বনি দিচ্ছে রাজ্ঞী জাইমেল ও ঈশ্বরের নামে, আর অন্য অংশটি ফেটে পড়েছে অবরুদ্ধ বিক্ষোভে। তারপর

সেই দুটি দল দুটি অতিকায় জীবের মতোই ধেয়ে গেল একে অন্যের দিকে। আবেগের তীব্রতায় যুক্তির পথ হারিয়ে শারীরিক পশুশক্তিতে নিজের নিজের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করবার আদিম চেষ্টায় মুহূর্তের মধ্যে রণাঙ্গনের চেহারা নিল গোটা চত্বরটা।

"ভদ্রোমহোদয়গণ। অবশেষে সিন্টানিজরা বাষ্পের শক্তিকে ব্যবহার করতে শিখে গেছে।"

"তাতে কী প্রমাণ হয় মাননীয় পাইতর? সেই শক্তিকে তো তারা প্রযুক্তি ধ্বংসের কাজেই লাগাচ্ছে।"

"না। আমি একমত নই। সিন্টানিতে ধর্মের নামে হত্যাকাণ্ড চলবার পাশে পাশে অনেকগুলি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে চলেছে এই মুহূর্তে। আমি সেগুলি একে একে পেশ করতে চাই।

"প্রথমে বাষ্পধনু নামে এই বাষ্পীয় কামানটি তৈরি করবার অপরাধে ধর্মীয় আদালতে সিমুক নামে এক সিন্টানিজ তরুণের প্রাণদণ্ড হয় আজ থেকে ঠিক পাঁচ মাস আগে। প্রকাশ্য রাজপথে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ধরে নিষ্ঠুরভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয় তাকে। সেই হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যও আপনাদের আগেই দেখানো হয়েছে। অথচ উদ্ভাবনের কয়েক মাসের মধ্যে সেই আবিষ্কারটিকেই প্রয়োজনীয় অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে রাজশক্তির আপত্তি হয়নি। সেখানকার ধর্মগুরুরাও আপত্তি করেননি নিশ্চয়। খেয়াল করে দেখবেন, এই হত্যাকাণ্ডটিতে বৃদ্ধটিকে হত্যা করা হলেও, তাঁর আঁকা নকশাটি কিন্তু নষ্ট করা হয়নি। এর থেকে একটা সত্য প্রমাণ হয়। সিন্টানির ধর্মীয় প্রশাসন ও রাজশক্তি ধর্মের নামে প্রযুক্তির ধ্বংস নয়, বরং তার নিয়ন্ত্রণ কৌশলে নিজেদের কুক্ষিগত করে ফেলতে চাইছে।

"দ্বিতীয়ত, রাজশক্তি ও মন্দিরের অপরিসীম চাপ সত্ত্বেও নতুন পথের লোকগুলির ব্যাপারে জনতার ব্যাপক সমর্থনের ভিত্তি তৈরি হয়েছে একটা। এমনকী রাজশক্তিকেও তারা আর ভয় পাচ্ছে না। হত্যাকাণ্ডের পর নব্য ও পুরাতনপন্থীদের মধ্যেকার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাটিই তার প্রমাণ। আমার এই অনুসিদ্ধান্তটির বিপক্ষে কেউ কোনও বক্তব্য রাখবেন কি?"

নিস্তব্ধ মুখগুলির দিকে তাকিয়ে বড়ো তৃপ্ত বোধ করছিলেন হ্যারল্ড পাইতর। অনেককাল পরে গোটা সংসদের মুখে কুলুপ এঁটে দিতে পেরেছেন তিনি, বিশেষ করে এই অহংকারী সিনেটর ভানিসা উইলিনার মুখে।

কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার হ্যারল্ড বললেন, "তাহলে আমি প্রমাণ করতে পেরেছি যে, সিন্টানিতে এখন বৌদ্ধিক ও প্রযুক্তিগত বিবর্তনের সেই সংযোগমুহূর্তটি এসে

গেছে যাকে পৃথিবীর ইতিহাসে রেনেসাঁ বলে অভিহিত করা হয় এবং জনতার মধ্যে তার সমর্থন বাড়ছে উল্লেখযোগ্যভাবে। শ্রীমতি উইলিনা কি এর বিরুদ্ধে কিছু বলবেন?"

নীরবে মাথা নাড়লেন উইলিনা। পাইতরের যুক্তি অকাট্য।

-"ধন্যবাদ। এইবারে মাননীয় স্পিকার, আমি দাবি জানাব, সিন্টানিজদের মস্তিষ্ক থেকে সমস্ত তথ্য নিষ্কাশিত করে নিয়ে আইনমাফিক গ্রহটিকে পরীক্ষাপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক।"

-"আইন কি সত্যিই শেষ কথা মাননীয় পাইতর?" জিওডন তানাকা ফের মুখ খুলেছেন দেখা গেল, "কোনও আইন যখন কোনও বিশেষ সময়ে মানবিকতার বিরুদ্ধে যায় তখন মানবিকতাকে রক্ষা করবার জন্য আইনে বদল আনতে হয়। ইতিহাস তার সাক্ষী। হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের এই সভ্যতায় সেটা হয়েও এসেছে।"

এই অবধি বলে তানাকা মহানামের দিকে ফিরে বললেন, "মহামান্য স্পিকার, কৃত্রিমভাবে গবেষণাগারে সৃষ্ট পূর্বপুরুষ, এবং দেহকোষে কার্বনের বদলে সিলিকন, এই দুটি সামান্য তফাৎ ছাড়া আর সর্বাংশেই তো সিন্টানিজরা মানুষের সমতুল্য! তাদের স্বাধীন বিকাশের অধিকার পার্থিব মানুষের সমান হতে বাধ্য। ফলে জোর করে তাদের জীবনটিকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাওয়া একটি অনৈতিক ও অমানবিক প্রক্রিয়া হবে বলেই আমার বিশ্বাস ।

"২২০০ খ্রিস্টাব্দে আর্ন্তগ্রহ গবেষণাবিধির ৩৪৬ নং ধারাটি যখন তৈরি হয়েছিল তখন এই স্তরের কোন গবেষণাপ্রকল্প মানুষের কল্পনারও বাইরে ছিল। ফলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, এই আইনের ফলে এ জাতীয় কোনও ধর্মসংকট যে উপস্থিত হতে পারে সে কথা আইনপ্রণেতাদের হিসাবের বাইরেই ছিল তখন। আজ যখন সেই সংকটের মুখোমুখি হয়েছি আমরা সেক্ষেত্রে আইনটিকে নতুন করে লেখবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি প্রস্তাব রাখছি, এই বিষয়ে সংসদে মতদানের ব্যবস্থা হোক।"

আইনসচিব নীরবে একটি কাগজের টুকরো বাড়িয়ে ধরলেন মহানামের দিকে। তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মহানাম বললেন, "এ বিষয়ে মতদান হবে কি হবে না সে ব্যাপারে ২৭-এর ক ধারা অনুযায়ী স্পিকারই সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। আমি মতদানের অনুমতি দিলাম। তবে ২৭-এর খ ধারা অনুযায়ী মতদান হবার আগে বির্তকরত দুই পক্ষকে তাঁদের বক্তব্য সংসদের সামনে রাখতে দেবার বন্দোবস্ত আছে। ধারা অনুযায়ী এই সুবিধেটি আমি আপনাদের দিতে চাই মান্যবর পাইতর ও মাননীয় তানাকা। আপনার কি বক্তব্য রাখতে আগ্রহী?"

দেওয়ালের বোর্ডে দুজনের নামের পাশেই সম্মতিসূচক সংকেতটি জ্বলে উঠল।

"ধন্যবাদ। যেহেতু বিষয়সংক্রান্ত প্রস্তাবটির প্রধান উত্থাপক শ্রী পাইতর, অতএব আমি তাঁকে প্রথমে তাঁর বক্তব্য রাখবার সুযোগ দেব। মাননীয় মহোদয়গণ, আইন ও মানবিকতার দ্বন্দ্বের এক বিচিত্র সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা এই মতদানের সাহায্য নিতে চলেছি। আপনারা দুপক্ষের বক্তব্য গভীরভাবে শুনে তারপর সুচিন্তিতভাবে আপনাদের মতামত দেবেন বলে আমরা আশা করব।"

গোটা কক্ষের আলো নিভে গিয়ে একটা ছোটো আলোকবৃত্ত শুধু জ্বলে রইল হ্যারল্ড পাইতরের আসনটিকে ঘিরে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন ছোটোখাটো চেহারার মানুষটি। মাথা নিচু করে নিজের টেবিলের স্বচ্ছ পর্দাটির ওপরে দুএকবার আঙুল চালিয়ে যন্ত্রমস্তিষ্ককে কিছু নির্দেশ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন হ্যারল্ড পাইতর।

"মাননীয় ভদ্রমণ্ডলী। প্রথমেই আমি সতীর্থ জিওডন তানাকাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই, মানবিকতার কথাটি আমার স্মরণে এনে দেবার জন্য। আমি বলতে চাই, আপনাদের আজকের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ওপর শুধু 'মানবিকতা' নয়, নির্ভর করছে 'মানবসভ্যতা'র অস্তিত্বও।

"বাঁদরের সঙ্গে মানুষের জেনেটিক তফাৎ শতকরা দু ভাগেরও কম। তবু মানুষ নিজেকে স্বতন্ত্র প্রজাতি বলেই জানে। অথচ এই সিন্টানিজদের দেহের প্রধান উপাদানটাই মানুষের চেয়ে আলাদা। কার্বনভিত্তিক প্রাকৃতিক জীব মানুষ সিলিকনভিত্তিক কৃত্রিম জীব সিন্টানিজকে কোনওমতেই মানুষ বলে মানতে পারে না। ওরা আলাদা প্রজাতি। কৃত্রিমভাবে মানুষের গবেষণাগারে তৈরি গবেষণার যন্ত্রমাত্র। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সৃষ্ট জীবের সঙ্গে এক সারিতে তার স্থান হতে পারে না।

"এই মুহূর্তে এরা আমাদের চেয়ে অনেক অনগ্রসর। একটা ছোটো গ্রহে আবদ্ধ, যার আকাশ, বাতাস, এমনকী মাধ্যাকর্ষণটাও আমাদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। অসহায় এই যন্ত্রজীবগুলো যেহেতু আবার আমাদের ছাঁচেই গড়া অতএব তাদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি আপনাদের হতে পারে বৈকি। মান্যবর তানাকাকে আমি দোষ দিই না তাই। কিন্তু ভাবুন তো, এরা যদি আজ শক্তি সঞ্চয় করে গ্যালাক্সির কর্তৃত্ব দাবি করে মানুষের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে নামে? তখনও কি আপনাদের সহানুভূতিটা থাকবে? জানা কথা যে, তা থাকবে না। কিন্তু সহানুভূতিশীলরা বলবেন, যেহেতু পৃথিবীর প্রযুক্তি এদের চেয়ে কয়েক হাজার বছর এগিয়ে রয়েছে, অতএব এরা কখনও আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গায় পৌঁছতে পারবে না। কয়েক সহস্রাব্দীর তফাৎ অতিক্রম করা সহজ নয়।

"আর, এইখানটাতেই সবচেয়ে বড়ো ভুলটা করব আমরা। মাননীয় ভদ্রমণ্ডলী, খেয়াল করে দেখুন, আজ থেকে এক হাজার বছর আগে প্রজেক্ট সিন্টানি যখন শুরু হয় তখন মনুষ্যযন্ত্রগুলোকে খ্রিষ্টপূর্ব সাড়ে তিন সহস্রাব্দীর উপযুক্ত জ্ঞানবিজ্ঞান দিয়ে প্রোগ্রাম

করে নেওয়া হয়। তারপর তাদের স্বাধীনভাবে বাড়তে দেওয়া হল। তার ফল হল এই যে, এক হাজার বছরের মধ্যে তারা এসে পৌঁছে গেছে মানুষের খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রযুক্তিক ও সামাজিক বিবর্তনের স্তরে। অর্থাৎ পাঁচ হাজার বছরের অগ্রগতি এক হাজার বছরে! সাধারণ গণিত বলে, এই হারে এগোলে প্রযুক্তির দৌড়ে আমাদের পাশাপাশি পৌঁছতে এদের আর ঠিক সাড়ে সাতশো বছর সময় লাগবার কথা। কিন্তু সে হিসেবটাও সঠিক নয়। মাননীয় সংসদগণ, এদের প্রগতির হার কী বিপজ্জনক হারে বাড়ছে তার একটা ইঙ্গিত আমি আপনাদের দেব এবারে।

"ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখতে পাবেন, খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের শুরুতে লিওনার্দো দা ভিন্সি নামের এক বৈজ্ঞানিক প্রথম বাষ্পীয় কামানের ধারণা দেন। কিন্তু মানুষ কোনওদিন তাকে তৈরি করে তাকে নরহত্যার কাজে লাগায়নি। অথচ এরা, প্রথম সুযোগটা পাওয়ামাত্র বাষ্প দিয়ে তৈরি করল একটা মারণাস্ত্র। তারপর তাদের রাজশক্তি, ধর্ম, বিবেক সব ভুলে ধর্মের নামে তার উদ্ভাবককে হত্যা করে তার অস্ত্রটা কেড়ে নিল নিজের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য।

"যাক সে কথা। পৃথিবীর ইতিহাসে ফিরে আসি। ফার্দিনান্দ ভার্বিয়েস্ট নামে এক উদ্ভাবক চিন ভূখণ্ডের শাসকের জন্য একটি ছোট্ট খেলনা বাষ্পগাড়ি তৈরি করে এই গ্রহে বাষ্পযানের সূচনা ঘটান ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাষ্পকামান থেকে বাষ্পীয় যানে পৌঁছতে আমাদের লেগেছিল পৌনে দুশো বছর। অথচ সেই প্রগতি অর্জন করতে এরা সময় নিয়েছে পার্থিব হিসেবে ঠিক ছ মাস। এক কথায় অকল্পনীয় গতি নিয়েছে সিন্টানিজদের টেকনোলজির প্রগতি।

"তাহলে মাননীয় ভদ্রমণ্ডলী, আপনাদের কী মনে হয়? আর কতদিন লাগবে এদের আমাদের প্রযুক্তিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে? আর তারপর? যখন তাদের প্রযুক্তি অকল্পনীয় বেগে আমাদের ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে যাবে? তখন কী করবেন আপনারা? জানবেন, আকাশ ছাড়িয়ে মহাকাশের দিকে চোখ ফেলে ওরা প্রথমেই খুঁজে পাবে আমাদের স্যাটেলাইটগুলোকে। বুঝতে পারবে তাদের সাথে দুনিয়াটা ভাগ করে নেবার জন্য দ্বিতীয় কেউ রয়েছে।

"মহোদয়গণ, ভেবে দেখুন। এদের রক্তলোলুপতার ও নিষ্ঠুরতার কোনও তুলনা নেই। একটা নতুন প্রযুক্তি হাতে পেলে সবার আগে এরা তাকে অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগের কথা ভাবে। গত ছ মাসের যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড আপনারা সকলে কিছুক্ষণ আগে দেখেছেন, পৃথিবীর অতিবড়ো সামাজবিরোধীও সেই নিষ্ঠুরতার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। বিবেকহীন, রক্তলোলুপ অথচ প্রযুক্তিতে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে এগিয়ে চলা এই জাতটাই অতএব ভবিষ্যতের গ্যালাক্সিশাসক হতে চলেছে মাননীয় সাংসদগণ,

মানুষ নয়। নিষ্ঠুরতা, মস্তিষ্কের ক্ষমতা কিংবা প্রযুক্তিগত ক্ষমতা, এই সবকিছুতেই মানুষ আর অল্প কিছুকালের মধ্যে এদের থেকে বহুদূরে পিছিয়ে যেতে বাধ্য।

"মহোদয়গণ, সামান্য জনতার অর্থ অপচয়ের অভিযোগ নিয়ে এই বৃদ্ধ আর চিন্তিত নয়। ধর্ম, নীতি, মানবিকতা – এই সবকিছুর ওপরে যা সত্য, সেটা হল অস্তিত্বের অধিকার। আমার সৃষ্ট জীব যদি আমাকে ছাপিয়ে গিয়ে ছায়াপথে দখল নেবার উপক্রম করে তবে সে ক্ষেত্রে, অন্তত আমার কাছে 'মানবিকতার একমাত্র দাবি' হল তাকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। সিন্টানিজ এক্সপেরিমেন্ট আর নিছক এক্সপেরিমেন্ট নেই। এই মুহূর্তে তা মানবসভ্যতার সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ।"

পাইতর থামলেন। গভীর একটা নীরবতা এসে ছেয়ে ফেলেছে গোটা ভবনটিকেই। মৃদুতম একটা ফিসফিসানিও শোনা যাচ্ছে না কোনও পাশ থেকে। তারপর সেই নীরবতা ভেঙে মহানামের গলা ভেসে এল, "শ্রী তানাকা?"

তানাকা গভীরভাবে কিছু ভাবছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে যখন কথা বললেন, তখন তাঁর গলায় এক গভীর অনিশ্চয়তার সুর, "মহামান্য স্পিকার, প্রসঙ্গটি আমি উত্থাপন করেছিলাম বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে তা যে অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আমার মনে হয় এ বিষয়ে কোনও কিছু বলবার থাকলে তা বলবার দায়িত্ব প্রজেক্ট সিন্টানির দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনেটোর শ্রীমতী উইলিনারই নেওয়াটা উচিত হবে।"

হ্যারল্ড পাইতরের চোখে বিজয়ীর হাসি চিকমিক করছিল। স্পিকার তাঁর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। দ্বিপাক্ষিক বিতর্কসভায় কোন অংশগ্রহণকারী নিজের বদলে অন্য কাউকে বলবার অধিকার দেবার অনুরোধ পেশ করতেই পারেন, তবে তা বিতর্কে অংশগ্রহনকারী দ্বিতীয় পক্ষটির সম্মতি ছাড়া সম্ভব হয় না।

পাইতরের শরীরী ভাষা জানান দিচ্ছিল এই বিতর্কে তিনি নিজেকে অজেয়ই মনে করছেন আজ। মৃদু হেসে তিনি সামনের প্যানেলের সম্মতিজ্ঞাপক বোতামটিতে হাত ছোঁয়ালেন।

ভানিসা উইলিনা একটু অনিশ্চিতভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালেন এইবার। একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, "মহামান্য স্পিকার। আমার বক্তব্য আমি রাখব, তবে তার আগে আমি আমায় সাতদিনের সময় দেবার অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাকে। আর সেইসঙ্গে সাতদিনের জন্য এই সভা ও পৃথিবী ছেড়ে যাবার অনুমতিও প্রার্থনা করব সিনেটরের কাছে।"

"আপনি..."

"আমি একবার সিন্টানি যেতে চাই মহামান্য। এত বড়ো একটা আশঙ্কা যখন দেখা দিয়েছে আমার এই প্রজেক্টটি নিয়ে, তখন তার সত্যতা কতদূর সেটা সরেজমিনে

একবার দেখে আসা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আর তারপর, ফিরে এসে আমি আমার বক্তব্য রাখতে চাই মাননীয় স্পিকার। অনুমতি পেলে আমি আজই রওনা হয়ে যেতে চাই।"

"শ্রীমতি উইলিনা, আপনি নিজে! মানে কোন আইনগত বাধা নেই যদিও, কিন্তু প্রথাগতভাবে, কোন সিনেটর সশরীরে কখনও কোন নক্ষত্র অভিযানে..."

মহাথের রালাবাসকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে একটু উত্তেজিত গলায় ভানিসা বললেন, "মাননীয় রাষ্ট্রপতি, আমি এই প্রজেক্টের প্রধান নির্দেশক। প্রজেক্টের ব্যাপারে পাইতর যা বললেন, তাতে সামান্যতম সারবত্তাও যদি থাকে তবে তা পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক হবে। অন্যদিকে, শুধুমাত্র একজন সিনেটরের বক্তৃতা ও কিছু রেকর্ড করা ছবি দেখে একটা এক সহস্রাব্দীর পুরোনো ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল গবেষণাকে এক কথায় ধ্বংস করে দেওয়া ও কিছু অসহায় জীবকে..."

ভানিসার চোখদুটি জলে ভরে এল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি ফের বললেন, "আপনার কাছে আমার আরও একটা অনুরোধ আছে মাননীয় রাষ্ট্রপতি। সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমি সাধারণ কোনও যানের বদলে মৃত্যুতারকা ডেথ ওয়ানকে নিয়ে সিন্টানিতে যেতে চাই। যদি প্রয়োজন হয় তবে একে ধ্বংস করবার কাজটাও আমি নিজে হাতেই করব।"

"অথবা বলুন, রক্ষা করবার কাজটা করবেন। কী বলেন শ্রীমতী উইলিনা? ডেথ ওয়ান শ্রেণীর যুদ্ধযান পৃথিবীর হাতে একটাই আছে। একটা গোটা গ্রহের মহড়া নিতে সক্ষম এই যুদ্ধযানের সামনে দাঁড়াতে পারে একমাত্র আর একটি ডেথ ওয়ান, যা এখনও পৃথিবীর হাতে নেই। নতুন করে একটা এই যান গড়তে সময় নেবে অন্তত অর্ধশতাব্দী। আর তার মধ্যে ডেথ ওয়ানের নিরাপত্তায় বুদ্ধিমান সিন্টানিজদের শিখিয়ে পড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আপনার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তাই না?"

"পাইতর!" মহাথের রালাবাসের গলায় চাপা ক্রোধের স্পর্শ ছিল, "আপনি একজন সম্মানিত শিক্ষাবিদ ও সাংসদের প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহের কদর্য ইঙ্গিত করছেন। আপনি এই মুহূর্তে হয় আপনার বক্তব্য প্রত্যাহার করবেন অথবা..."

"অথবা প্রমাণ দিতে হবে, তাই তো? বেশ। তাই দিচ্ছি। গত আড়াইশো বছর ধরে সিন্টানিজদের অগ্রগতি যিনি খুঁটিয়ে অনুসরণ করেছেন তাঁর কাছে তো এটা অজানা থাকবার কথা নয় যে সিন্টানিজদের অগ্রগতির হার পার্থিব মানুষের চেয়ে বহুগুণ বেশি! শ্রীমতী উইলিনা কি অস্বীকার করতে পারেন এটা তাঁর জানা ছিল না? অথচ এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার তিনি সিনেটের কাছে গোপন রেখেছেন। কেন?

“দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় গণকযন্ত্রের লগ বলছে আমাদের গত অধিবেশন চলাকালীন আঠাশ থেকে ত্রিশ মে অবধি প্রতি রাতে একঘণ্টা ধরে পৃথিবী থেকে সিন্টানি গ্রহে কিছু চিন্তাতরঙ্গ পাঠানো হয়েছে। ‘কার্তালিও জিটা’ গোত্রের এই তরঙ্গগুলি সাধারণত স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়।

“আপনাদের নিশ্চয় মনে থাকবে এই ২৮ মে তারিখের অধিবেশনেই আমি প্রথম প্রমাণ দিয়েছিলাম, সিন্টানিতে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়েছে! ঠিক সেই দিনটিতেই এই গ্রহ থেকে সিন্টানিতে যদি কিছু চিন্তাতরঙ্গ পাঠানো হয়, তবে তা কিছুটা উদ্বেগজনক বটে, বিশেষত তা যদি পাঠানো হয়ে থাকে স্বয়ং প্রজেক্ট ডিরেক্টরের মনোপ্রক্ষেপকের নম্বর থেকে। সিন্টানিজদের সঙ্গে কোনওরকমের সংযোগস্থাপন তো নিষিদ্ধ। আপনি তবে তাদের কী স্বপ্নসংবাদ পাঠাচ্ছিলেন উইলিনা? আর ঠিক তারপর থেকেই সেই গ্রহে শুরু হয়ে গেল প্রযুক্তিবিদ ও যুক্তিবিদদের ওপর মন্দির ও রাজশক্তির আক্রমণ। মাননীয় স্পিকার, শ্রীমতি উইলিনার চিন্তাতরঙ্গগুলির রেকর্ডিং আমার কাছে আছে। আমি জানি কোনও সিনেটরের ব্যক্তিগত তরঙ্গকে ডিকোড করা সংবিধানবিরোধী। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর ষষ্ঠেন্দ্রিয় ভুল করে না। আমরা একটা গভীর সংকটমুহূর্তের দিকে এগোচ্ছি। আমি দাবি জানাচ্ছি, মানুষের অস্তিত্বের স্বার্থে জরুরি অবস্থাকালীন আইন প্রয়োগ করে তরঙ্গগুলিকে ডিকোড করে দেখা হোক, সিন্টানিতে রেনেসাঁবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা। যদি আমার সন্দেহ ভুল প্রমাণিত হয় তবে আমি এই মুহূর্তে পদত্যাগ করব ও আইনানুগ যে কোনও শাস্তি নিতে বাধ্য থাকব।”

নিঃশব্দে, প্রায় নিজেরই অজান্তে সম্মতিসূচক বোতামটি টিপে ধরলেন মহানাম।

কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই প্রক্ষেপণক্ষেত্র ফের আলো জ্বলে উঠল। অপার্থিব এক ভূতুড়ে নীলচে আলো। সেখানে এক বৃদ্ধের হাতে ধরা একটি একনলা দূরবীক্ষণযন্ত্রের মুখ থেকে অগ্নিস্রোত বের হয়ে এসে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সমস্ত চরাচর। মানুষগুলি বিচিত্র ভঙ্গীতে নাচছে, তাদের মুখে আগুনের দপদপে আলোছায়া।

“বন্ধুগণ, তবে এই ছিল সিন্টানিজদের জন্য তাদের দেবী আলিয়ানা ওরফে উইলিনার বিভিন্ন স্বপ্নবার্তাগুলির একটি। নব্য প্রযুক্তিকে ধ্বংস করো নতুবা নিজেরা ধ্বংস হও। ওই দেখুন, ওই যে দেবী আলিয়ানা স্বপ্নের মধ্যে বিমর্ষমুখে সিন্টানি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। দেবী আলিয়ানার মুখের গড়নটি একবার খেয়াল করে দেখুন।”

বলতে বলতেই স্বপ্নবাসিনী দেবীর মুখটি বড়ো হয়ে উঠে গোটা প্রক্ষেপণক্ষেত্রটিকে ছেয়ে ফেলল। ভানিসা উইলিনার সেই বিরাটকায় মুখাবয়বটির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে পাইতর ফের বললেন, "মাননীয় স্পিকার। এর পরেও কি আপনার মনে হয় শ্রীমতী উইলিনা পৃথিবীর স্বার্থে কাজ করছেন? ওই গ্রহ আর তার বাসিন্দাদের বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন তিনি। তার জন্য তার প্রযুক্তির প্রসারকে আটকে দিয়ে সেখানকার সমাজের নবজাগরণকে রুখে দেবার চেষ্টা করতেও তিনি পিছপা হননি। প্রজেক্টের মূল শর্তটি ছিল, সিন্টানিজরা কোনও বাইরের প্রভাব ছাড়া নিজেদের পথে এগোবে। তবেই সঠিক বিবর্তনের ধারাটিকে ধরা যাবে। পরীক্ষার সেই প্রাথমিক শর্তটিকে নির্দেশক নিজেই অবলীলায় ভেঙে দিলেন! কেন? পরীক্ষার উপাদানগুলিকে রক্ষা করবার জন্য সমস্ত আইন ভেঙে খোদ প্রজেক্টটাকেই নষ্ট হবার দিকে ঠেলে দিতেও তাঁর কোনও দ্বিধা হয়নি। কেন?

"কিন্তু উদ্দেশ্য যা-ই থাক না কেন, তিনি তা পূরণে ব্যর্থ হলেন। সবদিকেই। গবেষক ও গবেষণার উপাদানের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিকতার শর্ত ভেঙে বিজ্ঞানী হিসেবে ব্যর্থ হলেন, আবার অন্যদিকে, সিন্টানিতে নব্য ভাবনা আর প্রযুক্তির বিকাশের মিলনে নবজাগরণের সূচনা তাঁর হস্তক্ষেপে খানিক রক্তাক্তই হল শুধু, কিন্তু থেমে গেল না। আর আজ এই সিনেটের অধিবেশনেও যখন সেখানকার নরমেধ যজ্ঞের কিছু ছবি দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন সেখানে রেনেসাঁর গতি থেমে গেছে সেখানেও তাঁর মিথ্যাচরণ কীভাবে ধরা পড়ে গেল সে আমি আগেই প্রমাণ করে দেখিয়েছি।

"অতএব এইবারে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধযানটি নিয়ে সিন্টানিতে যেতে চান। সংসদের মাননীয় সদস্যদের সামনে আমার প্রশ্ন একটাই। এর পরেও কি আপনারা মনে করেন তিনি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য সেখানে যাচ্ছেন? আমি যদি বলি, এই যানটির সাহায্য নিয়ে কয়েকটা দশক সিন্টানিকে উপযুক্ত নিরাপত্তা দিয়ে সেই ফাঁকে তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে পৃথিবীর উপযুক্ত প্রতিপক্ষে পরিণত করবার জন্য উনি সেখানে যেতে চাইছেন তবে সে সন্দেহ কি খুব অমূলক হবে? মাননীয়া উইলিনা, সামান্য একজন সিনেটর হবার বদলে দেবী আলিয়ানা হয়ে একটা উন্নত গ্রহের ওপর কর্তৃত্ব লাভ... মন্দ কী? বলুন?"

হঠাৎ নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ভানিসা উইলিনা। আগুনঝরা চোখে হ্যারল্ড পাইতরের দিকে একঝলক দেখে নিয়ে দ্রুত পায়ে সংসদ কক্ষের বাইরে বার হয়ে গেলেন। এরা বুঝবে না! নিঃসন্তান ও নিঃসঙ্গ মধ্যবয়সে হঠাৎ আসা সন্তানস্নেহ যে কত তীব্র হতে পারে, এই পুরুষেরা তার কতটুকু বুঝবে?

সেইদিকে তাকিয়ে মহানাম নীচু গলায় কিছু নির্দেশ দিলেন তাঁর ডেস্কে আটকানো মাইক্রোফোনটিতে। ভানিসাকে তিনি স্নেহ করেন বটে, কিন্তু এখন তাকে আর স্বাধীনভাবে ছেড়ে রাখা সম্ভব নয়। উচিতও নয়।

*****

"স্থানাংক নির্ধারিত হয়েছে সার।"

সুবিশাল তারকা মানচিত্রের বুকে একটি লাল বিন্দু দপদপ করে জ্বলছিল।

"ঝাঁপের হিসেব?"

"তৈরি। ছটি ঝাঁপ। প্রতিটিতে বারোশ আলোকবর্ষ। দুটি ঝাঁপের মধ্যে বিশ্রাম সময় চব্বিশ ঘণ্টা। অন্তিম ঝাঁপ শেষ হবে জিনিয়ান নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলের বাইরে হাইফার মেঘমণ্ডলে।"

"পরবর্তী নর্মাল স্পেস ট্রানজিট?"

"সাত দিন সতেরো ঘণ্টা।"

"এত সময়?"

"লাগবে সার। তিনটে গ্রহাণুবলয় পড়বে কুড়ি থেকে সাত নম্বর গ্রহে পৌঁছবার পথে। কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন না করলে..."

সতর্কতাসূচক ঘণ্টাটি বেজে উঠল হঠাৎ। সকলে দেওয়ালের পর্দাটির দিকে ঘুরে দেখল একবার। সেখানে একটা ছোটো মহাকাশযানের ছবি ধরা পড়েছে। অভিকর্ষ তরঙ্গে সওয়ার হয়ে স্বচ্ছ গোলকটি তীব্রবেগে ধেয়ে আসছে এই গ্রহাণুযানটির দিকে।

প্রায় একশ মাইল ব্যাসার্ধের দানবিক গ্রহাণুটির একেবারে কাছে চলে এসেও গতি কমাল না গোলক। তার স্বয়ংক্রিয় চালক গ্রহাণুর গায়ের বড়ো বড়ো ক্রেটারগুলির মধ্যে থেকে সঠিক সুড়ঙ্গটি বেছে নিল দূর থেকেই। তারপর কাছে এসে একই গতিতে ঝাঁপ দিল তার মধ্যে। অমনি, সান্দ্র তরলের মতো প্রতিঅভিকর্ষক্ষেত্রের মধ্যে ডুবে গিয়ে গতি কমতে থাকল তার...

মসৃণ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে এইভাবে কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ করেই সুড়ঙ্গ শেষ হল। গ্রহাণুর দেহের ভেতরের শহরটিতে এসে স্থির হল যান। তার ভেতরে একটি সুন্দর কণ্ঠ তখন যান্ত্রিক উচ্চারণে জানিয়ে চলেছে। "সহস্রাব্দীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধযান মৃত্যুতারকা ডেথ ওয়ানে আপনি স্বাগত। আমাদের কুড়ি মাইল পুরু পাথর, টাংস্টেন ও প্ল্যাটিনাম ধাতুসংকরের বর্মের ভেতরে আপনি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।"

বহুদূর থেকে একটি উজ্জ্বল আলোর রেখা এসে হঠাৎ স্থির হল গোলকটার পাশে। তার গা ঘেঁষে ঘেঁষে তার দেখানো পথে গোলক এগিয়ে চলল গ্রহাণুর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে, আরোহীর গন্তব্যের দিকে।

মহাথের রালাবাস গোলকের স্বচ্ছ দেওয়ালের ভেতর থেকে চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখছিলেন। এই তবে মহাকাশদুর্গ মৃত্যুতারকা ডেথ ওয়ান!

*****

"ভদ্রোমহোদয়গণ। আপনারা আশা করি সম্পূর্ণ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন! প্রথমত প্রজেক্ট সিন্টানির পরীক্ষার উপাদানগুলি মানুষের মতো দেখতে হলেও আসলে মানুষ বা কোনও প্রাকৃতিক জীব নয়। সিলিকনভিত্তিক এই যন্ত্রগুলির প্রতিটির মস্তিষ্কে আহরিত ও সঞ্চিত সমস্ত তথ্য পার্থিব ইতিহাস আকাদেমির সম্পত্তি। তা নিষ্কাশন করবার পর অপ্রয়োজনীয় দেহযন্ত্রগুলিকে উচ্চতাপে গলিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে সিন্টানির মাটিতে। পঞ্চাশ হাজারটি স্বয়ংক্রিয় কনভেয়র ইউনিট বারো ঘণ্টার মধ্যে গোটা কাজটি সম্পন্ন করবে। এরপর, সেগুলি ফিরে এলে, নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে নিচু শক্তির সিগমা তরঙ্গ দিয়ে গ্রহটির আবহমণ্ডল ও ভূপ্রকৃতিকে মুছে দিয়ে সিণ্টানিকে তার পরীক্ষাপূর্ব চেহারায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

"তারপর চতুর্থ ধাপে ল্যান্ডিং ব্যাটেলিয়ান নীচে নেমে গিয়ে গ্রহটির কেন্দ্রে পৌঁছে তার গ্র্যাভিটি জেনারেটরটিকে অকেজো করে দিলেই আমাদের মিশন সম্পূর্ণ হবে। এই ঐতিহাসিক অভিযানে সেনাবাহিনীর সাম্মানিক সর্বাধিনায়ক হিসেবে আমি নিজে উপস্থিত থাকবার জন্য এখানে এসেছি। তবে আসল অভিযানের নেতৃত্ব দেবেন কমান্ডার জিমুক।" কথাগুলি বলে রালাবাস পাশে দাঁড়ানো জিমুকের দিকে চাইলেন। গোটা সৈন্যবাহিনীটি তাঁদের সামনে সসম্মানে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।

"আপনার আদেশ পালিত হবে সার।" জিমুক জবাব দিলেন, "প্রতিটি বিভাগের প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞদের দল গতকালই পৌঁছে গিয়েছেন। এবারে যাত্রা শুরুর জন্য আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায়।"

"ধন্যবাদ কমান্ডার। আলোচনাসভা শেষ করবার আগে কোনও প্রশ্ন?" মহাথের রালাবাস শ্রোতাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন। পেছনদিকের চেয়ার থেকে একটি হাত উঠেছে।

"বলুন, কী জানতে চাইছেন? আগে নিজের পরিচয় দিন।" কমান্ডার জিমুক সেইদিকে তাকিয়ে বললেন।

“ধন্যবাদ সার। আমি ফিগো হারিলিক। অভিকর্ষ প্রযুক্তিবিদ, স্তর ৫। ল্যান্ডিং ব্যাটেলিয়নের ডিপ কোর টার্গেট পুটার। আমার প্রশ্ন হল, এটা কি কোনও আর্ন্তগ্রহ যুদ্ধ?”

“না। যুদ্ধ নয়। যুদ্ধ হয় দু’দল জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে। প্রাণী বনাম যন্ত্রে যুদ্ধ হয় না। মনে রাখবেন সৈনিক, এটি একটি গবেষণা প্রকল্পের অন্তিম পর্বের তথ্যসংগ্রহ অভিযান মাত্র।”

“না মানে সাবজেক্টগুলি একদম মানুষের মতো দেখতে, এমনকী গ্রহটিও দেখলাম একেবারেই আমাদের পৃথিবীর মতো...”

“আপনি থামুন। আদেশ পালনের বাইরে দ্বিতীয় কিছু চিন্তা করা সৈনিকের কর্তব্য নয়। দ্বিতীয়বারে এই ভুল করলে আপনাকে কোর্ট মার্শালের সম্মুখীন হতে হবে।” বরফঠান্ডা গলায় কেটে কেটে কথাগুলি বললেন জিমুক। অভিযানটা বিপজ্জনক। ডেথ ওয়ানের ভেতরে কোনও ধরনের অনাবশ্যক আবেগপ্রবণতার উৎপাত তিনি সহ্য করতে রাজি নন।

*****

“এঞ্জিন এক থেকে পাঁচ।”

“প্রস্তুত।”

“এঞ্জিন ছয় থেকে দশ।”

“প্রস্তুত।”

“এঞ্জিন এগারো থেকে কুড়ি।”

“প্রস্তুত।”

“চালু করুন।”

কুড়িটি অমিত শক্তিধর প্রতিবস্তু ইঞ্জিন একসাথে শক্তিবিচ্ছুরণ করল। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নড়ে উঠল নক্ষত্রযান। তারপর তার আকাশের অর্ধেকেরও বেশি জুড়ে থাকা বৃহস্পতির আকর্ষণকে হেলায় উপেক্ষা করে গ্রহটির আবর্তনতলের সঙ্গে উল্লম্বপথে ছিটকে বের হয়ে এল শূন্যতার অনন্ত সমুদ্রে। এই পথে গেলে সৌরজগতের গ্রহাণুপুঞ্জ বলয়ের মধ্যে দিয়ে বিপজ্জনক যাত্রাটি এড়ানো যাবে।

উর্ট মেঘমন্ডল ছাড়িয়ে এসে নিজের অক্ষের ওপরে ধীরে ধীরে একপাক ঘুরে স্থির হল মৃত্যুতারকা। তারপর হঠাৎ এক সুতীব্র শক্তির বিচ্ছুরণে অন্ধকার মহাকাশে একটি দানবিক হীরকখন্ডের মতো জ্বলে উঠে সে উধাও হয়ে গেল স্বাভাবিক আকাশ থেকে। দেশকালহীন অতিমহাকাশের পথে সে এইবার এগিয়ে চলবে সময়কে স্থির রেখে।

তারপর ফের যাত্রাসময়বিন্দুটিতেই ভেসে উঠবে। এক-একবারে বারোশ আলোকবর্ষ দূরে।

[৫]
শেষ বিচার

“আমার প্রিয় পুত্র ও কন্যারা। সমস্ত সিন্টানি জুড়ে আজ অধর্মের আক্রমণ চলেছে। সহস্র সহস্র তরুণ, শয়তানের প্ররোচনায় ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ঈশ্বরের বানানো প্রকৃতির বিধানকে অস্বীকার করে তাকে জয় করবার জন্য অজস্র জাদুযন্ত্র তৈরি করেছে। এ পথ ঈশ্বরের পথ নয়। বিবহেল বলে, যে পথ ঈশ্বরের নয় তা-ই শয়তানের পথ। আর শয়তানের পথে চলবার ফলে মানুষের অবশেষে কী পরিণতি হতে পারে, তার কথা মহাযোগী ভিনটর লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন বিবহেলের শততম অধ্যায়ে। আজকের উপদেশ আমি দেব সেই অধ্যায়ে বিবৃত শেষ বিচারের দিনটির বিষয়ে। ভিনটর বলেছেন, ‘ঈশ্বর আমাকে বলিলেন, শ্রবণ কর পুত্র ভিনটর, স্বর্গোদ্যানরূপ এই সিন্টানির বুকে একসময় শয়তানের প্রাদুর্ভাব হইবে। তাহার প্ররোচনায় জ্ঞানবৃক্ষের বিষাক্ত ফল আহার করিয়া আমার সন্তানেরা আমারই অস্তিত্ব লইয়া সংশয় প্রকাশ করিবে। শয়তানের প্রভাবে তাহারা বিচিত্র জাদুশক্তিতে শক্তিমান হইবে ও নিজেদের দানবে পরিণত করিবে। অবশেষে যখন তাহারা আমায় অস্বীকার করিবে ও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্মাদি শুরু করিবে তখন জানিবে শেষ বিচারের দিন সমাগত। সেই দিনটি নিকটে আসিলে আমি উদ্যতবজ্র হইয়া এক উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে গগনে আবির্ভূত হইব। তারপর একসময় এক সুবিশাল সিংহাসনে আকাশ আচ্ছাদিত করিয়া আমি শূন্যে অবস্থান করিব ও আমার বার্তাবাহী দেবদূত আসফারিলের দল কর্মফলের পুস্তকগুলি লইয়া মর্ত্যে অবতরণ করিয়া শ্বেতবর্ণ সিংহাসনে বসিবে ও সিন্টানিজদের পুণ্য ও পাপের অন্তিম বিচার করিয়া উপযুক্ত পুরস্কার বিতরণ বা শস্তিবিধান করিবে। তাহার পরে আমি মুখব্যাদান করিব ও এক ভয়ানক অগ্নি নিঃশ্বাসে সমগ্র সিন্টানিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার সকল পাপের মোচন করিয়া তাহাকে পুনরায় শুদ্ধ করিব।’

“‘হে পুত্র ভিনটর, তুমি তাহাদের বলিও যে, সকল মনুষ্য যেন অনুতাপ করে কারণ আমি তাহাদের শেষ বিচারের জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করিয়াছি, আর সেই দিনে আমি প্রত্যেক মানবকে তাহার কর্ম অনুসারে বিচার করিয়া শাস্তিবিধান করিব।’”

সমবেত ভক্তমণ্ডলীর ভেতর থেকে একটি কান্নার শব্দ উঠল। মধ্যবয়সি মহিলাটি তাঁর কিশোর পুত্রের মাথা নিজের বুকে চেপে ধরে রয়েছেন। দু চোখে জল গড়িয়ে পড়েছে অবিরল। অশ্রুবিকৃত গলায় মাঝে মাঝে শুধু বলছেন, "রক্ষা পাবার কোনও কি উপায় নেই পিতা?"

কুভুলা বারিকস জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ এসে আকাশের মুখ ঢেকে রেখেছে আজ সকাল থেকে। মেঘাচ্ছন্ন সকালের ম্লান আলো রঙিন কাচের মধ্যে দিয়ে এসে পড়ছিল সমবেত ভক্তমণ্ডলীর গায়ে। তাদের সিলিকনসমৃদ্ধ চামড়ায় প্রতিফলিত হয়ে রঙিন আলোছায়ার এক বিচিত্র নকশা গড়ে তুলছে তা।

সামান্যক্ষণ পরে সেদিক থেকে উপাসনাগৃহের দিকে চোখ ফিরিয়ে মহিলাটিকে কাছে ডাকলেন প্রধান পুরোহিত। কাছে এলে তার মাথায় হাত রেখে বললেন, "আছে মা। পথ আছে। সকলে মিলে অনুতাপ করা, তাঁর কাছে নিজের ও আর সকলের কৃতকর্মের জন্য বারে বারে ক্ষমাপ্রার্থনা করা, পাপের পথ পরিহার করে তাঁর দেখানো পথে আবার ফিরে আসা। বিষাক্ত বিজা সাপের মতো পরিহার করে চলা ঈশ্বরবিরোধী পাপীদের সঙ্গ।"

সূক্ষ্ম মুখাবরণীর পেছনে জামিলার দীর্ঘপক্ষ চোখদুটি জলে ভরে এল। তাই তো সে করেছে। আজ সাতটি মাস পার হয়ে গেল, সেনেগের নামটাও তো কখনও মুখ ফুটে উচ্চারণ করেনি! রাজ্ঞী জাইমেলও কোন প্রশ্ন করেননি তাকে এই নিয়ে। তবে সেনেগের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাও নেননি। শুধু যান্ত্রিক নিপুণতায় তার সমস্ত সঙ্গীসাথিদের সরিয়ে নিয়েছেন তার চারপাশ থেকে। জেসিয়াস ওবেরনসহ সংঘের সব সদস্যই এখন হয় কারাগারে বন্দী, নয় পলাতক। শুধু সেনেগকেই কিছু বলা হয়নি কখনও। জামিলার মুখ চেয়েই। হয়তো তিনি আশা করে আছেন, তারুণ্যের উচ্ছাস একটু কেটে গেল সেনেগ আবার ফিরে আসবে পুণ্যের পথে!

হঠাৎ নিজের প্রতি একটা ধিক্কার এল জামিলার মনে। তুচ্ছ আত্মগরিমা আর মান অভিমানের বশে এত বড়ো একটা কর্তব্যকে অবহেলা করা তার উচিত হয়নি। সেনেগকে ঈশ্বরের পথে ফেরাবার চেষ্টা না করে তাকে এভাবে দূরে ঠেলে রেখে দিয়ে শয়তানের আরও কাছে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে না কি? পথ হারানো একটা মন, তাকে স্নেহ করে, ভালোবাসা দিয়ে সুপথে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা না করে জামিলা কেবল নিজের জেদ আর অভিমানকে ধরেই বসে যে রইল এতদিন, এ-ও একধরনের পাপ বৈকি!

কথাটা মনে হতেই বুকের ওপর থেকে একটা পাথরের বোঝা নেমে গেল যেন। ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের আকাশে মেঘের ফাঁক দিয়ে জিনিয়ানের আলো জানালার কাচ বেয়ে এসে পড়ল দেবী আলিয়ানার মুখে। সে দিকে তাকিয়ে মনটা হালকা হয়ে গেল

জামিলার। দেবী নিশ্চয় সদয় হয়েছেন। এমন মেঘলা দিনে, হঠাৎ করে তার সংকল্প বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে দেবীর মুখ আলোকিত হয়ে ওঠা একটা শুভচিহ্ন তো বটেই!

"চুপ করে একা একা বসে কেন মা? আর সকলে তো চলে গেছে। কিছু বলবে?"

পিঠের ওপর কুভুলা বারিকসের হাতের স্পর্শ পেয়ে চমক ভাঙল তার। চমকে উঠে জামিলা খেয়াল করল, উপাসনাগৃহ কখন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। বাইরে মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে আস্তে আস্তে। মন্দিরের বন্ধ দরজা জানালাগুলো সব খুলে দেওয়া হয়েছে। পুবের জানালাগুলো দিয়ে মধ্যপ্রত্যূষের রোদ এসে পড়েছে ভেতরে। হঠাৎ মুখ তুলে পুরোহিতের চোখে চোখ রাখল সে। তারপর আবার লজ্জা পেয়ে মাথা নামিয়ে মিষ্টি একটুকরো হেসে মাথা বাড়িয়ে জানাল, কিছু বলবার নেই তার। তারপর উঠে আস্তে আস্তে বের হয়ে গেল উপাসনাগৃহ থেকে।

তার দিকে চেয়ে মৃদু মাথা নাড়লেন পুরোহিত বারিকস। কিছুকাল ধরে মেয়েটির মুখে হাসি ছিল না। সম্ভবত ধর্মদ্রোহী সেই ছেলেটির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর মনে আঘাত পেয়েছিল। আজ আবার তাকে খুশি দেখে তিনিও আনন্দিত হলেন। মেয়েদের মন বড়ো তরল। এক দুঃখ পুষে কতদিন বসে থাকবে! এবারে রাজ্ঞীকে বলে উপযুক্ত ঘরে এর বিবাহের বন্দোবস্ত করে বলসার নগরীর আগামী শাসক নির্ধারণের কাজটি শুরু করে দেওয়া প্রয়োজন।

*****

নিস্তব্ধ বাড়িটি যেন ঘুমিয়ে ছিল অন্ধকারের ভেতর। বাইরের দীপস্তম্ভগুলোতে আলো জ্বলেনি। আজ আকাশে ইরো নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকারে একটি অধিকতর অন্ধকারের স্তূপের মতো দাঁড়িয়ে ছিল সেনেগের বাড়িটি। জামিলা জানে এ বাড়ির সমস্ত কর্মচারী পলাতক। রাজরোষ যাকে তাড়া করে চলেছে ক্রমাগত, যাকে যে কোনও দিন যে কোনও মুহূর্তে গ্রেফতার করতে আসতে পারে রাজকীয় সেনাদল আর সর্বোপরি, ঈশ্বরে যে আস্থা রাখে না, সে রকম মানুষের বাড়িতে কাজ করে এই জীবনে রাজ্ঞী জাইমেল ও পরবর্তী জীবনে স্বয়ং ঈশ্বর এই দুই পক্ষের শত্রুতা অর্জনের সাহস বেশি মানুষের থাকে না। সেনেগের বাড়ির কর্মচারীদেরও সে সাহস ছিল না।

অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ির দুটি ধাপ উঠে দরজার ফুটো দিয়ে বাইরে ঝুলে থাকা ঘণ্টির রাশিটিকে খুঁজে বার করে ঘনঘন দুটি টান দিল সে। বাড়ির অনেক ভেতরে কোথাও থেকে ক্ষীণ একটা শব্দ ভেসে এল। ঘণ্টাটা বেজেছে। তবে এত

ক্ষীণ তার আওয়াজ যে জামিলার সন্দেহ হচ্ছিল, কেউ তা শুনতে পাবে কি? খানিক অপেক্ষা করে দ্বিতীয়বার দড়িটা টানতে হাত তুলেও থেমে গেল সে। ভেতর থেকে হালকা পায়ের আওয়াজ আসছে একটা। দরজার নীচে আলোর আবছা আভাসও মিলছিল। কেউ আসছে।

দরজা খুলল রুজবল। হাতের প্রদীপটি তুলে ধরে বলল, "জামিলাদিদি, তুমি এসেছ? এতদিন আসনি কেন?"

একটি ছোটো বটুয়া তার হাতে দিয়ে গালটি টিপে আদর করে জামিলা বলল, "সপ্তসমুদ্রপার থেকে এই মুক্তোমালাটা তোমার জন্য জোগাড় করতে বণিকদের পাঠিয়েছিলাম কিনা! তাদের ফিরতে দেরি হল যে! আমারও দেরি হল তাই।"

রুজবল ততক্ষণে বটুয়া থেকে মালাটি বের করে ফেলেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ফের বলল, "বণিকদের গল্প বলো।"

"বলব। তার আগে তোমার সেনেগদাদার সঙ্গে দেখা করে নিই একবার!"

হাতের প্রদীপটির ম্লান আলোয় বড়োজোর কয়েক হাত পরিমিত এলাকা আলোকিত হয়ে রয়েছে। সেই আলোকবৃত্তের বাইরে, চাপ চাপ অন্ধকারের মধ্যে বাঁদিকে বেশ খানিক ওপরে অন্য একটি মৃদু আলোকবিন্দু দেখা যাচ্ছিল। সেইদিকে আঙুল বাড়িয়ে রুজবল বলল, "ওইখানে আছে। চলো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জামিলা বলল, "না না, তুমি খেলা করো গে রুজবল। আমি একা একা যেতে পারব।"

"একা একা খেলতে ভয় লাগে জামিলাদিদি। ভীষণ অন্ধকার তো! আমি তোমার সঙ্গে যাব? সেনেগদাদার সঙ্গে গল্প করবার পর আমার সঙ্গে তুমি একটু খেলবে?"

"কেন? সেনেগদাদা বুঝি একদম খেলে না তোমার সাথে?"

উত্তরে তার বড়ো বড়ো চোখদুটি জলে ভরে এল। নীরবে দুপাশে মাথা নাড়ল সে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "সেনেগদাদা ভীষণ দুষ্টু হয়ে গেছে। আ- আমায়..."

আর কথা বের হল না তার মুখে। চোখের জল এসে গলার স্বরকে বন্ধ করে দিয়েছে তার।

রুজবলের হাত থেকে প্রদীপটি নিয়ে একটি কুলুঙ্গীতে রেখে তার মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরে রইল জামিলা। ছোট্ট শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে কান্নার ধাক্কায়।

খানিক পরে সে একটু শান্ত হতে জামিলা আবার জিজ্ঞাসা করল, "রুজবল, তুমি আমায় বলো তো কী করেছে তোমার দাদা? আমি তাকে শাস্তি দেব ঠিক।"

তার বুকে মুখটি গুঁজে রেখেই রুজবল বেশ কিছুক্ষণ ধরে যা বলে গেল, তার সারমর্ম হল, মাসখানেক আগে একটা অতিকায় জাদুনল তৈরি করে সেনেগ গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে বাড়ির পূর্ব মহলের ছাদের ওপরকার একটি ঘরে। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা মন্দ চলছিল না। বাড়িতে এখন তারা দুজন ভিন্ন আর কেউ থাকে না। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর তাকে সঙ্গে করে নিয়ে সেই ঘরে একটি বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গভীর রাত অবধি আকাশের তারা দেখত সেনেগ। মাঝে মাঝে রুজবল আকাশ দেখবার বায়না করলে তাকেও দেখতে দিয়েছে সেই জাদুনলের মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু গত চারদিন ধরে সেনেগ একেবারে বদলে গেছে। যেন ভূতে পেয়েছে এইরকম হাবভাব তার। সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার সঙ্গে সঙ্গে জাদুনলে চোখ লাগিয়ে গিয়ে বসে। তারপর সারারাত একই ভাবে বসে থাকে সেখানে। রুজবলের খিদে পেলেও তাকে খেতে দেয় না। দু-একবার তার কাছে গিয়ে হাত ধরে টানাটানি করে দেখেছে রুজবল। সেনেগ সাড়া দেয়নি। কিন্তু গতকাল রাতে সে তাকে একটু বেশি বিরক্ত করায় জীবনে যা করেনি সেনেগ তাই সে করেছে, রুজবলের গালে একটা প্রচণ্ড চড় মেরেছে। তারপর মাটিতে পড়ে পড়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছে রুজবল, কিন্তু সেনেগ তাতে কোনও সাড়া দেয়নি। তারপর থেকে রুজবলের ভারী ভয় হয়েছে। আজ সারাদিন একতলায় তার নিজের ঘরে লুকিয়ে বসে ছিল সে। কিন্তু সন্ধে হতে, অন্ধকারে বড়ো ভয় লাগায় দাদার ঘরের সামনে গিয়ে তার দরজার বাইরে চুপটি করে বসেছিল, তখন জামিলাদিদি এল। বলতে বলতে রুজবলের লাল টুকটুকে ঠোঁটদুটি ফের ফুলে ওঠে। খিদে, দুশ্চিন্তা আর সবার ওপরে, প্রিয় দাদার কাছে পাওয়া অপ্রত্যাশিত আঘাতের স্মৃতি – এই সবকিছু মিলে তার চোখে ফের টেনে আনে অজস্র অবাধ্য মুক্তাবিন্দু।

সযত্নে তার চোখদুটি মুছিয়ে দিয়ে জামিলা বলল, "এত দুষ্টু হয়েছে তোমার সেনেগদাদা? দাঁড়াও, আমি তাকে ভীষণ শাস্তি দেব। তবে তার আগে আর একটা কথা আছে। তোমার তো খুব খিদে পেয়েছে রুজবল, তাই না? শোনো, আমার সঙ্গে নীলবন দিদি এসেছে। নীচে গাড়িতে বসে আছে। তুমি তো তাকে চেন। ধরো যদি নীলবনদিদি তোমায় সঙ্গে করে আমাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে একটা দারুণ বন্যতিতিরের পদ, সাদা রুটি আর পাইকর-এর তৈরি পিচফলের কেক খেতে দেয় তবে কেমন হয়? যাবে?"

চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল রুজবলের। ঘাড় নাড়িয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"চলো তবে।"

তাকে কোলে নিয়ে সদর দরজার বাইরে ফের বের হয়ে এল জামিলা। অঙ্গারক্ষিণী নীলবনকে ডেকে তার হাতে শিশুটিকে তুলে দিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলি দিয়ে আবার ভেতর আসতে আসতে রুজবলের শেষ কথাগুলি সে শুনতে পাচ্ছিল,

“নীলবনদিদি, সেনেগদাদাও না কাল রাত থেকে কিছু খায়নি। রাতে ফেরার সময় দাদার জন্যও তিতিরের মাংস আর সাদা রুটি নিয়ে আসব খন, কেমন?”

চোখ দুটি জলে ভরে এল জামিলার। তা লুকোবার কোনও চেষ্টাই করল না সে। দেখবার কেউ নেই যে এখানে!

*****

“সেনেগ?”

“কে?”

হঠাৎ এক তীব্র আবেগে ভেসে গেল জামিলার সমস্ত তিক্ততা, তার সমস্ত তৈরি করে রাখা বক্তব্য। অন্ধের মতো দু হাত নাড়িয়ে ধরে দ্রুতপায়ে দরজা থেকে এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে তরুণীটি মাথা গুঁজে দিল তার প্রশস্ত কাঁধে। তার সমস্ত অভিমান উষ্ণ অশ্রুজল হয়ে ঝরে পড়ছিল তার প্রিয়তম পুরুষটির দেহে।

সেনেগ ধীরে এদিকে ঘুরে বসে দু হাতে জড়িয়ে নিল তার কেঁপে কেঁপে ওঠা হালকা শরীরটাকে। নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরটি তাদের নীরব সংলাপে মুখরিত হয়ে রইল। সাক্ষী রইল কেবল জানালা দিয়ে চেয়ে থাকা গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় অঞ্চলের চোখ ধাঁধানো তারকাপুঞ্জ।

“আমার বড়ো ভয় করছে সেনেগ। আমার...”

সেনেগ কোনও উত্তর দিল না। সান্ত্বনাও নয়। শুধু কৌতূহলহীন শান্ত দুটি চোখ মেলে নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে রইল।

“আজ সকালে উপাসনাগৃহে মহা পুরোহিত ধর্মোপদেশ দিলেন বিবহেলের শততম অধ্যায় থেকে। কী ভয়ংকর সেই বিচারের দিন।”

“কী বললেন তিনি? ‘আমার সন্তানেরা আমারই অস্তিত্ব লইয়া সংশয় প্রকাশ করিবে। শয়তানের প্রভাবে তাহারা বিচিত্র জাদুশক্তিতে শক্তিমান হইবে ও নিজেদের দানবে পরিণত করিবে। অবশেষে যখন তাহারা আমায় অস্বীকার করিবে ও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্মাদি শুরু করিবে তখন জানিবে শেষ বিচারের দিন সমাগত। সেইদিনটি নিকটে আসিলে আমি উদ্যতবজ্র হইয়া এক উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে গগনে আর্বিভূত হইব। তারপর একসময় এক সুবিশাল অগ্নিময় সিংহাসনে...’”

“কিন্তু তুমি... তুমি কেমন করে...”

বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল জমিলার মুখ। সেনেগের হাতটি দুটি হাতে জড়িয়ে ধরে তার চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "তুমি উপাসনাগৃহে গিয়েছিলে সেনেগ! জয় দেবী আলিয়ানা। তাঁর কৃপায় আজ..."

তাকে বাধা দিয়ে ম্লান হেসে সেনেগ বলল, "না জামিলা। উপাসনাগৃহে আমি যাইনি। কিন্তু গত দুদিন ধরে বিবহেলের এই অধ্যায়টি বারবার পড়ে পড়ে আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। বড়ো দ্বিধায় পড়েছি জামিলা..."

"কীসের দ্বিধা সেনেগ? বিবহেলকে সত্য বলে মেনে নাও, সব দ্বিধা দূর হয়ে যাবে।"

"সেইখানেই তো সমস্যা! গুরু জেসিয়াস ওবেরন ও আবে কপালা যা কিছু শিখিয়েছেন সেই সবকিছুকে একমুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিবহেলের কথা শিরোধার্য করে নিতে বড়ো সমস্যা হচ্ছে। সারা জীবন ধরে যা শিখেছি, যাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে এসেছি, পদে পদে যুক্তি দিয়ে যার অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি, আজ এক কথায় তার বিপরীত কোনও কথাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া কঠিন কাজ জামিলা। অথচ সেই আবে কপালার তৈরি যন্ত্র দিয়েই নিজের চোখে যা দেখেছি তাকে অস্বীকারই বা করব কী করে?"

জামিলা চমকে উঠল, "কী দেখেছ প্রিয়তম সেনেগ? আবার কোনও নতুন দুঃস্বপ্ন কি?"

"হ্যাঁ। দুঃস্বপ্নই বটে। তবে ঘুমিয়ে নয়। গত তিন রাত ধরে তা আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। দেখতে চাও?"

জানালার থেকে মাথা বের করে থাকা নল আকৃতির যন্ত্রটির দিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করল সেনেগ। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল জামিলা। একটা অদম্য ভয়মিশ্রিত কৌতূহল তাকে গ্রাস করছিল ক্রমশ। এই যন্ত্রটির একটি ছোটো সংস্করণে চোখ রাখবার পর তার মায়ের প্রতিক্রিয়াটা তার মনে আছে। পরে রাজ্ঞী জাইমেল তাকে নিভৃতে শুনিয়েছিলেন সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা। চোখ রাখবার সঙ্গে সঙ্গে কোন এক অদৃশ্য শক্তির টানে সুবিশাল টারগ্লা পর্বতটি কেমন করে হাজির হয়েছিল তাঁর একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে। আবার চোখ সরাতেই তা মুহূর্তের মধ্যে ফিরে গিয়েছিল তার সুদূর অবস্থানে। আর আজ, নগরের একেবারে এক প্রান্তে, সেই টারগ্লা পাহাড়ের কোলে এই নির্জন অন্ধকার প্রাসাদের ওপরতলার একটা ঘরের মধ্যে একাকী তাকে সেই যন্ত্রে চোখ রাখবার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে তার প্রিয়তম শয়তান উপাসক এই তরুণটি।

তার দ্বিধাটি খেয়াল করেছিল সেনেগ। হঠাৎ নিতান্তই অস্থিরভাবে তার হাত ধরে টান দিয়ে নলটির কাছে তাকে নিয়ে এল সে।

"কিন্তু সেনেগ, এই অন্ধকারে চারপাশের কোনওকিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। তবে কী দেখব?"

"সিন্টানি অন্ধকারে অদৃশ্য হলেও তার ওপরের আকাশ তা নয়। সেখানে অনেক আলো জামিলা। অনেক মুক্তি। অথচ তারই মধ্যে থেকে দেখ, চেয়ে দেখো একবার..."

ভয়ে ভয়ে যন্ত্রটির একপাশে চোখ রাখল জামিলা। অন্ধকার দৃষ্টিক্ষেত্রে ঝলমল করছে দুটি সম আয়তনের জ্যোতিষ্ক। তার পেছনের অন্ধকার থেকে সেনেগের গলা ভেসে আসছিল, "বাঁদিকে যে অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটি দেখতে পাচ্ছ সেটি জিনিয়ানের গ্রহমণ্ডলের বিংশতম নক্ষত্র। পাতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামে গুরুদেব কপালা এর নাম রেখেছিলেন রিওন। তার ঠিক পাশে যে দ্বিতীয় উজ্জ্বলতর জ্যোতিষ্কটি দেখছ, সেটি সেখানে আজ চার রাত হল আর্বিভূত হয়েছে।"

"ওর নাম কী?"

"জানি না জামিলা। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত এর কোনও অস্তিত্ব ছিলনা। আজ চার রাত ধরে এটিকে আমি দেখছি। প্রথমে একে দেখেছিলাম অতিক্ষীণ একটা আলোর বিন্দুর মতো। ভেবেছিলাম দূরবীক্ষণের কাচে কোন ধরনের প্রতিসরণের ফলে রিওনেরই অন্য একটি প্রতিবিম্ব হবে বোধ হয় তা। কিন্তু কিছু পর্যবেক্ষণ ও মাপজোক করে আমার সে ভুল ভেঙে যায়। তখন, নতুন একটি জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার করেছি ভেবে উত্তেজনার সীমা ছিল না আমার।

"পরের রাত্রে ফের পর্যবেক্ষণ করতে বসে স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম, নতুন জ্যোতিষ্কটির ঔজ্জ্বল্য বহুগুণ বেড়ে গেছে। অর্থাৎ অকল্পনীয় বেগে রিওনের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে ধেয়ে আসছে তা। কিন্তু মহাজাগতি বস্তুপিণ্ডেরা প্রকৃতির যে নিয়ম মেনে চলে তাতে এত কম সময়ে দুটি জ্যোতিষ্কের মধ্যে দূরত্ব এতটা কমতে পারে না। ভেবেছিলাম, উনিশ ও বিশ নম্বর গ্রহের মাঝখানে যে দূরতম গ্রহাণুবলয়টি আছে সেখানে কোনভাবে একটি গ্রহাণুর সঙ্গে কোন আগন্তুক ধুমকেতুর ধাক্কা লেগে বিস্ফোরণের ফলেই এই আকস্মিক ঔজ্জ্বল্যবৃদ্ধি। সেক্ষেত্রে প্রথম রাতের সেই অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটিই নিশ্চয় সেই আগন্তুক ধুমকেতু হবে। এই ধরনের মহাজাগতিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা আমি গুরু জেসিয়াসের মুখে শুনেছিলাম। সুদূর অতীতে অতি উন্নত ইরাবা সভ্যতার জ্যোর্তিবিদরা পঞ্চশির নক্ষত্রমণ্ডলে এই ধরনের ঘটনার বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। স্বচক্ষে সেই রকম একটি ঘটনা দেখতে পেয়ে আমার আনন্দের সীমা রইল না। রাত্রির প্রথম প্রহরের পর পর্যবেক্ষণ বন্ধ করে আমার খাতায় তার বিস্তারিত বিবরণী ও হিসেবনিকেশগুলি নথিবদ্ধ করতে লাগলাম..."

“আর আকাশের তারার আলো মেপে মেপে নিজের খাওয়াদাওয়া বিশ্রামের কথা তো ভুলেছই, এমনকী ছোটো বোনটা যে মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারও কোন খবর রাখোনি দু-তিনটে দিন। মেয়েটা কী খেল কখন ঘুমোল তার খোঁজ নিয়েছ কোনও? শুনলাম তো মধ্যে একদিন রাতে মেরেওছো তাকে।”

হঠাৎ চমকে উঠে চারপাশে ঘুরে দেখল সেনেগ। তারপর উদ্বিগ্ন মুখে উঠে পড়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গেল রুজবলের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে।

দূরবীক্ষণের থেকে চোখ সরিয়ে উঠে এসে তাকে হাত ধরে নিরস্ত করে জামিলা বলল, “ভেবো না। সে ব্যবস্থা হয়েছে। নীলবনের সঙ্গে তাকে প্রাসাদে পাঠিয়েছি স্নান করিয়ে খাইয়ে আনবার জন্য। কিন্তু, আর কোনও কথা নয়। আকাশের কোনও একটি জ্যোতিষ্কের ঔজ্জ্বল্য একটু বাড়ল কী কমল তা নিয়ে এমন পাগলামি যে কেউ করতে পারে তা কে জানত! সেনেগ, প্রিয়তম, তুমি উত্তেজিত, ক্লান্ত। তোমার আবিষ্কার তো তোমারই থাকবে। কেউ তাকে ছিনিয়ে নিতে আসবে না। আর, একবার যখন মুখে ঈশ্বরের গ্রন্থের পবিত্র শব্দগুলি তুমি উচ্চারণ করেছ তখন আমার আর কোনও দ্বিধা নেই। ঈশ্বর তোমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আর দুদিন পরেই অমাবস্যা। পুণ্য আইলান তিথি। সেদিন দেবগৃহে তোমাতে আমাতে গিয়ে দেবীর কাছে মার্জনা চেয়ে উপাসনা করব একসঙ্গে। সব ঠিক হয়ে যাবে দেখ প্রিয়তম।

“এখন এস। তোমার স্নায়ু উত্তেজিত হয়েছে। এই যে, আমার কাঁধে একবার মাথা রেখে চোখদুটো বুজে থাকো দেখি! সেই আগের মতো তোমার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিই। এসো প্রিয়তম।”

তার কোমল আঙুলগুলি তরুণটির ঘনকৃষ্ণ কেশগুচ্ছের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়ায়। অন্ধকার ঘরটিতে মৃদু তারকাজ্যোৎস্নার মায়াময় আবছায়া ছেয়ে থাকে। তরুণীটির গলায় আস্তে আস্তে বাজতে থাকে বলসার নগরের চিরায়ত প্রেমকাহিনি টুরাক-মন্তার-এর গাথা।

তারার চেয়েও উজ্জ্বল চোখ টুরাক নামের মেয়েটি
রাতের আকাশ হার মানে তার কেশে
সিংহের মতো বলবান সেই মন্তার নামে ছেলেটি
একদিন তারা মিলেছিল দূর দেশে
মাটির ধরায় করে স্বর্গের রচনা
একে অপরের হৃদয় আসনে বসে
নদীর মতন হাওয়ার মতন হেসেছিল সেই মেয়েটি
টারগ্লার কোলে বলসার নামে দেশে

হঠাৎ ছিটকে উঠে বসে তার কাঁধদুটি ধরে তীব্র ঝাঁকুনি দিতে দিতে সেনেগ বলল, "তুমি এখনও কিছুই বুঝতে পারনি জামিলা। কিছু বোঝনি। টুরাক মন্তার-এর প্রেমগাথা হারিয়ে যাবে জামিলা। তুমি, আমি, রুজবল – কেউ থাকবে না! কেউ না! ঘুম এলে বড়ো ভয়ংকর সব স্বপ্ন আসে চোখে। আমায় তুমি ঘুমোতে বোলো না।"

জামিলা তার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে তোমার সেনেগ? রাজবৈদ্যকে একবার..."

হঠাৎ ধেয়ে আসা উত্তেজনার প্রশমন ঘটেছে ততক্ষণে সেনেগের। জামিলার কাঁধদুটি ছেড়ে দিয়ে সরে বসে মৃদু হাসল সে। তারপর বলল, "না জামিলা। আমার কোনও অসুখ হয়নি। তুমি একটু ধৈর্য ধরে আমার সবটা কথা আগে শোনো। কাউকে খুলে বলতে না পেরে এই ভয়াবহ সত্যের বোঝা আমি আর একলা বইতে পারছি না।

"সেদিন রাত্রির শেষ প্রহরে লেখা শেষ করে কৌতূহল হতে আবার চোখ ফেলেছিলাম সেই জ্যোতিষ্কটির দিকে। ততক্ষণে সিণ্টানির ঘুর্ণনের দরুণ তা উঠে এসেছে দিগন্তরেখার থেকে প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি ওপরে। অর্থাৎ প্রায় মাথার ওপর। এইবার তার দিকে চোখ ফেলে আমি ভয় পেলাম জামিলা। মাত্রই কয়েক ঘণ্টায় তার ঔজ্জ্বল্য আরও খানিকটা বেড়ে গেছে। এর একটাই ব্যাখ্যা হয়। জোতিষ্কটি মহাজগতের সব সাধারণ নিয়মকানুন ভেঙে সত্যি সত্যিই আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। জ্যোতিষ্কের ঔজ্জ্বল্য থেকে তাদের দূরত্ব হিসাব করবার একটা সুপ্রাচীন পদ্ধতি ছিল ইরাবার জ্যোতির্বিদদের। গত কয়েক শতাব্দীর অন্ধকার যুগে তা হারিয়ে যায়। তারই একটি পুঁথি প্রভু ওবেরন আমাকে দিয়েছিলেন অনুবাদ করবার জন্য। কাজেই পদ্ধতিটা আমার অপরিচিত ছিল না।

"গতকাল সারাদিন ধরে এবারে আমি আমার মাপজোকগুলির ওপরে তার প্রয়োগ করে দেখেছি। তাতে যা ফল পেয়েছি তা হল এই – একটা অতিকায় মহাজাগতিক বস্তু মিনিটে দেড় লক্ষ মাইল বেগে ধেয়ে আসছে সিন্টানির দিকে। এর মানে ঠিক কতটা দ্রুতগতি জান জামিলা? এক মিনিটে ওই গতিতে সিণ্টানি গ্রহটাকে ছবার পাক মেরে আসা যায়।

"তার তীব্র গতির আরও একটা প্রমাণ পেয়েছি আমি। গত তিন রাতে তার অবস্থান বদলে গেছে বেশ কিছুটা করে। অত্যন্ত তীব্র গতি না হলে কোনও মহাজাগতিক বস্তুর অবস্থান এতদূর থেকে বদলাতে দেখা সম্ভব নয়। আর এই তিনরাতের অবস্থান একত্রে হিসেব করে এর গতিপথটির যে হিসেবটা বেরিয়েছে তাতে দেখেছি, গতিপথ না পালটালে তা সটান এসে ধাক্কা খাবে একেবারে সিণ্টানির বিষুব অঞ্চলে। আর তাই এই

কটা দিন ধরে বারংবার আমার মনে হয়েছে বিবহেলের ওই কাল্পনিক রূপকথা কেমন করে সত্যি হতে পারে? শেষ বিচারের দিন কি তবে সত্যি সত্যিই...”

তীব্র আতঙ্কে বুকের ভেতরটা পাথর হয়ে যাচ্ছিল জামিলার। সামনে দাঁড়ানো মানুষটাকে সে আর চিনতে পারছে না। নিভু নিভু প্রদীপের আলোয় কী ভয়ানক মূর্তি হয়েছে মানুষটার! শয়তানী যন্ত্রটা কোন নতুন মায়াজাল ছড়াচ্ছে না তো? অসম্ভব নয়। এটা তার সেনেগই তো?

হঠাৎ করে সেই অন্ধকার রাত, নির্জন ও আলোহীন সেই প্রাসাদোপম বাড়ি, টারগ্লা পর্বতের কোলে বিভিন্ন অপদেবতার হাজারো উপকথা ও তার সামনে এই অর্ধোন্মাদ মানুষ ও তার শয়তানী যন্ত্রটি মিলে একটা বুক হিম করা ছবি গড়ে তুলল সরল মেয়েটির চোখে। শয়তানের ছলের অভাব নেই। বলসারের অধিশ্বরী জাইমেলের মেয়ে সে। প্রেমিকের ছদ্মবেশে অথবা প্রেমিকের আত্মার দখল নিয়ে তার মাধ্যমে তাকে ফাঁদে ফেলে...

ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগল জামিলা। তারপর দরজার কাছে পৌঁছে সেনেগ কিছু বোঝাবার আগেই হঠাৎ সর্বশক্তি দিয়ে দৌড় দিল নীচের দিকে। রুজবল কখন যেন ফিরে এসেছে। একতলায় তার ঘরে বসে সে আর নীলবন খেলা করছিল। জামিলাকে আসতে দেখে উজ্জ্বল মুখ করে কিছু বলতে গিয়েছিল রুজবল। কিন্তু তার মুখের কথা না শুনে দুই হাতে তাকে চেপে ধরে কোলের কাছে তুলে নিয়ে ছুটতে লাগল জামিলা। শিশুটিকে রক্ষা করতে হবে এই ভয়াবহ বাড়ি আর ওই ভূতগ্রস্ত মানুষটির হাত থেকে।

কর্ত্রীর আতংক দেখে নীলবনের হাতে তখন ঝলক দিয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণধার তরবারি। সতর্ক চোখে চারদিক তাকাতে তাকাতে সে জামিলাকে অনুসরণ করে। পথে বের হয়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে বাড়িটির ওপরতলা থেকে একটা হতাশামাখা ও আতঙ্কিত আর্তনাদ তাদের রক্তকে হিম করে দিল। রুজবল তার কাঁধে মাথাটি গুঁজে দিয়ে প্রাণপণে নিজের কানদুটি চেপে ধরেছে।

চাবুকের ঘা খেয়ে তীক্ষ্ণস্বরে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল ঘোড়াদুটি। তারপর তীব্রবেগে ছুট দিল পাথর বাঁধানো অন্ধকার পথ ধরে। দূরে শহরের আলোগুলি দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে থাকা দেবী আলিয়ানার মন্দিরটির দিকে তাকিয়ে নীচুগলায় প্রার্থনামন্ত্র জপ করছিল জামিলা। “সেনেগের আত্মাকে রক্ষা করো দেবী। তার সেনেগ...

*****

মধ্যরাত অতিক্রান্ত হয়েছে। সিন্টানির অন্ধকার গোলার্ধে সকলের চোখেই ঘুম নেমেছে এখন। শুধু একজোড়া চোখ একটি যন্ত্রের চোখে চোখ রেখে বিনিদ্র রাত কাটায়। আর তার যন্ত্রের অতন্দ্র চোখকে সাক্ষী রেখে আকাশ সাঁতরে গ্রহটির দিকে ক্রমাগত এগিয়ে আসে এক অতিকায় মৃত্যুযান। একটি সুদীর্ঘকাল ধরে চলা পরীক্ষার শেষ হয়েছে। শেষ হয়েছে সেই পরীক্ষার বিষয়দের অস্তিত্বের সমস্ত প্রয়োজনীয়তার। তবে তারা তার খবর রাখে না। পরম ভালোবাসার জীবনকে ধ্রুব জেনে তারা ঘুমিয়ে আছে তাদের গ্রহটির কোলে, যাকে তারা সৃষ্টির সূচনা থেকে নিজেদের প্রাকৃতিক বাসস্থল বলেই জানে। ভুল জানে যদিও। অবশ্য তাদের জানা বা না জানায় তখন আর কিছু যায় আসে না তাদের সৃষ্টিকর্তাদের।

*****

আইলানের পুণ্যতিথি

দেবী আলিয়ানার মন্দিরে সেদিন সকাল থেকেই ব্যস্ততা চলছে। প্রধান পুরোহিত কুভুলা বারিকস তাঁর বারোজন প্রধান শিষ্যকে নিয়ে কাজকর্মের তদারকি করছিলেন। বিবহেলে বর্ণিত যে, বারোটি বাৎসরিক উৎসব রয়েছে আজ তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠটির দিন। আজ সন্ধ্যায় রাজ্ঞী জাইমেল স্বয়ং দেবী আলিয়ানার পুজো দিতে আসবেন। বছরে এই একটি দিন তিনি নিজে মন্দিরে আসেন। সেদিন মন্দিরে কোনও পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। নির্জন গর্ভগৃহে রাজ্ঞী একাকী মুখোমুখি হন দেবীর। সে পুজোর আসনে স্বয়ং কুভুলা বারিকসেরও আসবার অনুমতি নেই। বন্ধ দরজার বাইরে তিনি অপেক্ষা করে থাকেন তাঁর প্রধান শিষ্যদের নিয়ে। আর নীচের প্রধান চত্বরে সেদিন নগরীর সমস্ত প্রজা এসে জড়ো হন। যতক্ষণ পূজা চলে, ততক্ষণ মন্দিরের চত্বরে দাঁড় করানো দেবীর সুবিশাল এক দ্বিতীয় মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে ও বসে সকলে নীরবে প্রার্থনা করেন। তারপর রাজ্ঞী মন্দির থেকে বের হলে দেবীজ্ঞানে তাঁরই দর্শন করেন সকলে। লোকে বলে রাজ্ঞী এই দিনটিতে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে দেবীর উপাসনা করেন। আপন রক্তের বিনিময়ে মঙ্গলকামনা করেন বলসার নগরী ও তাঁর বিস্তৃত সম্রাজ্যের সকল প্রজার জন্য।

মন্দিরের সমস্ত জানালাগুলি কালোরঙের পর্দা দিয়ে আবৃত ছিল। কোনও উন্মাদ প্রজার আত্মঘাতী ধৃষ্টতায় যাতে রাজপরিবারের নিভৃত পূজার গোপনীয়তা ভঙ্গ না হয় তাই এই ব্যবস্থা।

জিনিয়ান অস্ত যাবার ঠিক আগে একটি আট ঘোড়ার রথে চেপে রাজ্ঞী এসে পৌঁছেছেন মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনে। আজ তিনি একা নন। সঙ্গে কন্যা জামিলাকেও নিয়ে এসেছেন। বারিকসের শিষ্যরা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকে দেখে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুভুলা তাদের প্রশ্ন করার থেকে বিরত করলেন। আগের দিন সকালেই তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে রাজ্ঞীর কথা হয়ে গেছে।

একটি সুবিশাল চাকা লাগানো বাতিদানে একশোটি উজ্জ্বল দীপ জ্বালিয়ে রেখে দরজার সামনে অপেক্ষা করছিলেন প্রধান পুরোহিত। জাইমেলের হাতে সসম্মানে তার হাতলটি ধরিয়ে দিয়ে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

শ্বেতবর্ণের সূক্ষ্ম মলমলের আবরণে মুখ ঢাকা রাজ্ঞী ও জামিলা দুজনে মিলে বাতিদানটি ঠেলতে ঠেলতে ঢুকে গেলেন মন্দিরের ভেতরে। ঘর্ঘর শব্দে বন্ধ হয়ে গেল গর্ভগৃহের দরজা। বাইরের কোনও কোলাহল আর এবারে এখানে পৌঁছোবে না। শান্তিময় সেই নির্জনতায় বাতিদানের উজ্জ্বল আলোককে সাক্ষী রেখে রাজ্ঞী জাইমেল এসে বসলেন দেবী আলিয়ানার মূর্তিটির পদতলে। জামিলা বসেছিল তাঁর পাশেই। গত দুদিন আগের রাত্রিবেলায় যা যা ঘটেছিল সেনেগের বাসগৃহে, তার সবই তিনি শুনেছেন জামিলার মুখে। ঈশ্বরের ভয়ংকর শাস্তি নেমে এসেছে সেনেগের ওপর। সে যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে সে বিষয়ে আর তাঁর কোনও সন্দেহ নেই এর পরে।

গোটা ঘটনাটা বারংবার শুনে তিনি কুভুলা বারিকস নিশ্চিত হয়েছেন যে, সন্ধ্যাবেলা জামিলা যখন সেনেগের কাছে যায় তখন সে সুস্থ ছিল। এমনকী বিবহেল থেকে পাঠ করেও সে শুনিয়েছে জামিলাকে সেই সময়। কিন্তু তারপরে সেই শয়তানী যন্ত্রটি দিয়ে দেবতার আবাসস্থলে চোখ ফেলতে জামিলাকে বাধ্য করার সঙ্গে সঙ্গেই সেনেগের ওপরে শাস্তি নেমে আসে।

ঈশ্বর নিজেই যাকে শাস্তি দিয়েছেন তাকে আর নতুন করে কোনও শাস্তি দেওয়ার অর্থ নেই। তবে ঘটনাটির মধ্যে দিয়ে অন্য কিছু কিছু ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। তাই নিয়ে মন্ত্রীসভা ও পুরোহিতসংঘের সঙ্গে দীর্ঘ আলচনার পর কর্মপদ্ধতি স্থির করা হয়েছে। আর সেই জন্যই জামিলাকে আজ সঙ্গে করে নিয়ে আসা দেবী আলিয়ানার গর্ভমন্দিরে।

সূক্ষ বস্ত্রের আবরণ থেকে ছোটো একটি সোনার পাত্র আর হীরকখচিত ছোরাটি বার করে এনে তাই তিনি আজ নিজের বদলে জামিলার বুকের কাপড়টি অল্প একটু সরিয়ে দিলেন। শিউরে উঠে জামিলা তাঁর মুখের দিকে তাকাল একবার। নীচু স্বরে জাইমেল বললেন, “ঈশ্বরের নির্দেশ পরিষ্কার। যে কর্তব্য আমার করবার কথা ছিল, স্নেহের বশে তা করতে আমি ব্যর্থ। দেবতা তাই সেনেগের শাস্তি, তার প্রিয়তম মানুষটির

মাধ্যমে পূর্ণ করে এই ইঙ্গিত করেছেন যে, ধর্মাচরণের পথে দুর্বলতার কোনও স্থান নেই, এবং আমি রাজ্ঞী হিসেবে আর ধর্মকে রক্ষা করবার যোগ্যও নই।

"তোমার মাধ্যমে সেনেগের শাস্তিবিধান করে এবার থেকে জগতে ধর্মকে রক্ষার দায়িত্ব তিনি তোমাকেই দিয়েছেন জামিলা। তুমি সেই দায়িত্ব নিয়ে আমায় ভারমুক্ত করো।"

বলতে বলতে জামিলার বুকের ওপর ছুরির ঘায়ে একটি অগভীর রক্তমুখী আঁচড় ফুটে উঠল। বিন্দু বিন্দু করে নেমে আসা রক্তের ধারা সোনার পাত্রটিতে সংগ্রহ করে নিয়ে সেটি জামিলার হাতে ধরিয়ে দিয়ে রাজ্ঞী তার কানে কানে পাঠ করতে লাগলেন বলসার নগরীর শাসকদের দেবীপূজার বংশানুক্রমিক বীজমন্ত্রটি।

সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল জামিলার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো, প্রাচীন ও অবোধ্য এক ভাষায় বলা মন্ত্রের শব্দগুলি কেবল সে উচ্চারণ করে চলে তার মায়ের সঙ্গে সঙ্গে...

এক গভীর ধ্যানে ডুবে গিয়েছিলেন মা ও কন্যা দুজনেই। কত সময় যে কেটে গেছে তা দুজনেরই অজানা। হঠাৎ গর্ভগৃহের বাইরে থেকে আসা কোলাহলের শব্দে চেতনা ফিরে এল তাঁদের। একটু পরে, দরজার ওপর ঘন ঘন করাঘাতের শব্দ এল। ভ্রূকুঞ্চিত করে উঠে দাঁড়ালেন রাজ্ঞী। তাঁদের পূজার বিঘ্ন যে ঘটিয়েছে সে যে-ই হোক না কেন। তাকে এর শাস্তি পেতে হবে। শাসকের চিহ্নস্বরূপ তলোয়ারসহ কোমরবন্ধটি খুলে নিয়ে জামিলার কোমরে বেঁধে দিয়ে নীচু স্বরে তিনি বললেন, "তৈরি হয়ে নাও জামিলা। দেবী আজ তোমার শাসনের প্রথম দিনেই তোমার হাতের কোন পাপীর বলি চেয়েছেন। তাঁর সাধ অপূর্ণ রেখ না মা। যে বিধর্মী পশু দরজায় ধাক্কা দিয়ে তোমার পূজার বিঘ্ন ঘটিয়েছে তার রক্তে দেবীর মন্দিরকে পবিত্র করো আজ।"

দরজা খুলতেই একটা সুউচ্চ কোলাহলের ধ্বনি এসে ধাক্কা দিল তাঁদের কানে। চত্বরে এসে জড়ো হওয়া হাজার হাজার মানুষ ভয়ে যেন উন্মাদ হয়ে গেছে। গর্ভগৃহের দরজাতেও অজস্র মানুষের ভিড়।

রাজকীয় সেনাবাহিনীর যে দলটি তাঁদের দেহরক্ষী হয়ে এসেছিল তারাও সেই ভীত জনতার ভিড়ে সামিল হয়েছে। নিঃসীম আতঙ্কে অস্থির হয়ে তারাই সকলে মিলে ধাক্কা দিচ্ছিল দরজায়। এত মানুষের মধ্যে কার দেহে আঘাত করবে জামিলা? আস্তে আস্তে তরবারিটি কোষবদ্ধ করল সে। কুভুলা বারিকস খানিক দূরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে চোখ ফেলতেই প্রজাদের আতঙ্কের কারণটা তার বুকেও পাথরের মতো চেপে বসল এসে।

অমাবস্যার আকাশ ধুয়ে যাচ্ছে উজ্জ্বল রূপোলি আলোয়। কিন্তু আকাশে যে বড়োসড়ো এবং অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটি ভেসে উঠেছে সেটি তাদের পরিচিত সুদর্শনা ইরো নয়। পরিবর্তে, এক ভয়ালদর্শন বিকৃত এবড়োখেবড়ো পাথরের স্তূপ যেন তা। তার গায়ে অজস্র গহ্বরের দাগ, টারগ্লার গুহাবাসী বিষাক্ত সরীসৃপ কামুরার বিষগ্রন্থিগুলির মতো জেগে আছে।

সকলের চোখের সামনে ধীরগতিতে দিকচক্রবাল থেকে সেটি উঠে আসছিল ওপরের দিকে। অবশেষে, প্রায় মাঝ আকাশে পৌঁছে তার গতি রুদ্ধ হল। মূর্তিমান অভিশাপের মতো স্থির হয়ে সেখানেই ঝুলে রইল তা।

*****

"কিন্তু কী ওটা মহাপুরোহিত?"

"এখনও এই প্রশ্ন করেছেন কুমারী রাজ্ঞী? ওই ভাসমান প্রস্তরখণ্ডটি, সারারাত ধরে আয়তনে বাড়তে বাড়তে যা প্রায় অর্ধেক আকাশ ঢেকে ফেলেছে তা যে বিবহেলের বর্ণিত সেই শেষ বিচারের দিনের মৃত্যুনক্ষত্র! তা কি এখনও বোঝেননি আপনি?"

"কিন্তু, কী অপরাধ করেছি আমরা?"

"অপরাধ? তা আমাদের হয়েছে বৈকি। বহু মানুষ বারে বারে তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে যখন, আমরা তাদের সঠিকভাবে দমন করিনি। বিজ্ঞানের নামে, যুক্তিবাদের নামে জ্ঞানবৃক্ষের বিষময় ফল অম্লান বদনে আহার করেছি আমরা। তবুও ঈশ্বর অনেককাল আমাদের ক্ষমা করে এসেছেন রাজ্ঞী, কিন্তু পাপের বোঝা এবারে আমাদের সত্যই পূর্ণ হয়েছে। এখন কুমারী রাজ্ঞী, আপনি যেমন করতে বলেন..."

"মহাপুরোহিত, আপনি আমাদের পথ দেখান। মহামান্যা রাজ্ঞীমাতা জাইমেল মা, পিতৃতুল্য বারিকস, আপনারা আমাদের বাঁচান। আমি তো কোনও পাপ করিনি। আমায় বাঁচান আপনারা। ওই যে উঠোনে খেলছে ছোটো মেয়েটি, ওর নাম রুজবল। ও কী পাপ করেছে? শেষ বিচারের দণ্ড কেন নেমে আসবে ওর মাথাতে? ও তো এখনও জীবনকে দেখলই না!"

কান্নায় ভেঙে পড়া জামিলার দিকে তাকিয়ে বড়ো কষ্ট হচ্ছিল জাইমেলের মনে। কোনও ভুল করলেন না তো তিনি? সম্রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো বিপদের দিনে শাসনের দায়িত্বটি এভাবে একটি অপরিণত কিশোরীর হাতে তুলে দেওয়া – কিন্তু তাই তো ঈশ্বরের নির্দেশ ছিল! কিন্তু না। তা হতে পারে না। হঠাৎ মনস্থির করে জামিলার মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, "কুমারী রাজ্ঞী, আজকের দিনটির জন্য কেবল তোমার

হয়ে আমি বলসারের শাসনভার নিলাম। যা করবার তা এবারে আমিই করব। তুমি যাও। বিশ্রাম করো।”

প্রতিবাদ করল না জামিলা। গত দুদিন ধরে দেহ ও মনের ওপর ক্রমাগত চাপ নিতে নিতে এক অদ্ভুত অসাড়তা এসে ঘিরে ধরেছে তাকে। যন্ত্রচালিতের মতোই উঠে ঘরে থেকে বের হয়ে এল সে।

*****

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল তা সে জানে না। এক দুঃস্বপ্নময় কদর্য নিদ্রা, যা ক্লান্তিকে হরণ করবার বদলে আরও তীব্রতরই করে। দুঃস্বপ্নময় সেই অশান্ত ঘুমটি তার পুরোপুরি ভেঙে গেল বাইরে থেকে এক সুউচ্চ কোলাহলের শব্দে। ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখল, পর্দাগুলি খোলাই রয়েছে। বাইরেও কেমন আবছায়া অন্ধকার নেমেছে। তার মানে ঘুমের মধ্যেই একটি দিন কেটে ফের সন্ধ্যা চলে এল কি?

অদ্ভুত একটি দমচাপা গরমের অনুভূতি হচ্ছিল জামিলার। এই প্রথম বসন্তের দিনে এমন অনুভূতি হবার কথা তো নয়! পাশের ছোটো চৌকিটিতে রুজবল ঘুমিয়ে। লাল ঠোঁটদুটি একটু ফাঁক হয়ে আছে তার। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। গায়ের চাদরটিও ভিজে উঠেছে ঘামে। তাড়াতাড়ি একখণ্ড নরম কাপড় দিয়ে তার শরীরটিকে মুছিয়ে দিল জামিলা। ঘুমের মধ্যেই একটি ছোট্ট শ্বাস ফেলে তার হাতের ভেতর মুখটি গুঁজে ফের নিঃসাড়ে শুয়ে রইল শিশুটি। বলসারের রাজ্ঞীর নিরাপদ আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে সে। অথচ...

বাইরে কোলাহলের ধ্বনি আবার তীব্রতর হয়ে উঠল। মাথা তুলে ডাক দিল জামিলা — “নীলবন।”

নীলবন দরজার ঠিক বাইরেই অপেক্ষা করছিল। ডাক শুনে নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়াল।

“অত শব্দ কীসের?”

“প্রধান পুরোহিত, রুষ্ট ঈশ্বরকে তুষ্ট করবার জন্য শয়তানের প্রধান সহচরদের বলি ঘোষণা করেছেন। কারাগার খুলে বন্দী শয়তানের পূজারিদের বার করে আনা হয়েছে। শেষ রাত থেকে এই দ্বিপ্রহর পর্যন্ত দুশো আশিজনের বলি দেওয়া হয়েছে। ঐ গর্জনগুলি এক একজন পাপীর মুণ্ডচ্ছেদের পর জনতার জয়ধ্বনির শব্দ।”

“দ্বিপ্রহর কোথায় নীলবন? সন্ধ্যা বলো।”

“না কুমারী রাজ্ঞী। সন্ধ্যা নয়। জানালা দাঁড়িয়ে একবার বাইরে দেখুন।”

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার পাশে গিয়ে আকাশের দিকে চোখ ফেলল জামিলা। সমস্ত আকাশ ছেয়ে ভেসে আছে এক অতিকায় ছাইবর্ণ পাথরের পিণ্ড। তার গায়ে অজস্র অতিকায় সুড়ঙ্গের মুখ তাদের অন্ধকার চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে সিন্টানির দিকে। যেন এক অতিকায় গুহার মধ্যে বন্দী হয়েছে সমস্ত নগরীটি। মাথার ওপরে নীল আকাশের বদলে সেই গুহার ছাদ!

"পুরোহিত বারিকস নির্দেশ দিয়েছেন বেলা তৃতীয় প্রহরের মধ্যে সমস্ত বলি সম্পন্ন করতে হবে। আর..."

"আর, কী নীলবন?"

"কুমার সেনেগকে সপরিবারে বলি দেবার নির্দেশ হয়েছে। তাঁকে ও তাঁর ভগ্নী রুজবলকে বন্দী করে শৃংখলিত অবস্থায় নিয়ে আসবার আদেশ দেওয়া হচ্ছে। প্রাসাদরক্ষী বাহিনীর একটা বিরাট দলকে তৈরি রাখা হয়েছে। এখন কেবল আদেশনামা হাতে পাবার জন্য অপেক্ষা করছে তারা। সমস্ত বলি শেষ হয়ে যাবার পর কুভুলা বারিকস নিজে হাতে তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করে মৃত্যুনক্ষত্রের পূজা সম্পাদন করে দেবতাকে তুষ্ট করতে চান। এখন আপনার আদেশ কী কুমারী রাজ্ঞী?"

হঠাৎ রুজবলের পাশটি ছেড়ে ছিলাছেঁড়া একটি ধনুকের মতোই উঠে দাঁড়াল জামিলা। আদেশের অপেক্ষায় নীলবন এসে নতজানু হয়ে অপেক্ষা করছে আর সামনে।

সেইদিকে তাকিয়ে শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠে সে বলল, "নীলবন, আমি সেনেগের কাছে যাব।"

নীলবন নিঃশব্দে একটি তিরপূর্ণ তূণীর ও ধনুক এগিয়ে ধরল জামিলার দিকে। নিজে হাইলান দ্বীপের মেয়ে সে। সেখানকার মাতৃতন্ত্রের জন্মযোদ্ধা মেয়েরা নিজের ভালোবাসার জন্য প্রাণ নিয়ে বাজি খেলাকে কর্তব্য বলেই মনে করে। হাইলান থেকেই একদিন বলসার রাজপরিবারের বধূ হয়ে এসেছিলেন রাজ্ঞী জাইমেল। সেই রক্ত আজ জামিলার ধমনীতে কথা বলছে।

তিরধনুক পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে তলোয়ারসহ কোমরবন্ধটি পরতে পরতে নীলবনের দিকে তাকিয়ে জামিলা বলল, "রুজবলকে যে আমার ব্যক্তিগত কক্ষে রাখা হয়েছে সে কথা কে কে জানে?"

"আপনি ও আমি বাদে তৃতীয় কেউ জানে না। এখন চলুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"তোমার হাতে অস্ত্র কেন নীলবন?"

"কুমারী রাজ্ঞী, আমি আপনার সঙ্গে..."

"না নীলবন। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে যাচ্ছি আমি। মৃত্যুর পর তাই অনন্ত নরক আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। তবে আমি জানি সেখানে আমার

সেনেগও থাকবে আমার সঙ্গে। আমার তাই তাতে ভয় নেই কোনও। কিন্তু তুমি কোন লোভে আমার সঙ্গে নরকের পথে যাবে? এ পাপ করা তোমার সাজে না নীলবন। তোমার ভালোবাসার মানুষ আছে। সন্তান আছে। তুমি কেন আমার সঙ্গে...”

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল নীলবন। কঠোরহৃদয় যোদ্ধা মেয়েটির চোখে এই প্রথম জল এল। হৃদয় ও কর্তব্যের এত বিচিত্র দ্বন্দ্বের মধ্যে আর কখনও সে পড়েনি তার সরলরৈখিক সাদাসিধে যোদ্ধাজীবনে। ওদিকে জামিলা ততক্ষণে ঘুমন্ত রুজবলকে কোলে তুলে নিয়েছে। নীলবন নীচু গলায় বলল, “কুমারী রাজ্ঞী, আপনার ঘোড়া...”

“কোথায়?”

“প্রাসাদের পেছনদিকের দরজার বাইরে একটি আফানা ফুলের ঝোপের মধ্যে বাঁধা আছে। আপনি নিশ্চিন্তে যান। কেউ টের পাবে না।”

*****

“সেনেগ, সেনেগ জাগো! ওরা আসছে! সেনেগ!”

এক গভীর সুষুপ্তির থেকে ধীরে ধীরে যেন ভেসে উঠল সেনেগ। আধো অন্ধকারে তার মুখের ওপর মুখটি নামিয়ে জামিলা ডাকছিল।

“তুমি? এত ভোরে। এখনও তো অন্ধকার কাটেনি ভালো করে!” ধড়মড় করে উঠে বসতে বসতে সেনেগ বলল।

“চুপ। জোরে শব্দ কোরো না।” ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল জামিলা। তারপর নীচু গলায় বলল, “এখন মধ্যাহ্ন। কিন্তু এই গ্রহের আকাশে জিনিয়ান আর কোনওদিন উঠবে না সেনেগ। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখ বাইরে।”

জামিলার প্রসারিত হাতটিকে অনুসরণ করে জানালার বাইরে চেয়ে দেখল সে। পরিচিত নীল অথবা নক্ষত্রখচিত আকাশটি সেখান থেকে উধাও হয়েছে। তার জায়গায় সেই দিগন্তপ্রসারী বিপুলায়তন ভস্মবর্ণ পাথরের টুকরোটি ভেসে আছে আকাশ জুড়ে। তার প্রভায় একটা মরা আলো ছড়িয়ে আছে সমস্ত চরাচরে।

তাড়াতাড়ি উঠে জানালার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বাধা পেল সেনেগ। জামিলা পেছন থেকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলেছে, “জানালার সামনে যেও না। ওরা তোমায় ধরতে আসছে। দেখে ফেললে...”

সচকিত হয়ে সেনেগ চোখ ফেলল তার মুখের দিকে, “কারা আসছে?”

“আমার সৈন্যরা সেনেগ। তুমি জানো না, আমি এখন বলসারের কুমারী রাজ্ঞী। বলসারের মঙ্গলের জন্য, প্রধান পুরোহিতের বিধানে ওরা তোমায় বন্দী করতে আসছে। তোমায় ও রুজবলকে দেবী আলিয়ানার মূর্তির সামনে বলি দিয়ে তারা এই দৈব রোষকে শান্ত করতে চায়।”

“তুমি কেন এসেছ তবে?”

“আমি?”

হঠাৎ ভারী শান্ত হয়ে এল জামিলার গলা, “পাপপুণ্যের হিসেব আমি বুঝি না সেনেগ। শুধু জানি আমরা দুজনে হয় একসঙ্গে বাঁচব, না হয় একসঙ্গে মরব। আমার শরীরে রাজরক্ত বইছে যে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বলি দিলে তার মতো পুণ্য কি আর কিছু হবে সেনেগ? দৈব রোষ তুষ্ট হবে, আমরাও আর আলাদা হব না। কেমন? ভালো না?”

দু হাতে তার মুখটি ধরে একবার ভালো করে দেখল সেনেগ। কতদিন জামিলার চোখে চোখে রেখে দেখেনি সে! সেখানে ভয়ের কোনও চিহ্ন ছিল না। কান্নাহাসির রোদবৃষ্টির ঢল নেমেছে তার গভীর বাদামি চোখে।

“তবে চলো। দুজনে মিলে বাইরে যাই। আমাদের বলি নিয়ে যদি সত্যিই দেবতা তুষ্ট হন তাহলে...”

“না-আ-!”

হঠাৎ তীব্র গলায় চিৎকার করে দুহাতে সেনেগকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরল জামিলা, “না সেনেগ। আমি মরতে চাই না। আমি বাঁচতে ভালোবাসি।”

দুটি হাতের গাঢ় বাঁধনে ভালোবাসার নারীটিকে জাপটে ধরে যুবকটি বলল, “চলো তবে, পালাই।”

“কোথায়? কতদূরে পালাব আমরা সেনেগ? আমার সৈন্যদের হাত থেকে যদি বা পালাতে পারি, এই সিন্টানি গ্রহ ছেড়ে তো আর কোথাও পালাতে পারব না। আকাশের দিকে দেখো সেনেগ! নিয়তি আমাদের নাগাল ঠিক ধরে নেবে।”

“তবে কী করতে চাও জামিলা?”

হঠাৎ চোখে অস্বাভাবিক এক দীপ্তি জ্বালিয়ে মেয়েটি বলল, “লড়াই করবে সেনেগ? চলো। ফাঁদে পড়া হিংস্র লাইকরের মতো, না মরা অবধি লড়াই করে বেঁচে নেওয়া যাক। যতক্ষণ পারি। এসো সেনেগ, রুজবলকে আমার পিঠে বেঁধে দাও। তাড়াতাড়ি করো প্রিয়তম। অস্ত্র নাও হাতে। পেছনের দুয়ার দিয়ে বার হয়ে পাহাড়ের অলিন্দ বেয়ে চলে যাব আমরা। ওদিকে নিজন অরণ্য আছে।”

*****

খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে দুটি মানুষ-মানুষী এগিয়ে যায় তাদের নিয়তিনির্দিষ্ট ভবিতব্যের দিকে। জামিলার পিঠে রুজবল ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় ত্রস্ত হয়েছে তার শিশুমনও। দুটি হাতে জামিলার পিঠটি আঁকড়ে ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সে। বনলতার তীক্ষ্ণ কাঁটার আঁচড়েও তার সেই স্তব্ধতা ভাঙছে না আজ। মাঝেমাঝে শুধু মাথা উঁচু করে সে চেয়ে দেখে তার পরিচিত দুনিয়ার অপরিচিত নতুন আকাশটিকে। মুক্তির শূন্যতার জায়গায় সেখানে এখন এক সুবিস্তীর্ণ পাথরের ছাদ।

বেশ খানিকক্ষণ চলবার পর একটি চওড়া পাথরের চাতাল দেখে সেখানে একটু বিশ্রাম করতে বসেছিল তারা। এই পাহাড়ের ছোটো ছোটো ঝরনা আছে অনেক। বন্য ফলেরও অভাব নেই। রুজবলের খিদে পেয়েছিল। তাদের বসিয়ে রেখে তা-ই জোগাড় করতে গিয়েছিল সেনেগ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জামিলা চাতালটির ধার দিয়ে নীচে উঁকি মারল একবার, যদি তার দেখা মেলে। আর সেই মুহূর্তটিতেই চোখে পড়ল, অনেকটা নীচে পাহাড়ের পাদদেশে সেনেগের বাড়িটা ঘিরে পিঁপড়ের মতো ভিড় করে দাঁড়িয়েছে সৈনিকের দল। পাহাড়ের তনুভূত বাতাসে কান পাতলে তাদের সম্মিলিত শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল একটু একটু। আর, সেই দলটির একপাশ থেকে সরু সুতোর মতো একটি ধারা এইদিকে উঠে আসছিল আঁকাবাঁকা পথে পাক খেয়ে খেয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেনেগ যখন ফিরল, ততক্ষণে ক্রমেই এগিয়ে আসা সৈন্যদলটির পোশাক আশাক এইখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

অতএব আবার যাত্রা। আবার সেই আড়াল খুঁজে খুঁজে দ্রুত পায়ে এগোনো। কিন্তু সে চেষ্টা করেও লাভ হল না কিছু। কারণ সৈন্যদের আরও একটি দল অনুসন্ধান চালাচ্ছিল পাহাড়ের আর এক পথে। হঠাৎ করে একেবারেই কাছে থেকে একটা কোলাহলের শব্দ উঠল। অপরিসর একটি খাদের অন্য পাশ দিয়ে এগিয়ে আসা খোঁজারু সৈনিকদের একটি দ্বিতীয় দল তাদের দেখা পেয়েছে।

রুজবলকে নিয়ে মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ল জামিলা। তারপর তাকে আঁকড়ে ধরে রেখেই ক্ষিপ্রগামী সাপের মতো ছিটকে গেল একটা বড়ো পাথরের অন্তরালে। সেনেগও ততক্ষণে অন্য একটি পাথরের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে ধনুকে তির সংযোজন করেছে।

দলটি ছোটো। বড়োজোর কুড়িজন সৈন্য হবে। তাদের নেতা, অন্য দলগুলিকে সংবাদ দেবার জন্য একটা শিঙা তুলে ধরেছিল ঠোঁটের কাছে। কিন্তু তাতে ফুঁ দেবার

আগেই সেনেগের তির গিয়ে তার গলায় গেঁথে গেল। দ্বিতীয় কোনও শব্দ না করে খাদের মধ্যে উলটে পড়ল তার দেহ। শিঙাটিকে সে তখনও আঁকড়ে ধরে আছে হাতে।

মৃত্যুমুখী তিরের দল ততক্ষণে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে খাদের ওপার থেকে। পাথরের নিরাপদ আড়ালে বসে থাকা পলাতক তিনজনকে তা ছুঁতে পারে না অবশ্য। উত্তরে এদিক থেকে কিছুক্ষণ বাদে বাদে এক জোড়া করে তির ছুটে যায় নিখুঁত লক্ষ্যে।

ধীরে ধীরে কমে আসছিল খোঁজারুদের সংখ্যা। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। হঠাৎ তাদের পেছন দিকে থেকে ভেসে এল শিঙার তীক্ষ্ণ ও সুদীর্ঘ ধ্বনি। দ্বিতীয় একটি দল দেখা দিয়েছে সেদিক থেকে। এদিকে পাথরের আড়াল নেই। রুজবলকে নিয়ে মাথা নীচু করে শুয়ে পড়ল জামিলা, আর মুখ ঘুরিয়ে নতুন দলটির দিকে লক্ষ্য স্থাপন করে ধনুকে শরযোজন করল সেনেগ। কিন্তু সে তিরটি ছোঁড়া আর তার হল না। উলটোদিক থেকে হঠাৎ ছুটে আসা একটা বল্লম এসে আঘাত করল তার জ্যা আকর্ষণকারী বাহুটিতে।

ধেয়ে আসা দলটির এক বিরাটদেহী যোদ্ধা হঠাৎ ছুটতে ছুটতেই নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল বিরাট একটা পাথরের টুকরো। তার লক্ষ্য আহত সেনেগ। জামিলা তার দিকে ঘুরে তির ছুঁড়েছিল বটে, কিন্তু শেষরক্ষা হল না। তিরটা তাকে আঘাত করবার আগেই সেনেগের মাথা লক্ষ্য করে প্রচণ্ড শক্তিতে পাথরটি ছুঁড়ে দিয়েছে সেই সৈনিক। আঘাতের তীব্রতায় মাটি ছেড়ে ডিগবাজি খেয়ে উঠল সেনেগের শরীরটা। তারপর টাল খেয়ে পড়ল তার পেছনের গভীর খাদটির ভেতরে। পরক্ষণেই, জামিলার নিক্ষিপ্ত তিরে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাওয়া হত্যাকারী সৈনিকের দেহটিও অনুসরণ করল তাকে ।

ধনুকটি হাতে করে পাথরের মতো সেইদিকে চেয়ে দেখছিল জামিলা। শুধু যদি আর একটি মুহূর্ত আগে তিরটা বের হত তার ধনুক ছেড়ে! হঠাৎ হাত থেকে ধনুকটা ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিল সে। যুদ্ধ শেষ। আর কেন তবে?

পিলপিলে করে যোদ্ধার পোশাক পরিহিত মানুষের একটা দল তাদের ঘিরে ফেলেছে এসে। দুটি রূঢ় হাত রুজবলকে ঝুলিয়ে শূন্যে তুলে নিয়েছে... বালিকাটির তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদের শব্দ গরম ধাতুশলাকার মতোই এসে ক্রমাগত ঢুকে যাচ্ছিল তার কানে...

তারপর আরও একদল রূঢ় হাত এসে চেপে বসল তার সর্বাঙ্গে। সাধারণ এই সৈনিকরা তাদের রাজকন্যাকে কখনও চাক্ষুষ দেখেনি। অতএব তাকে তাদের চিনতে পারবার প্রশ্নও নেই। যুদ্ধে জিতে নেওয়া তরুণ নারীশরীরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার কোনও কারণও অতএব তাদের ছিল না।

*****

টেনে, হিঁচড়ে তাদের তুলে নিয়ে যখন সৈনিকরা রওনা দিয়েছে দেবী আলিয়ানার মন্দির চত্বরের দিকে, ঠিক সেই সময় তাদের অগোচরে মাথার ওপর ভেসে থাকা বিশালাকার যানটির সারাদেহে ফুটে থাকা গর্তগুলির মুখ থেকে স্বচ্ছ বায়ুনিরোধক আবরণগুলি সরে গেল। তাদের ভেতর থেকে বের হয়ে ভুপৃষ্ঠের ওপর দুলতে দুলতে নেমে আসছিল এক একটি অর্ধগোলাকাকার অবতরণযাযান। বলসার নগরীর সৈনিকরা অবাক ও ভীত চোখে চেয়ে দেখল সেগুলির দিকে।

তবে সে কেবল কয়েক মুহূর্তেরই জন্য। কারণ তারপরেই সেই ভাসমান প্রস্তরখন্ডের ভেতর থেকে বার হয়ে আসা সুর্নিদিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘের এক বেতার ঝলক একই সঙ্গে এসে সাড়া তুলল সিণ্টানির সমস্ত বাসিন্দার মস্তিষ্কের একটি বিশেষ গ্রন্থিতে। সহস্র বছর আগের কোন এক বিজ্ঞানী এই শেষের দিনটির কথা ভেবেই জৈবযন্ত্রগুলির জিনের মধ্যেকার দেহসংকেতে লিখে দিয়েছিলেন এই গ্রন্থিটির গঠনপ্রণালী। মস্তিষ্কের গভীরে প্রোথিত একটি ছোটো গ্রন্থি। আপাতদৃষ্টিতে তার কোনও শারীরবৃত্তীয় কাজ নেই। সকলের চোখের আড়ালে মধ্যমস্তিষ্কের গভীরে বসে সে বংশানুক্রমে অপেক্ষা করে চলে একটি সুনির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘের বেতারসংকেতের স্পর্শের জন্য। আজ সেই স্পর্শটি পেয়ে হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠল সে। পূর্বনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে স্নায়ুতন্ত্রের জৈব বিদ্যুত প্রবাহের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটিয়ে মুহূর্তে দখল নিল সমস্ত মস্তিষ্কটির। তারপর অপেক্ষা করে রইল প্রভুযান থেকে আসা পরবর্তী বেতার নির্দেশের জন্য।

অর্ধগোলকাকার বিচিত্রদর্শন যানগুলি ততক্ষণে সমস্ত গ্রহের প্রতিটি জনবসতি অঞ্চলে নেমে এসেছে। আয়তনে তারা এ গ্রহের যে কোনও নগরের সাধারণমাপের একটি প্রাসাদের সমান।

প্রতিটি জনবসতির প্রাকারের বাইরে, বিস্তীর্ণ কৃষিভূমিতে ফলে থাকা ফসলের স্বর্ণাভ আবরণকে দলিতমথিত করে তারা স্থির হল এসে ভূপৃষ্ঠের ওপর।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে ধনী, দরিদ্র, নারী, পুরুষ, শিশু অথবা বৃদ্ধ, বেতার নিয়ন্ত্রিত সমস্ত সিন্টানিজ মানবযন্ত্র তাদের নিজের নিজের নগরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যানটির দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে চলে। চিন্তাহীন মস্তিষ্কগুলি থেকে ততক্ষণে যাবতীয় ভয়, ভক্তি, আনন্দ, দুঃখ ও অন্যান্য যাবতীয় আবেগ ঘুচে গেছে। অনুভূতির অপ্রয়োজনীয় মস্তিষ্কক্রিয়াকে থামিয়ে দিয়ে সক্রিয় করে রাখা হয়েছে শুধু তাদের স্মৃতিকোষগুলিকে। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত স্মৃতিতথ্যের ভাণ্ডার উজাড় করে আজ তারা সৃষ্টিকর্তার কাছে তাদের জন্মঋণ শোধ দেবে।

তাদের চোখগুলি ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সামনের দিকে। তাদের বোধহীন মনে ক্রমাগত ঘুরে ফিরে যাওয়া আসা করে কত আবেগহীন স্মৃতির মিছিল। স্বার্থহীন নৈর্ব্যক্তিকতায় এক উদ্দেশ্যহীন স্মৃতিচারণ করতে করতে স্বর্গ থেকে নেমে আসা প্রাসাদগুলির উদ্দেশ্যে পথ চলে তারা।

তেমনি একটি চলমান মিছিলে কুমারী রাজ্ঞী জামিলার পাশাপাশি হেঁটে চলে বালিকা রুজবল। তাদের আগেপিছে হেঁটে চলে কিছুক্ষণ আগে তাদের ধরতে আসা সৈনিকের দলটি। তাদের সকল বিরোধের, সকল দুঃখ ও উত্তেজনার সমাপ্তি ঘটেছে এই মুহূর্তে। তাদের মাথার ওপর ভেসে থাকে এক শিলাময় বন্ধুর আকাশ, তাদের সামনে ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে ওঠে একটি অর্ধগোলকাকার গৃহ, যার ভেতর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল বহুবর্ণ আলোর মায়াবী বিচ্ছুরণ ও বিচিত্র কিছু যান্ত্রিক ধ্বনি।

সেই গৃহের দরজায় পৌঁছতে তাদের নিজেদের হাতেরই আঙুলগুলি যান্ত্রিক দক্ষতায় খুলে দেয় নিজের নিজের দেহের পোশাকের গ্রন্থি। জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে তারা পা রাখে একটি নাতিপ্রশস্ত চলমান পথে। গৃহের কেন্দ্রস্থলে একটি উচ্চ আসনে সুবিশাল এক শ্বেততপ্ত অগ্নিপিণ্ড তাদের অপেক্ষায় থাকে। পথ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে সেই অগ্নিদেবতার দিকে। চলতে চলতেই মাথার ঠিক ওপরে চলমান দ্বিতীয় একটি যন্ত্র, কোনও বিচিত্র ও অজ্ঞেয় কৌশলে শুষে নেয় তাদের স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত যাবতীয় তথ্য, তার ব্যক্তিত্ব, তার অস্তিত্বকে। তারপর আমিত্ব-রহিত দেহযন্ত্রটি গিয়ে আত্মসমর্পণ করে অগ্নিদেবতার মুখগহ্বরে। একটা মৃদু শক্তির ঝলক ওঠে শুধু... কিছু অণু পরিমাণু ঝরে পড়ে ও ভেসে যায় গ্রহটির বুকে...

*****

তার অচেতন শরীরটি পড়ে ছিল খাদের গভীরে। পড়বার আগেই মাথায় তীব্র আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল সে। চেতনাহীন মস্তিষ্কটি তাই সাড়া দিতে পারেনি সেই অমোঘ বেতার আহ্বানে।

প্রায় দুদিন পরে ফের চেতনা ফিরে এল সেনেগের। অপরাহ্নের জিনিয়ানের প্রখর আলো এসে পড়েছে তার মুখে ও শরীরে। মাথা নাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখাবার চেষ্টা করতে গিয়ে একটা তীব্র যন্ত্রণার ঢেউ ছড়িয়ে গেল সারা শরীরে। ফের কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে অবশেষে ব্যথাটাকে একরকম অগ্রাহ্য করেই আস্তে আস্তে মাথা তুলল সে। গভীর, সমুদ্রনীল আকাশ। হানাদারের কোন চিহ্নও নেই কোথাও। গাছের পাতার আড়ালে ঝিঁঝি ডাকছিল কাছেপিঠে কোথাও। ফুলে ফুলে প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি।

একটা কৌতূহলী খরগোশ তাকে এসে দেখে গেল একবার। সব শান্ত। সব স্বাভাবিক। প্রলয়ের কোন চিহ্নও নেই কোথাও!

খাদের নীচ দিয়ে একটা ক্ষীণ জলধারা বহে যাচ্ছিল। তার শীতল স্রোতে কপালের ক্ষতটি ভালো করে ধুয়ে নিয়ে পোশাকের একটই অংশ ছিঁড়ে ফেলে তাই দিয়ে পটি বেঁধে নিল সেনেগ। পেট ভরে জল খেয়ে গায়ে যেন বলও এল কিছুটা। এই অঞ্চলটা সেনেগের নিজের হাতের তেলোর মতো চেনা। ছোটোবেলা থেকে কতবার শিকারের খোঁজে এই খাদটার মধ্যে এসে নেমেছে সে! এখান থেকে মূল শহরে পৌঁছোবার সহজ পথ আছে একটা। দিনের আলো থাকতে থাকতে সেখানে পৌঁছোনো দরকার। শহরের মূল ফটক জিনিয়ান অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। জামিলা আর রুজবলের জন্য বড়ো দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। শহরে গিয়ে আগে তাদের খবর নিতে হবে।

*****

দুর্বল শরীর নিয়ে বারবার বিশ্রাম নিতে নিতে বন্ধুর পাহাড়ি পথ পার হয়ে সে সেইদিন দিন শেষ হবার আগে শহরে পৌঁছতে পারেনি। উদ্বিগ্ন মন নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মূল ফটকে পৌঁছে অবশ্য তার মনটা ভালো হয়ে গিয়েছিল। ফটক খোলাই আছে আজ।

শহরের পথঘাট আজ আশ্চর্যরকম নির্জন। প্রহরীস্তম্ভগুলো সব ফাঁকা। বিপণিগুলি সমস্তই খোলা আছে, কিন্তু লোকজন নেই কোনও। কোথায় গেল মানুষগুলো। দিনের এই সময়টা তো তাদের ভিড়ে গমগম করে এই বাজার এলাকাটি!

যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে পড়ছিল তার। বড়ো খিদেও পেয়েছে। পথের পাশে এক রুটিওয়ালির দোকান দেখে তার মধ্যে ঢুকে এল সে। কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার।
দোকানের ভেতর পা দিয়ে যেন একটা ধাক্কা খেল সে। ফাঁকা পড়ে আছে দোকানটা। একজনও মানুষের দেখা নেই সেখানে। তাকগুলিতে সাজিয়ে রাখা খাবারের স্তূপ থেকে দুর্গন্ধ উঠছে। সারি সারি পচা খাবারের স্তুপে পোকামাকড়ের ঘোরাঘুরি।

অন্যমনস্কভাবেই গলা তুলে দোকানদারকে ডাকতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেল সেনেগ। এতক্ষণ ধরে নিজের অজ্ঞাতেই যে ভয়টা পাক দিয়ে উঠছিল তার মনে, এইবার হঠাৎ সেটা সত্যি হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে — এই শহরে আর কোনও জীবিত মানুষ নেই।

*****

"দূরত্ব?"

"দশ মিলিয়ান মাইল। ন্যূনতম নিরাপদ দূরত্বের পঁচিশ শতাংশ বেশি।"

"সিগমা ফেজার?"

"চার্জিং চলছে।"

"চার্জিং শেষ হবার আনুমানিক সময়?"

"আরও আঠারো ঘণ্টা।"

"তার মানে, আঘাতমুহূর্ত আসবে আগামীকাল ১৬ ইউ এম টি নাগাদ, তাই তো? ধন্যবাদ কমান্ডার। আপনি এখন আসতে পারেন। সরাসরি সম্প্রচারের বন্দোবস্ত চালু রাখবেন।"

অভিবাদন জানিয়ে নিঃশব্দে বার হয়ে গেলেন কমান্ডার জিমুক।

দরজার শক্তি আবরণটি ফের দৃশ্যমান হতে মহাথের রালাবাস কমিউনিকেটরের বোতাম টিপলেন। সিনেট এই গ্রহটির নির্বীজকরণের এই শেষ পর্বটিও সরাসরিই দেখতে চেয়েছে। সময়টা জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

*****

কেউ কোথাও নেই। রূপকথার ঘুমন্ত রাক্ষসপুরীর মতো নির্জন নগরীটি চুপ হয়ে আছে। পাখির ডাক আছে, পথে ঘুরে বেড়ানো শতেক পোষ্য জীবের বেঁচে থাকবার বহুতর প্রমাণও ছড়িয়ে আছে চারপাশে। শুধু জীবন্ত মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকবার শতসহস্র দৃশ্য-শব্দ-গন্ধের কোনও চিহ্ন নেই কোথাও। চারপাশে এলোমেলো ছড়িয়ে আছে সমস্ত বয়সের মানুষের বহুবর্ণ পোশাকের স্তূপ। অথচ মানুষগুলো নেই। সকাল থেকে এই শহরের পথে পথে অনেক খুঁজেছে সে। কিন্তু একফোঁটা রক্ত কিংবা কোনওরকমের দুর্যোগের সামান্যতম চিহ্নেরও দেখা মেলেনি কোথাও। কোনও ক্ষতি হয়নি সমস্ত বলসার নগরীটির। সবই আছে। ঠিক সেই আগেরই মতো। শুধু মানুষগুলো নেই।

পায়ের কাছে একটা লালরঙের পোশাক। হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে। সেটাকে হাতে তুলে নিয়ে কী মনে হতে বুকের কাছে চেপে ধরল সেনেগ। মেয়েদের পোশাক। একটা হালকা সুগন্ধ উঠে এসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল তার নাসারন্ধ্রে। হঠাৎ একটা তীব্র আকাঙ্খা উগ্র বিষের মতো ছড়িয়ে পড়ল তার শিরায় শিরায়... একবার... শুধু একবার ওই দুটি মানুষের স্পর্শটুকু যদি পাওয়া যেত! হঠাৎ নিজের ওপর সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তার প্রিয় দুটি মেয়ের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল সেনেগ। আর তারপর বাঁধভাঙা জলের ধারা নেমে এল তার তৃষ্ণার্ত চোখদুটি বেয়ে।

তারপর একসময় চারপাশের জনহীনতার গভীর নৈঃশব্দ এসে গ্রাস করল তার সমস্ত চেতনাকে। প্রধান মন্দিরের দরজার বাইরে একটি সোপানে বসে মাথাটিকে দুটি হাঁটুর মধ্যে গুঁজে দিয়ে, পরাজয়ের এক প্রস্তর-প্রতিরূপের মতোই বসে রইল সে গ্রহের সেই একমাত্র জীবন্ত মানুষটি। এইখান থেকে মন্দিরের ভেতরকার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়ানো দেবী আলিয়ানার সুবিশাল মূর্তিটির মুখ দেখা যায়। করুণাঘন দুটি চোখ মেলে যেন তিনি তারই দিকে চেয়ে থাকেন শুধু।

বেলা পড়ে আসছিল। সামনে পাথরবাঁধানো চত্বরে জিনিয়ানের ঘড়িটির ছায়া দেখাচ্ছে বিকেল চারটে বাজে প্রায়। হঠাৎ একঝলক হাওয়া হু হু করে ঝাঁপিয়ে এল নির্জন প্রান্তর বেয়ে। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে থাকা অজস্র বস্ত্রখণ্ডগুলি তাতে সওয়ার হয়ে ভেসে উঠেই ফের ছড়িয়ে পড়ল মাটির ওপর। অদৃশ্য মানুষের একটি দল বুঝি বা নিজেদের দেহগুলিকে খোঁজবার ব্যর্থ একটা চেষ্টা করে ক্ষান্ত হল ফের।

সেই দিকে তাকিয়ে দেখে হঠাৎই অসারত্বের আবরণ ছিঁড়ে সচেতন হয়ে উঠল মানুষটির মন। সমস্ত চেতনাকে সুতীব্র দহনে জ্বালিয়ে দিয়ে একটা হাহাকার বার হয়ে এল তার গলা দিয়ে... আমায় কোন অপরাধে এই একাকিত্বের শাস্তি দিলে ঈশ্বরী আমার? অস্তিত্বের এই গুরুভার এইবারে তুমি ফিরিয়ে নাও দেবতা। নেমে আসুক বিবহেলে বর্ণিত সেই অভিশাপের অগ্নিময় ধারা। তারপর নির্বাণের শান্তিময় অন্ধকার...

তারপর ফের নৈঃশব্দ এসে গ্রাস করল সমস্ত সিণ্টানিকে। আকাশ বাতাস চরাচর যেন শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছে শেষ বিচারের অন্তিম মুহূর্তটির জন্য। ঘড়িটির ছায়া শুধু আস্তে আস্তে এগিয়ে চলছিল নিয়তিনির্দিষ্ট কোনও এক অজানা সময়বিন্দুর দিকে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তটিতে, মানুষটির বোধ ও ইন্দ্রিয়ের অগোচরে, শূন্যতার অপ্রমেয় ব্যবধানে, তার কল্পনারও অতীত এক দূরত্বে ভেসে থাকা একটি অতিকায় মৃত্যুযানের ভেতর, একজন পার্থিব মানুষ, যে কিনা নিজেকে প্রকৃত মানুষ বলেই বিশ্বাস করে, সে একটি বোতামে মৃদু একটি চাপ দিল। যন্ত্রের নির্দেশ মেনে যানটির সম্মুখের একটি গহ্বরের আবরণ সরে গিয়ে সেইখান দিয়ে বার হয়ে এল বিধ্বংসী সিগমা রশ্মির পুঞ্জীভূত অদৃশ্য শক্তির ধারা। আলোর গতিতে সেই অকল্পনীয় দূরত্ব কয়েক মুহূর্তে অতিক্রম করে তা ঢুকে এল সিণ্টানির আবহমণ্ডল চিরে। তার স্পর্শে আয়নীভূত হয়ে তপ্তোজ্জ্বল অগ্নিবর্ণে তার গতিপথকে রাঙিয়ে দিল গ্রহটির বাতাস।

স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই আগুনের ধারা এসে প্রথম আঘাত হানল দেবী আলিয়ানার মন্দিরটির গায়ে। এক অমল শান্তির অনুভূতি ছড়িয়ে গেল তরুণটির অনন্তকালস্থায়ী

খন্ডমুহূর্তের চেতনায়। তারপর, মন্দির ও সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে তার দেহটিও বাষ্পীভূত হয়ে মিলিয়ে গেল, একটি ভেঙে যাওয়া স্বপ্নেরই মতো।

গোটা গ্রহটির দেহ জুড়েই তখন ঝরে পড়ছে মৃত্যুর অগ্নিময় ধারা। মানবিক অস্তিত্বের পাপকে ধুয়েমুছে সাফ করে দিয়ে পবিত্র সিণ্টানি ফিরে চলেছে তার সভ্যতাপূর্ব পবিত্র কুমারী অস্তিত্বে।

*****

গ্যালাক্সির প্রান্তীয় অঞ্চলের অন্য একটি গ্রহে, এই গ্রহের সৃষ্টিকর্তারা, যারা কিনা সভ্যতার শুরু থেকে নিজেদের প্রকৃত মানুষ ও সেই অধিকারে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ও নিয়তি নির্ধারক হিসেবেই জেনে ও বিশ্বাস করে থাকে, তারা তখন বিপুল করতালি ধ্বনিতে অভিনন্দন করে চলেছে তাদের শত্রুবিনাশের এই পুণ্য মুহূর্তটিকে।

❑ ❑ ❑ ❑

শূন্য গর্ভ

মহুয়া মল্লিক

(এক)

ঘুমের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠে বসল মিতালি। শব্দের উৎসটা বুঝতে পেরেই, ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল। এবার একটু একটু লজ্জাই করছিল, টিনের চালের উপর খুব জোরে বৃষ্টি পড়লে এমনই জোরালো আওয়াজ হয়, আর ঘুমের মধ্যে মিতালি ভেবেছিল, আধলা ইট পড়ছে বুঝি বাড়িতে! টর্চ জ্বেলে একবার পুরোনো আমলের টাইমপিসটা দেখে নিল। ভোররাত, এখন উঠেও লাভ নেই। বড়ো তক্তপোশের ধার ঘেঁষে নয় বছরের মেয়েটা কেমন যেন কুঁকড়ে শুয়ে আছে, ওর গায়ে একটা হালকা চাদর ঢাকা দিয়ে পাঁচ বছরের ছেলেটাকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিল। ছেলে বুবুন ঘুমের ঘোরে দুবার উঁ-উঁ শব্দ করে মিতালির বুকের মধ্যে নিশ্চিন্তে মুখ গুঁজে দিল। পাশেই আরেকটা ক্যাম্প খাটে ইন্দ্রনীল এপাশ ওপাশ করছে, ক্যাম্প খাটের ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর আওয়াজ জানান দিচ্ছিল, মানুষটার ঘুম ভেঙে গিয়েছে, বা হয়তো সারারাতই দু চোখের পাতা এক করতে পারেনি সে!

দু চোখের পাতা কি মিতালিও এক করতে পারে! তবু দুঃস্বপ্নের রাত জাগতে জাগতে এক সময় মরণ ঘুমে ঢলে পড়ে। সারাদিন পরিশ্রম তো আর কম হয় না! একা হাতে এই পুরোনো জরাজীর্ণ বাড়িটাকে গুছিয়ে বাসযোগ্য করা। ঘরের যাবতীয় কাজ, সন্ধেবেলায় মেয়েটাকে পড়তে বসানো, ঝক্কি তো নেহাত কম না! ইন্দ্রনীল ঠায় শুয়ে থাকে দেওয়ালের দিকে মুখ করে, মিতালিই অতি কষ্টে প্রায় একমাস সংসারটা কীভাবে টানছে, সবার মুখে অন্ন যোগাচ্ছে, তা সেই জানে! হাতের সম্বল শেষ হয়ে গেলে, ছেলেমেয়ে দুটোর মুখে কীভাবে যে অন্ন ধরবে, ভাবলেই বুক কাঁপে ওর। অথচ ঘরের মানুষটার কোনও চেষ্টাই নেই। মিতালি কিছু বলতে গেলে বোবা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

দিশাহারা হয়ে যায় মিতালি। পাড়ার লোকজন প্রথম প্রথম কদিন উপযাচক হয়ে সহানুভূতি দেখাতে এসেছিল। এখন একদম চুপ করে গিয়েছে। তবে ওদের ফিসফিসানি দেখে মিতালির মনে হয় আসল ব্যাপারটা হয়তো সবাই টের পেয়ে গিয়েছে। যতই মিতালি আর ইন্দ্রনীল বলুক না কেন, শহরে ওদের ব্যবসা ফেল করে যাওয়ায় তল্পিতল্পা গুটিয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরেছে। বিঘে আড়াই জমিটাও হুট করে বিক্রি করে দিতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে। মিতালি আপাদমস্তক শহরে মানুষ হওয়া মেয়ে। ম্যানেজ দেওয়ার কণ্ঠে বলেছিল, "আসলে ওর ব্যবসাটা ফেল করল তো, আর কিছু পাওনাদারদের ধার মেটাতেই জমিটা বিক্রি করতে হল।" খুড়তুতো জা ভাসুররা তখনকার মতো চুপ করে গেলেও, টুয়াকে প্রশ্ন করেছে, "হ্যাঁ রে, শহরে যে বাড়িটায় থাকতিস, ওটা তোদের নিজের নাকি ভাড়া বাড়ি?" বাচ্চা মেয়ে অতশত বোঝে না। সরল মনে উত্তর দিয়েছে, "নিজেদেরই তো ছিল বাড়িটা। জানো, কত ফুলের গাছ ছিল আমাদের ব্যালকনিতে, কী সুন্দর ছিল আমাদের বাড়িটা! কিন্তু বাপির তো অনেক টাকার দরকার, তাই বিক্রি করে দিয়েছে বাড়িটা, আর থাকার জায়গা নেই বলেই তো আমরা ঠাম্মির এই বাড়িটায় চলে এলাম।" বুল্টুদাদা তখন টুয়াকে বলল, "এই, মিথ্যে কথা বলছিস কেন? ইন্দ্রকাকা আবার কবে ব্যবসা করত? দেখেছ মা, এই টুকুন মেয়ে কী মিথ্যুক!" জেঠিমা একটু বাঁকা হেসে বলেছিল, "যেমন গাছ, তেমন ফল হবে তো।" টুয়া আর ওখানে দাঁড়ায়নি, এক ছুটে বাড়ির মধ্যে চলে এসেছিল। একটা কথা সে বুঝতে পারছিল না, তার বাপি তো রোজ সকালে ভাত খেয়ে অফিস যেত। কিন্তু বাপি ব্যবসা করত একথাটা কেন যে মা ওকে শেখাতে গেল! সে মোটেই মিথ্যা কথা বলতে পারে না, দু-একবার চেষ্টা করে দেখেছে বললে কেমন ধরা পড়ে যায়, যেমন আজ বুল্টুদাদা ধরে ফেলল। বাড়ি ফিরেই মেয়েটা মিতালির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মিতালি বুঝতে পারছিল, ছোট্ট মনের যন্ত্রণার কথা। সব ওই লোকটার জন্য। আরও উঁচুতে ওঠার বাসনায় লোকটা ভুলেই গিয়েছিল অত উঁচু থেকে নীচে পড়লে কী অবস্থা হতে পরে! বুক চিরে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল মিতালির। পাশের খাট থেকে ইন্দ্র টের পেয়েছিল মিতালির জেগে ওঠা। মিতালির উদ্দেশে সে বলল, "সব কেমন হয়ে গেল তাই না মিতা? দু কামরার ফ্ল্যাট ছেড়ে রাজারহাটের দিকে খোলামেলা তিন কামরার ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়ার কথা চলছিল, আর নিয়তি দেখো, আজ এই গ্রামের টিনের চালের ঘরে তোমাদের নিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। কোনও কাজকর্ম না পেলে আর কিছুদিন পরে হয়তো সপরিবারে বিষ খেয়ে মরতে হবে। একেই বলে নিয়তি!" ইন্দ্রর কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারল না মিতালি, মশারি তুলে দ্রুত নেমে এসে স্বামীর খাটে গিয়ে উঠল। ইন্দ্রর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, "একথা বোলো না, ঠিক ভগবান মুখ তুলে চাইবে।"

ইন্দ্র কিছু না বলে মিতালির বুকের মধ্যে বাচ্চা ছেলের মতো মুখ লুকিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠল। মিতালি ওর মাথায় হাত রেখে ভাবছিল, ফেলে আসা স্বপ্নের দিনগুলোর কথা। ও যে খুব অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে ছিল তা না, নিম্নবিত্ত পরিবারের গ্র্যাজুয়েট সুন্দরী মেয়ে ছিল, আসা যাওয়ার পথে স্যুট-টাই পরা ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার ইন্দ্রনীলের সঙ্গে দেখা, মন দেওয়া নেওয়া, তারপর চার হাতের এক হওয়া। শুনেছিল ইন্দ্রনীল একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করে। বিয়ের পর অবশ্য জেনেছিল, চাকরি ঠিক নয়, একটা বিমা কোম্পানির এজেন্ট। তাতে অবশ্য মিতালির কোনও দুঃখ ছিল না। এক কামরার ছোট্ট ঘরে সংসার পেতেছিল মনের মতো করে। মাঝে একবার গ্রামের বাড়িতে শাশুড়িকে প্রণাম করেও গিয়েছিল। তখন ইন্দ্রর মা বেঁচে ছিলেন। বৌ দেখে তিনি অখুশি হননি। শেষ সম্বল এক জোড়া সোনার বাউটি দিয়ে পুত্রবধূকে বরণ করে তুলেছিলেন। মিতালি বারবার শহরের যাওয়ার কথা বললে তিনি বলেছেন, "স্বামীর ভিটে ছেড়ে কোথাও গিয়ে আর শান্তি পাব না মা। তার থেকে তোমরা মাঝে মাঝে এখান থেকে ঘুরে যেও।" এই গ্রামের বাড়ির সঙ্গে সর্ম্পক বলতে মিতালির এটুকুই। আর আজ এই বাড়িটাই তার দুনিয়া হয়ে গিয়েছে। সত্যি একেই মনে হয় বলে নিয়তি!

সেই এক কামরার ভাড়া বাড়ি থেকে কলকাতার বুকে নিজস্ব ফ্ল্যাট, দুই সন্তানের জন্ম একটু একটু করে জড়িয়ে গিয়েছিল মিতালি। স্বস্তিতে শান্তিতে পরিপূর্ণ সংসার নিয়ে তার জীবনটা কাটছিল। ইন্দ্রনীল তাকে দু হাতে ভরিয়ে দিয়েছে। ভাইয়ের গলব্লাডার অপারেশন বা বোনের বিয়েতে দু হাতে খরচ করতে কখনও বাধা দেয়নি, উলটে মিতালিকে উৎসাহিত করেছে। তখন কী আর জানত মিতালি, একদিন সেইসব মানুষগুলো তার কাছ থেকে সরে যাবে, তার ছায়াকেও ঘেন্না করবে! ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে দুটোকেও কেউ চরম বিপদের দিনে কোলে টেনে নেয়নি। ইন্দ্রনীল যে বিমা কোম্পানির হয়ে কাজ করত, সেই বিমা কোম্পানির মুখোশ খুলে যেতে সারা দেশ যখন উত্তাল, তখন ওই কোম্পানির এজেন্টরা কেউ বিষ খাচ্ছে, কেউ গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ছে আর ঠকে যাওয়া জনতা আধলা ইঁট ছুঁড়ে মারছে এজেন্টদের, তেমনই অগ্নিগর্ভ অবস্থায় নিজেদের ফ্ল্যাট, জমানো টাকা, গয়না এমনকী দেশের বাড়ির অল্প জমিখানাও বিক্রি করে পাওনাদারদের থেকে উদ্ধার পেয়েছে তারা। আর কপর্দক শূন্য হয়ে দেশের বাড়িতে ফিরে এসেছে। হাতের অল্প টাকা নিঃশেষ হয়ে গেলে তাহলে কি ইন্দ্রর কথা মতো বিষ খেয়ে মরতে হবে সবাইকে! নিজে মরতে ভয় নেই তার, কিন্তু ছোটো ছোটো সন্তান দুটো? ওদের কী অপরাধ? আর ভাবতে পারছিল না সে, পাশের বিছানায় ছেলেটা তাকে না পেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠতে, ইন্দ্রকে ছেড়ে সেদিকে পা বাড়াল মিতালি।

(দুই)

"কই গো মা জননী কোথায় গেলে? তোমার হাতের চায়ের স্বাদ বড়ো ভালো, চা খেতে এলাম গো মা।" অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুয়েছিল মিতালি। কাজকর্ম সেরে একটু শুয়ে পড়েছিল সে, আর চোখ দুটো নিজের অজান্তেই লেগে গিয়েছিল কখন টেরও পায়নি। ছেলে মেয়ে দুটি বৃষ্টি একটু ধরতেই কোথায় যে বেরল, সন্ধে হয়ে আসছে, এখনও ফেরার নাম নেই। বিধুকাকুর গলা পেয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসল সে, চোখের কোণ দিয়ে একবার ইন্দ্রকে দেখল। ওর ভাবলেশ মুখ দেখে ঠিক বুঝতে পারল না, বিধুকাকুর গলা ওর কানে গিয়েছে কিনা।

"কই গো বৌমা, গেলে কোথায়?" মিতালি আর দেরি না করে বারান্দায় বেরিয়ে এল। যা ভেবেছে তাই! বিধুকাকু থলি ভরতি করে কাঁচা সবজি আর বাচ্চাগুলোর জন্য ফল মিষ্টি নিয়ে এসেছে। ছেলেটা সেদিন ম্যাগি খাবে বলে বড্ড বায়না করেছিল, তাও কয়েক প্যাকেট এনে হাজির করেছে। প্রায়ই হাতে করে এটা সেটা দিয়ে যান তিনি। মিতালির খুব খারাপ লাগে রোজ এভাবে জিনিস নেওয়াটা। জিনিসগুলো দেখে, মিতালি বলব-না-বলব করে বলেই ফেলল, "কাকু রোজ রোজ এসব না-ই বা দিলেন, হাত পেতে নিতে নিতে অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে যে। তার থেকে বরং আপনার ভাইপোর জন্য একটা কাজ দেখে দিন।" বিধুকাকু কয়েক মুহূর্ত থমকে গিয়ে বললেন, "ইন্দ্রর জন্য কি আর চেষ্টা করছি না মা? তোমার শ্বশুর আমার প্রাণের বন্ধু ছিল, ইন্দ্র তো ছোটোবেলায় আমার কোলে-কাঁখেই বেড়ে উঠেছে। ওর জন্য আমি না ভেবে থাকতে পারি? আর কিছুদিন আগে হলে, লক্ষ্মী রাইস মিলেই ঢুকিয়ে দিতে পারতাম।" ধুতির খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "দেখছি মা কী করা যায়।" ইন্দ্র এতক্ষণে বেরিয়ে এসেছে, বারান্দায় পুরোনো কাঠের চেয়ার টেনে বসতে বসতে মিতালিকে বলল, "চা বসাও আর আমাদের দুজনকেই অল্প করে তেল মাখিয়ে মুড়ি দিও।"

কদিন আগেই জিনিসপত্রের স্তূপ ঘেঁটে ইন্ডাকশনটা বের করেছে মিতালি। ভাগ্যি বুদ্ধি করে জিনিসটা নিয়ে এসেছিল। এখানে আর পাঁচটা বাড়ির মতোই তাদেরও হকিং করে চলে। অতএব ইলেকট্রিক বিল নিয়ে সমস্যার কথা নেই। চা বসাল মিতালি। তারপর বিধুকাকুর আনা জিনিসগুলো গুছিয়ে রেখে, চানাচুর দিয়ে মুড়ি মেখে দুজনকে চা-মুড়ি দিয়ে আসতে না আসতেই ছেলেমেয়েগুলো কলকল করে বাড়ি ফিরল। আজ ওদের সামনে মুড়ির বদলে ম্যাগির প্লেট ধরলে কী খুশিই যে ওরা হবে, ভাবতে ভাবতেই মিতালির চোখে জল এসে গেল। টুয়া রান্নাঘরে এসে মাকে ম্যাগি বানাতে দেখেই বলে

উঠল, “দাদু এনেছে তাই না মা? ইসস ভাইটা কী খুশি হবে, দাঁড়াও ভাইকে বলে আসি।” মিতালি ওকে থামায়, “এই দাঁড়া দাঁড়া, ওকে বলতে হবে না, আগে হাত মুখ ধুয়ে নে, দুজনে, কোথায় কাদা ঘেঁটে এলি ঠিক নেই।” টুয়া হাসতে লাগল, “বুঝেছি মা, তুমি ভাইকে সারপ্রাইজ দিতে চাও, তাই না?” মিতালি ওকে জড়িয়ে ধরল, মেয়ের কপালের এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে দিতে দিতে বলল, “আমার সোনা মেয়ে, যাও দু ভাইবোনে হাত পা ধুয়ে পড়তে বসো, আমি ম্যাগি নিয়ে যাচ্ছি।”

মিতালি দেখেছে বিধুকাকু এলে ইন্দ্রর মন বেশ ভালো থাকে। প্রাণ খুলে কথা বলে, সেই সময় ছেলে মেয়েদের সঙ্গেও খুনসুটি করে। অন্য কেউ এলে পারতপক্ষে সামনে আসে বা এলেও হুঁ-হাঁ করে কাটিয়ে দেয়। আসলে বাকিরা তো আসে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে। কেউ এগিয়ে এসে সাহায্য করবে না, শুধু তাদের নিয়ে আলোচনা, ফিসফিস যা হয় এইসব পাড়াগ্রামে। ঘণ্টা দুই আড্ডা দিয়ে বিধুকাকু যখন ফিরে যাচ্ছিল, টর্চে আলো দেখানোর বাহানায় মিতালি সদর দরজা পর্যন্ত এল, তারপর পিছন ফিরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা ইন্দ্রকে একবার দেখে নিয়ে খুব চাপা গলায় বলল, “কাকু, আপনার ভাইপোর কিছু ব্যবস্থা করতে না পারলে আমার জন্যই না হয় যা হোক কাজ দেখে দিন একটা।” খুব অবাক হয়ে ওকে দেখতে দেখতে বিধুকাকু বললেন, “বৌমা তুমি কী কাজ করবে!” “যা হোক কিছু একটা কাজ, সে লোকের বাড়িতে রান্নারই হোক না কেন, আমি করব।” স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি একথা শুনে। আহা কত আরামের জীবন ছিল মেয়েটার, তিনি নিজে কলকাতায় ইন্দ্রদের কাছে থেকে এসেছেন। কী যত্নআত্তি যে পেতেন ওখানে গেলে। সেই মেয়ে বলে কিনা রান্নার কাজ নেবে! বিধুকাকুর চোখে অশ্রু চিকচিকিয়ে উঠল, কোনও রকমে তিনি তাড়াতাড়ি ফেরার পথ ধরলেন।

দুই ভাইবোন পড়ছিল আর পাশের খাটে ইন্দ্র আড়মোড়া হয়ে বসেছিল। রান্নাঘর গুছিয়ে এসে ইন্দ্রর পাশে বসল মিতালি। টুয়া, বাবুনকে এ-বি-সি-ডি লিখতে দিয়ে নিজের পড়া করছে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মিতালি, ইন্দ্রর সঙ্গে অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছিল আর ঠিক তখনই হাতের খাতা পেন্সিল সরিয়ে রেখে মিতালির গলা জড়িয়ে বাবুন প্রশ্ন করল, “মা গরিব মানে কী গো? আমরা এখন গরিব হয়ে গিয়েছি? গরিব কী করে হয়?” ইন্দ্র ছেলের এই আপাতনিরীহ কথাটুকু শুনেই স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠে ঠাস করে ছেলের গালে এক চড় কষিয়ে দিল। ঘটনার আকস্মিকতায় সব থেকে ঘাবড়ে গিয়েছে বাবুন নিজেই, মায়ের কোলে বসে সে তার জন্ম-চেনা বাবাকে অচেনা হতে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে, টুয়া বরং ডুকরে

কেঁদে উঠতে মিতালির ঘোর ভাঙল। চেঁচিয়ে উঠল সে, “এ কী করলে তুমি! তুমি কি মানুষ? নিজের ব্যর্থতার শাস্তি দিচ্ছ এতটুকু দুধের শিশুকে? জানতে না লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।” এই ক মাসের সংযম ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে মিতালির, প্রবল ধ্বস নামার আগে ইন্দ্রনীল দ্রুত পাঞ্জাবিটা পরে নিয়ে বৃষ্টি মাথায় করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

টুয়া শুধু একবার বাপির পথ আটকাতে চেয়েছিল। মিতালির ধারালো দৃষ্টির সামনে সে কুঁকড়ে পিছু হটে গেল। অনেকক্ষণ পরে টুয়া সাহস করে মাকে একবার বলল, “আমাকে টর্চটা দেবে মা? বাপিকে খুঁজতে যাব?” বাবুনকে ঘুম থেকে উঠিয়ে জোর করে খাইয়ে, শুইয়ে দিয়ে, টুয়াকে খেতে দিয়ে মিতালি বলল, “পাকামি না করে খেয়ে শুয়ে পড়ো, তোমার বাপি বাচ্চা নয় যে, হারিয়ে গেছে খুঁজে আনতে হবে।” টুয়া ভয়ে মুখ খোলেনি আর, এমনিতেই মা খুব রেগে গিয়েছে। রেগে গেলেই মা তাকে এমন তুমি-তুমি করে কথা বলে। তবে বাপির জন্য এত কষ্ট হচ্ছিল তার, যে ভাত গলায় আটকে যাচ্ছিল। মায়ের ভয়ে, নিঃশব্দে খেয়ে উঠে পড়েছিল সে। বাবুন টুয়া ঘুমিয়ে পড়ার পর অনেক রাত্রে ভিজে চুপচুপে হয়ে বাড়ি ফিরেছিল ইন্দ্রনীল। মিতালি গায়ের পাঞ্জাবি ছাড়িয়ে গামছা দিয়ে গা-মাথা মুছিয়ে দিয়ে ভাত বেড়ে দিয়েছিল। দুজনে নিঃশব্দে খেয়ে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। বিছানায় ক্লান্ত শরীর পড়তেই পলকে ঘুম নেমে এসেছিল মিতালির চোখে আর সারা রাত এপাশ ওপাশ করে কাটিয়ে দিল ইন্দ্র। তীব্র অপরাধবোধে সারাটা রাত দগ্ধ হয়েছে সে, কোনও দিন ছেলেমেয়েদের যে মানুষ, মৌখিক শাসনটুকুও করেনি, সে কিনা আজ... একসময় দরজা খুলে বাইরে এসে পাগলের মতো নিজের ডান হাতটা মেঝেতে ঠুকছিল আর পাগলের মতো কাঁদছিল অসহায় মানুষটা। চাপা গোঙানির আওয়াজ পেয়ে ভোররাতে মিতালি যখন উঠে এসেছিল, তখন এবড়োখেবড়ো শানের মেঝেতে ইন্দ্রর হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছে। এই দৃশ্য দেখে নিজেকে আর সামলাতে পারল না মিতালি। মেঝের উপর বসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল।

(তিন)

রাত্রির বুক চিরে টাইমপিসটা টিক টিক করে নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়ে যাচ্ছে। ঘুমন্ত সন্তানদের ছুঁয়ে মিতালির মনে হচ্ছে, ঘড়িটা যেন ওকে বলতে চাইছে, "ঠিক, ঠিক, তুমি যা ভাবছ একেবারে ঠিক।" ঘুম আসছে না আজ কিছুতেই মিতালির দু চোখে। ওপাশে ইন্দ্রনীলও এপাশ ওপাশ করছে, আজকাল তার ঘুমও খুব পাতলা হয়ে গিয়েছে। মিতালি তাই নিঃসাড়ে শুয়ে আছে, যেন ইন্দ্র টের না পায় তার জেগে থাকা। টের না পায় মিতালির এই একান্ত গোপনীয় চিন্তার জগতের। এখনই না আরও কিছুদিন যাক তারপর আর কোনও পথ খুঁজে না পেলে...

আরেকটা সকাল। আরেকটা লড়াই-এর শুরু। ছেলেমেয়েরা একে একে জেগে উঠছে, মিতালিও এবার বিছানা ছাড়ল। সংসারের কাজের তো শেষ নেই, যে বিলাসিতা করে আরেকটু গড়ালেও চলবে। টুয়ার স্কুল থাকে, দুটো ভাতে ভাত মুখে দিয়ে পাঠায় মেয়েটাকে। ইন্দ্র এখানে ওখানে অনেক চেষ্টা করছে, কিন্তু কোনও কাজই পাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে মিতালিই আজকাল অনুষ্ঠান বাড়িতে কাজ করতে যায়। আজও একবার বিধুকাকুর সঙ্গে সেইরকম একটা বাড়িতে কথা বলতে যাওয়ার কথা। এ গ্রামেরই একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ বিধবাদের জন্য আলাদা রান্নাবান্না আর তাদের আদর আপ্যায়ন করার জন্য ব্রাহ্মণ বাড়ির মহিলা চাই। পাড়ায় খবরটা শুনেই বিধুকাকুকে নিজের ইচ্ছের কথাটা জানিয়েছিল। কাকু আজকাল আর বাধা দেন না। সব শুনে বলেছিলেন, "ঠিক আছে মা, ও বাড়ির কর্তার সঙ্গে কথা বলে দেখি, উনি রাজি থাকলে তোমাকে নিয়ে যাব।" তা গত পরশু টুয়ার হাতে খবর পাঠিয়েছিলেন, আজ দুপুরের দিকে ও বাড়িতে কথা বলতে নিয়ে যাবে। মিতালি সে কথা একদম ভুলে গিয়েছিল। দ্রুত হাতে বাড়ির কাজকর্ম রান্নাবান্না সেরে, নিজে স্নান করে পাটভাঙা একটা গোলাপি রঙের তাঁতের শাড়ি পরে তৈরি হয়ে বসে রইল। ইন্দ্রও স্নান সেরে নিয়েছিল সকাল সকাল। ছেলেটাকে পড়াচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে মিতালি বলে উঠল, "বাবুনকে তো স্কুলে দিতে হবে, কিন্তু এদিকে তো তেমন নার্সারি স্কুল নেই, ও কি পারবে এই প্রাইমারি স্কুলে?" ইন্দ্র ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "ভেবো না, পাশের গ্রামে একটা ভালো স্কুল আছে, ওখানেই আর কটা মাস পরে ওকে দিয়ে দেব। আমি নিজেই নিয়ে আসা দিয়ে আসার দায়িত্ব নেব। তবে কি জানো মাসে মাসে ভালোই খরচা পড়বে।" খরচার কথা শুনে মিতালিও দমে গেল। চুপচাপ পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল কিছুক্ষণ।

বিধুকাকুর সঙ্গে ও বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে এল মুখে যুদ্ধজয়ের আনন্দ। বাড়ির গৃহিনী দরাজ হাতের মহিলা। সব থেকে বড়ো কথা মিতালির লক্ষ্মীশ্রী রূপ ওঁর খুবই পছন্দ হয়েছে। ডেকে ডেকে পাঁচজনকে বললেন, "এ হল আমাদের সাধন অধিকারীর ছেলের বউ। শহরের মেয়ে, স্বামীর ব্যবসা ফেল হতে দেখো, কেমন আমাদের এই পাড়াগাঁতে মানিয়ে নিয়েছে। শুধুই কি মানিয়ে নেওয়া মা! পুরুষ মানুষের মতো বুক দিয়ে সংসারটাকে আগলে রেখেছে।" সরবতের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে এই সব প্রশংসা শুনে মিতালির মুখটা লজ্জায় বুকের কাছে ঝুঁকে এসেছিল। এমনিতেই মিতভাষী সে, গিন্নীমাকে বলতেও পারছিল না, কী-ই বা এমন করছে সে? নিজের স্বামী-পুত্র-কন্যার জন্যই তো করছে, এ আর এমন কি মহৎ কাজ! পথ চলতে চলতে বিধুকাকু মুখ খুললেন, "হ্যাঁ গো মা জননী, কাজ বুঝে নিয়েছো তো? আর পাওনা গণ্ডার কথা বলে কয়ে নিয়েছ তো? গেল বার তো সামন্তদের বাড়ি থেকে সারাদিন খাটিয়ে মাত্র তিনশো টাকা ধরিয়ে দিয়েছিল।" মিতালি হাসতে হাসতে বলল, "না কাকু, এঁরা তেমন মানুষ নন। কাজ বলতে জনা কুড়ি মহিলার রান্না। আর মিষ্টিটা, শরবৎটা এগিয়ে দেওয়া। হাজার খানেক টাকা আর নতুন একটা শাড়ি দেবে বলেছেন। আর ছেলে মেয়ে দুটোকে দুপুরে খেতে বলেছেন।" আশ্বস্ত হয়ে মাথা নাড়লেন বিধুকাকু, "তা ভালো।"

বিধুকাকু এবার ছেলেমেয়েদের খোঁজ খবর নিলেন। তারপর হঠাৎই যেন কী মনে পড়ে গিয়েছে এমন ভাবে বললেন, "ওই যা। দেখেছ, এটা তো তোমাকে দিতেই ভুলে যাচ্ছিলাম।" সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই মিতালি দেখতে পেল, কাকু কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে রবিবারের পেপারটা বের করে দিচ্ছেন। তিনি জানেন, মিতালির খুব গল্প পড়ার অভ্যেস। তাই নিজেদের পড়া হয়ে গেলে পেপারটা মিতালিকে দিয়ে যান। মিতালির হাতে পেপারটা দিয়ে দ্রুত নিজের পথে এগিয়ে গেলেন উপকারি মানুষটা। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের পথ ধরল মিতালি। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই একরাশ চিন্তা ভর করে এল। ইন্দ্রর যা আক্কেল, ছেলেটা হয়তো ভরদুপুরে ভাত না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে দেখল, ইন্দ্র বাবুনকে কোলে বসিয়ে ভাত মেখে খাইয়ে দিচ্ছে, আর বাবুন কী খুশি! ওর মুখের খিলখিল হাসি শুনে মিতালির চোখ ভিজে গেল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে, সব কাজ গুছিয়ে শুতে শুতে বেলা গড়িয়ে এল। এই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়লে আর দেখতে হবে না। তার থেকে বাসি পেপারখানা খুলে

বসল মিতালি। ইন্দ্র একবার ঘুম চোখে ওকে দেখে বিড়বিড় করে উঠল, "কাগজটা বন্ধ করে একটু শুয়ে পড়ো না। সকাল থেকে পরিশ্রম তো কম হল না।" মিতালি মুচকি হেসে পেপারখানা চোখের সামনে মেলে ধরল। আতিপাতি করে বিজ্ঞাপনের কলামগুলোতে চোখ বোলাচ্ছিল। এই তো, পেয়েছে। এই নিয়ে পরপর তিন সপ্তাহ বেরিয়েছে বিজ্ঞাপনটা। প্রতিবারই চোখে পড়েছে মিতালির, কিন্তু ভয়ে সংকোচে ফোন নাম্বারটা টুকে রাখেনি। পেপার পড়া হয়ে গেলেই টুয়ার হাতে কাকুর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। আজ কী মনে হতে নিঃশব্দে চোরের মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, খুব গোপনে রান্নাঘরে ঝোলানো বহু বছরের পুরোনো ক্যালেন্ডারের পিছনে বাবুনের পেন্সিল দিয়ে নম্বরটা লিখে রাখল। তারপর ধীর পায়ে শোওয়ার ঘরে ফিরে এল। ইন্দ্রর ঘুম ততক্ষণে ভেঙে গিয়েছে। অবাক চোখে মিতালিকে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল, "কী হয়েছে মিতা? তোমার চোখ মুখ অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?" "কই না তো! ঘুম চোখে তুমি কী দেখতে কী দেখেছ। সব সময় এই অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকলে দিনে দুপুরেও তারা দেখবে। সাইকেলটা তো সারিয়ে আনলে। আজ বরং বিকেলে বাবুনকে নিয়ে লালদিঘির পাড় থেকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। আর টুয়া কদিন ধরে চপ খাবে বলে বায়না ধরেছে, ফেরার সময় চপ কিনে নিয়ে এসো তো।" কথা কটা বলে দ্রুত ইন্দ্রনীলের সামনে থেকে সরে গেল ও।

স্কুল থেকে ফিরে টুয়াও জেদ ধরে বসল, সেও বাপির সঙ্গে যাবে। অতএব দু ভাইবোনকে নিয়ে ইন্দ্র বেরিয়ে গেল লালদিঘির উদ্দেশ্যে। রাত্রের রান্না দুপুরেই সেরে রাখে মিতালি, তাই এবেলা খুব একটা কাজ থাকে না। আর তার ছেলেমেয়েগুলো খুব লক্ষ্মী। মিতালি যাই ধরে দেয়, সোনা মুখ করে খেয়ে নেয়। প্রথম প্রথম বাবুনটা তাও 'এটা খাবো, ওটা খাবো' বলে বায়না করত। কিন্তু টুয়া ওকে কী বুঝিয়েছে কে জানে, খেতে কষ্ট হলেও খেয়ে নেয় চুপটি করে। এসব দেখে মিতালির চোখ বরাবরের মতো ভিজে যায়। অথচ নিষ্পাপ শিশুগুলোর তো কোনও দোষ ছিল না, অথচ ইন্দ্রর ক্রমবর্ধমান উচ্চাশার জন্যই আজ সংসার সর্বনাশের কালো ছায়ায় ঢেকে গিয়েছে। হাতের সঞ্চয় শেষ হয়ে আসছে দ্রুত, আর দুটো মাস পরে যে কী হবে কে জানে! ইন্দ্র তো এখনও কিছুই জোগাড় করে উঠতে পারল না। এসব ভাবতে ভাবতেই দুপুরের না পড়া খবরের কাগজটা খুলে বসল মিতালি, আর চোখে পড়লো সেই বিজ্ঞাপনটা। বিকেলের মরা আলোয় কেমন ধকধক করে জ্বলছে। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে চোখ সরিয়ে নিল মিতালি। ওর চোখ যেন পুড়ে যাচ্ছিল। তবে কি ওই বিজ্ঞাপনের কটা লাইনই বাঁচাতে পরে ওর ধ্বসে পড়া সংসারটা? আর ভাবতে পারছে না মিতালি। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল। বুক-

গলা এক নদী তৃষ্ণায় শুকিয়ে উঠেছে। দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে সে ঢকঢক করে জল খেল। মুখের উপর উঁচু করে ধরা জগ থেকে জল গড়িয়ে নামছে ওর গলায়, ভিজে যাচ্ছে বুক-গলা, তবু জ্বালাটা কিছুতেই কমছে না।

(চার)

সদর দরজা খোলার আওয়াজে ঘোর থেকে জেগে উঠল ইন্দ্র। এতক্ষণ সে রুগ্ন ছেলের মাথায় হাত বোলাচ্ছিল, এছাড়া আর কী-ই বা পারে একজন ব্যর্থ পিতা! মিতালি মনে হয় রান্নাঘরে টুকটাক কিছু কাজ সারছিল। মেয়েটা মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কদিন যা গেল! ওরা কল্পনা করতে পারেনি যমের হাত থেকে শেষ পর্যন্ত ছেলেটাকে ফেরত আনতে পারবে বলে। দিন কয়েকের ভাইরাল ফিভার যে এমন মারাত্মক দিকে টার্ন নেবে ইন্দ্র নিজেও ভাবতে পারেনি। কমন কিছু এন্টিবায়োটিকের ওপর নির্ভর করেই প্রথম কটা দিন চলছিল। তারপর এমন বাড়াবাড়ি হল যে, নার্সিংহোমে দিতে হল। ভাগ্যিস, শেষ সম্বল বলতে মিতালির কাছে একটা সোনার হার ছিল। শত অভাবেও ওটা টুয়ার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছিল। ওটা বিক্রি করেই চিকিৎসা সম্ভব হল।

বাবুনের অসুখের সময় মিতালিকে নতুন করে চিনল যেন। এমন সর্বংসহা মাতৃমূর্তি, স্থিতধী এক মুখ, কিন্তু কাছে গেলেই প্রবল আগুনের হল্কা। কিছুটা যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল ইন্দ্র নিজেও। এই কটা দিন একটাও কথা বলেনি মিতালি। দুজনের যা কিছু কথা হয়েছে, টুয়াকে মধ্যস্থতা করে। তার চিন্তার জাল ছিন্ন হল। দরজা খোলার আওয়াজ আগেই পেয়েছিল। বিধুকাকু গলা খাঁকারি দিতে দিতে ঘরে এলেন। ব্যাগ থেকে ধীরে ধীরে বের করে আনলেন আঙুর, আপেল আর বড়ো একটা হরলিক্স। একথা-সেকথার পর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের কতটা চাল আছে, জানো কিছু ইন্দ্র? তোমার কাকীমা বলছিল, কিছুটা চাল দিয়ে যেতে।" মিতালি, বিধুকাকু এসেছে টের পেয়েই ওদের দুজনের জন্য চা নিয়ে ঢুকল। কাকুর কথাগুলো ওর কানেও গিয়েছে। ও খুব ভালো করেই জানে, আসার পর অনেকটা চাল কাকু যেমন নিজের ইচ্ছেতেই দিয়েছিলেন, এবারও দিতে চাইছেন। কাকীমা মোটেই চান না, এভাবে কাকু দানছত্র করে বেড়ান। সেবার অন্নপ্রাশন বাড়ি থেকে পাওয়া তাঁতের শাড়িটা কাকীমাকে দিয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিল মিতালি। কাকীমা শাড়িখানা আগ্রহ ভরেই নিয়েছিলেন। আর তারপর বাঁকা

কথা বলতে ছাড়েননি, “জানো বৌমা, তোমার কাকুকে ভালোমানুষ পেয়ে যে যা পাচ্ছে লুটেপুটে খাচ্ছে। আমার হয়েছে যত জ্বালা। মরলে আমার হাড় জুড়োয়।”

সেই কথা শুনে প্লেটের মিষ্টিগুলো এত তেতো হয়ে গিয়েছিল মিতালির কাছে, যে এখনও সেই স্বাদ ওর জিহ্বায় লেগে আছে। ও ঘরে আসতেই ইন্দ্র আত্মসমপর্ণ করল, “আসলে কাকু, ওই চাল-টাল তো ওর ডিপার্টমেন্ট, আমি ঠিক জানি না কতটা কী আছে।” বিধুকাকু মাথা নাড়েন, “তা বটে, তা বটে।” মিতালি চা এগিয়ে দিতে দিতে বলে, “আর কত দেবেন কাকু? এভাবে আর কত দিন চলবে? ও যদি কিছু কাজ না করে?” ইন্দ্র অধোবদন হয়ে যায়। হাজার হোক কাকু বাইরের লোক। আর সে কি চেষ্টা করছে না? এক জায়গায় তো কাজ ফাইনাল হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু একজন তাকে চিনতে পারে। ইন্টারভিউ দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় লোকটি চিৎকার করে বলে, “অমুক চিটফান্ডের এই দালালটা এখানে কেন?” সে এক কেলেংকারি! কোনও রকমে পালিয়ে বাঁচে সেদিন ইন্দ্র। তারপর থেকে লজ্জায় ভয়ে আর শহরমুখোই হয়নি। এসব কথা মিতালিকেও বলা যায় না। আর ভদ্র ঘরের ছেলে একশ দিনের কাজে নিশ্চয় মাটি কোপাতে যেতে পারবে না সে। তবু মিতালি আজকাল কারণে অকারণে তাকে খোঁচা দিয়ে কথা বলবেই।

বিধুকাকু চলে যাওয়ার পর ইন্দ্রর মুখোমুখি হল মিতালি। একটু আগেই ও গা ধুয়েছে, টানটান করে চুল বেঁধেছে। রাত্রের দিকে শাড়ি ছেড়ে ম্যাক্সি পরে ও। আজও পরনে একটা জংলা প্রিন্টের ম্যাক্সি। ভিতরের ঘরে টুয়া-বাবুন পড়ছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখল বৌকে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে রোগা হয়ে গিয়েছে একটু, যদিও তাতে লাবণ্য-দিঘিতে ভাটা পড়েনি। ওর শ্যামলা চিকন মুখখানির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ ইন্দ্র। খুব ইচ্ছে করছিল, ওর ঠোঁট জোড়া নিজের ঠোঁটের মধ্যে তুলে নিতে। কতকাল এই নারীর থেকে সে বিচ্ছিন্ন যেন, কতকাল! ঘোর ভাঙল মিতালির কথায়। “ইন্দ্র আমার মনে হয় তোমার পক্ষে কিছু জোগাড় করা সম্ভব হবে না আর। আমি যদি কাজ নিয়ে কিছুদিনের জন্য দূরে চলে যাই, পারবে না তুমি সংসারটা আগলে রাখতে?”

এ কী কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাচ্ছে তাকে মিতালি? এর থেকে অতল খাদে ঠেলে ফেলে দিলেও তো পারত। কোনওক্রমে গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, “কোথায় যাবে তুমি আমাকে ছেড়ে? কাজ! কী কাজ পাবে তুমি?” মিতালিকে জড়িয়ে ধরে ফুঁফিয়ে কাঁদতে শুরু করল ইন্দ্র, “প্লিজ আমাকে ছেড়ে কোথাও যেও না, কোথাও না।” ওর পেষণে দমবন্ধ হয়ে আসছিল মিতালির। কোনওক্রমে নিজেকে ইন্দ্রর বাহুবন্ধন থেকে

ছাড়াল সে। স্বামীকে চেয়ারের উপর বসিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল, "হ্যাঁ, কাজ ইন্দ্র, অনেক টাকা, অনেক অনেক টাকা। সেই টাকায় তুমি নতুন করে ব্যবসা শুরু করবে। আমার বাবুন-টুয়া খেয়ে পরে বাঁচবে। অসুখ করলে আমাদের হেজেপচে মরতে হবে না।" প্রায়ান্ধকার বারান্দায় বসে বৃষ্টির একটানা ঐকতান শুনতে শুনতে মিতালিকে হঠাৎ কেমন রহস্যময়ী মনে হল ইন্দ্রর। কৌতূহল দমন করতে না পেরে, সেও ততোধিক ফিসফিসে স্বরে বলে উঠল, "কিন্তু কাজটা কী?" "চুপ, একদম চুপ। কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। পরে বলব সব তোমায়।"

সেই রাত্রে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে তাদের লালদিঘি গ্রামটা বৃষ্টির কলতানে ডুবে গেলে মিতালি অভিসারিকার মতো ইন্দ্রর বিছানায় উঠে এল। নিজেকে উজাড় করে দিতে দিতে সেই বিজ্ঞাপনের কথাটা ইন্দ্রকে বলল। মুহূর্তে শিথিল হয়ে গেল ইন্দ্র। মিতালির নগ্ন দেহের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে যাচ্ছিল। কিন্তু মিতালি এক মরণ বাঁধনে ওকে আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। ইন্দ্রর মুখ থেকে গোঙানির মতো আওয়াজ আসছিল শুধু, "না মিতা। এ হতে পারে না।" "কেন পারে না ইন্দ্র? তুমি কি চাও বাবুন-টুয়া না খেতে পেয়ে, না চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে তিলে তিলে মরে যাক? তুমি পারবে ওই শিশু দুটিকে নিজের হাতে দাহ করে আসতে?" ইন্দ্রর কাঁধ ধরে ওকে ঝাঁকায় মিতালি, "বলো পারবে?" একদম ভেঙে পড়ে ইন্দ্র। মিতালিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থেকে পুরো রাতটা কাটিয়ে দেয়।

দিনের আলোয় মিতালির মুখের দিকে তাকাতে পারে না ইন্দ্র। মিতালিও এ ব্যপারে আর কথা বলে না। দুপুরে ইন্দ্র নিজে থেকেই বলল, "মিতা ফোন করে দেখতে পারো একবার। যদি সব দিক পোষায়, আমার আপত্তি নেই।" মিতালি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই কপালে ভাঁজ পড়ে ওর। বেশ ক মাস হয়ে গেল। এখন ফোন করলে কী কাজ হবে আর! ওরা নিশ্চয় এর মধ্যে কাউকে পেয়ে গিয়েছে ঠিক। তবু ওর মোবাইল সেটটা বার করে অল্প সময় চার্জে বসাল। এখনকার জীবনে মোবাইল ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। আর বিলাসিতা করার পয়সাও নেই তাদের। ভাগ্যিস এই সিমটা লাইফ টাইম, তাই এখনও বেঁচেবর্তে আছে। ক্যালেন্ডার উলটে নম্বরটা মিলিয়ে ডায়াল করল। রিং হয়ে যাচ্ছে। কেউ ধরল না। এক সময় কেটে গেল। স্বামী-স্ত্রী কতক্ষণ চুপ করে বসেছিল ঠিক নেই, হঠাৎ দেখে সাইলেন্ট মোডে রাখা মোবাইলটা কেঁপে উঠেছে। ধরবে, কী ধরবে না, ভাবছিল মিতালি, ইন্দ্রই চোখের ইশারায় ওকে সাহস জোগাল। রিসিভ করতে ওপ্রান্ত থেকে এক স্মার্ট মহিলাকণ্ঠ বলে উঠল, "হ্যালো, পলা রয় বলছি।"
"হ্যালো, আমি, আমি একটা বিজ্ঞাপন থেকে এই নম্বরটা পেয়েছি।"

“ও ইয়েস, বুঝতে পেরেছি, আপনিই কি ক্যান্ডিডেট? কিডস আছে তো আপনার?”
মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল মিতালি।
ওপ্রান্ত থেকে পলা রয় বলে উঠলেন, “দ্যাটস গুড। শুনুন এ সমস্ত কথা তো ফোনে হয় না, আপনি কাইন্ডলি আমার গল্ফগ্রিনের ফ্ল্যাটের এড্রেসটা নোট করুন। যে কোনও দিন হাজব্যান্ডকে নিয়ে চলে আসতে পারেন, শুধু আসার আগে গিভ মি আ কল।”

অনেকক্ষণ আগে মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ইন্দ্র আর মিতালি দুজনেই পাথরের মতো বসে ছিল। টুয়া স্কুল থেকে ফিরল লাফাতে লাফাতে। ওদের ইউনিট টেস্টের খাতা বেরিয়েছে, ম্যাথসে আর সায়েন্সে ও হায়েস্ট পেয়েছে। মিতালি বুকে জড়িয়ে ধরল মেয়েকে।

(পাঁচ)

প্লেনটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওড়ার মুহূর্তে মেয়েটা কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছিল। উত্তেজনায় পাশে বসা পলা রয়ের হাতটা খিমচে ধরে ছিল। এখনও পলার হাতটা জ্বালা জ্বালা করছে। ভালো করে মেয়েটার দিকে তাকাল একবার। বেশ সুশ্রী, মুখখানা ঘিরে একটা শ্যামলবিভা। এক ঢাল চুল আলগা খোঁপা করা, পরনে তারই কিনে দেওয়া সুতির পাটিয়ালা-কুর্তি। পলাই জোর করে ওর জন্য কিছু সালোয়ার কামিজ, নাইটি কিনে দিয়েছিল। এই লম্বা জার্নির জন্য ঢিলাঢালা সুতির পোশাকই আদর্শ। মিতালি এবার চোখ খুলল। পলার দিকে চোখ পড়তে খুব কষ্ট করে একটু হাসল। পলা ওর হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে খুব নরম গলায় বলল, “ছেলেমেয়ের জন্য খুব মনখারাপ করছে, তাই না? দেখবে আস্তে আস্তে কটা মাস কেমন কেটে যাবে। তখন আবার ওখানে থেকে ফিরতে মন চাইবে না।” মিতালি কিছু না বলে, উইন্ডো দিয়ে মেঘের ভেলা দেখতে থাকে। মেঘেদের রাজ্যে তারা এখন উড়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য যদি ছেলেমেয়ে দুটো দেখত, খুশিতে পাগল হয়ে যেত। পলা সেদিকে লক্ষ রেখে বলল, “জানো দু-দুবার আমি কনসিভ করেছিলাম। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই... আসলে আমার ইউটেরাসের কিছু গঠনগত ত্রুটি আছে। তাই দুজনে এই ডিসিশন নিলাম। আমরা দুজনই বাচ্চা খুব ভালোবাসি।”

বিমানসেবিকা দুটি সুদৃশ্য প্লাস্টিকের গ্লাসে দুজনের জন্য কোক রেখে গেল। মিতালি আগেই শুনেছিল এসব কথা। পলাদি মাস চারেক ধরে শুধুমাত্র এই ব্যাপারের জন্যই দেশে রয়ে গিয়েছিলেন। অজস্র মহিলার সঙ্গে কথা হয়েছে। মোটা টাকার এমাউন্টের প্রতিশ্রুতিতেও কেউ নিজের সংসার ছেড়ে আমেরিকায় যেতে চায়নি। এই প্রসঙ্গে একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনেছিল সে পলাদির মুখেই। এক ভদ্রলোক একদিন দেখা করতে এসেছিলেন কমবয়সি একটি মেয়েকে নিয়ে। জানিয়েছিলেন, মেয়েটি তার ভাগ্নী। সম্প্রতি স্বামী মারা গিয়েছে এবং তার একটি ছোটো বাচ্চাও আছে। সে যেতে রাজি। পলা তো হাতে চাঁদ পায়। সব কথা প্রায় ফাইনাল যখন, তখন ভদ্রলোকের ফোনে একটা কল আসতে তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য ব্যালকনিতে সরে গেলে, মেয়েটি জানায়, সে কুমারী মেয়ে এবং বাবা-মা কেউ নেই। ওই মামার সংসারে গলগ্রহ সে। সারোগেসির নিয়ম অনুযায়ী সারোগেট মাদারের অবশ্যই নিজের বাচ্চা থাকতে হবে। পলা বহু কষ্টে সেই চিটিংবাজ ভদ্রলোককে ঘাড় থেকে নামায়।

মিতালিদের সাথে আলাপ হবার পর পলা তাই নিজের দাদা বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে ওদের গ্রামের বাড়ি ঘুরে সব নিজের চোখে দেখে এসেছে। মাঝের বেশ কিছু সময় মিতালির পাসপোর্ট, ভিসা, চেক আপ, কয়েকটা টেস্ট আর মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স ইত্যাদি প্রসিডিওরের জন্য কেটে গিয়েছে। এবার ভালোয় ভালোয় সবকিছু শুরু হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে সে। মিতালি এখন ব্যাক সিটে মাথা রেখে ঘুমচ্ছে, পলাও ইয়ারফোন গুঁজে মিউজিক শুনতে লাগল।

বাড়ি ছেড়ে কতদিন যে সে এভাবে উড়ছে মনে করতে পারছে না মিতালি। ঘুম ভেঙে দেখল, প্রায় অন্ধকার পরিবেশে সবাই কেমন ঘুমোচ্ছে। উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল, ঘুটঘুটে অন্ধকার। অথচ তার রিস্টওয়াচ জানান দিচ্ছে, এখন সকাল ছটা। ঘুমের আবেশটা কেটে যেতে বুঝতে পারল, সে আসলে অন্য একটা টাইম জোনে ঢুকে পড়েছে। বাড়ি থেকে বহু দূরে। ছেলেমেয়ে দুটো কেমন আছে? টুয়া কি কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ফুলিয়ে ফেলেছে? বাবুন? তাকে বলা হয়েছিল, মা কলকাতা যাচ্ছে, তার জন্য অনেক খেলনা নিয়ে আসবে। কিন্তু এখন নিশ্চয় সে মিতালিকে খুঁজছে? আর ইন্দ্র? ওর শুকনো মুখটা চোখের পর্দায় ভেসে উঠতেই বুকের মধ্যে মোচড় দিল মিতালির। ও কি পারবে রান্নাবান্না করে সবকিছু সামলাতে? বিধুকাকুরা জানে, মিতালি বম্বে যাচ্ছে বছরখানেকের জন্য একটা বাড়িতে কাজ নিয়ে। সংসারের যা হাল, এই অবস্থায় কেউ কোনও প্রশ্ন তোলেনি। শুধু আসার আগের রাত্রে ইন্দ্র দোষারোপ করছিল নিজেকে, বারবার বলছিল, “মানুষ কতটা অসহায় হলে এমন অচেনা অজানার মাঝে নিজের বউকে ছেড়ে দেয়।”

ওর ঠোঁটে তর্জনি ঠেকিয়ে ওকে নিরস্ত করেছিল মিতালি। শুধু বলেছিল, "তোমার অ্যাকাউন্টে যে দু লাখ টাকাটা পলাদি অ্যাডভান্স হিসেবে দিলেন, ওটা দিয়ে কিছু একটা শুরু করো। আর প্রতি মাসে তো পলাদি আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন। তার থেকে খরচ কোরো। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। চোখের পলকে কেটে যাবে এই কটা মাস।" প্রতি মাসে মাসে পলদি বলেছেন, "কুড়ি হাজার করে দেবেন, পলাদিদের কাছে এটা সামান্য টাকা, কিন্তু মিতালিদের কাছে অনেক।" আর সবকিছু ভালোয় ভালোয় মিটলে আরও পাঁচ লাখ টাকা। এত টাকা পেলে মিতালিদের আর পিছু ফিরে তাকাতে হবে না। সমস্ত দুর্ভাগ্যের মেঘ উড়ে গিয়ে ওদের সংসারটা ঝলমল করে উঠবে। আসন্ন স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল মিতালি।

কাস্টমসের বেড়া পার হয়ে শিকাগো ইন্টারন্যাশনাল এয়ার্পোটের বাইরে যখন এল ওরা, মিতালির চোখে ঘোর লেগে গেল। চারিদিকে সোনালি গাছগুলো সূর্যের আলো মেখে ঝলমল করছে। অদ্ভুত সুন্দর সে দৃশ্য আর মাথার ওপরে মেঘমুখ ঝকঝকে নীল আকাশ। পলার চোখ এড়াল না মিতালির মুগ্ধতা। পলা বলল, "একে বলে ফল সিজন, আর কিছুদিন পরে দেখবে, সব পাতা কেমন ঝরে যায়, গাছগুলো তখন একদম শ্রীহীন শূন্য হয়ে যায়।" তারপর কী ভেবে যেন বলল, "মিতালি, যে কোনও শূন্যতাই কেমন শ্রীহীন, তাই না?" মিতালি ঘাড় ঘুরিয়ে পলাদিকে দেখল কয়েক পলক। ওর চোখে তীব্র ব্যথার ছায়া। মিতালিদের জন্য নির্দিষ্ট ক্যাবটি অপেক্ষা করছিল। পলাদিই এয়ারপোর্ট থেকে বুকিং করে নিয়েছিল। মিতালি ভেবেছিল, পলাদির হাজব্যান্ড বুঝি রিসিভ করতে আসবেন। কৌতূহলী হয়ে সে কথা শুধিয়েও ফেলেছিল। পলাদি ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে, "তমোঘ্ন! দূর, সে এখন বার্সিলোনাতে একটা সেমিনারে গেছে, আর সে যা ব্যস্ত, থাকলেও আসত না।" মিতালি কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গিয়েছিল। পলাদির কাছেই শুনেছে তমোঘ্নদা মস্ত বড়ো বিজ্ঞানী আর পলাদি আইটি সেক্টরে কাজ করে। দুজনেই চরম ব্যস্ত।

চলমান ক্যাব থেকে চারিপাশে ছড়িয়ে থাকা টুকরো টুকরো নিসর্গ দেখতে দেখতে মিতালির চোখের মণিতে ঘোর লেগে যাচ্ছিল। ভুলে যাচ্ছিল সে ফেলে আসা সংসারের কথা। টুয়া, বাবুন, ইন্দ্রর কথা। কিছুক্ষণ পরে সম্বিত ফিরতে মনে হল, এখানে প্রকৃতি এত মোহময় বলেই কি দেশ ছাড়া মানুষগুলো আত্মীয় পরিজন ছেড়ে এভাবে বিভুঁইয়ের নেশায় মেতে থাকে? আর দেশে গেলে শুধু বাতাসে পলিউশন খোঁজে আর জলে আর্সেনিক? চেনাজানা অনেককে তো দেখেছে দেশে সেটল করবে ভেবেও আবার

ফিরে আসে? তবে কি এখানকার কুহকিনী বাতাস একবার যাকে সম্মোহিত করে, তার আর ফেরার পথ নেই? নিজের অজান্তেই ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

পলাদি ওকে ঠেলল, "এই মেয়ে, কী এত ভাবছ? আমরা এসে গেছি।" ঘোর ভেঙে জেগে উঠে দেখল মিতালি, ল্যান্ডস্কেপের মতো সুন্দর একটা বাড়ির সামনে তাদের ক্যাব এসে দাঁড়িয়েছে। এক পলকেই দোতলা বাড়িটা আর সামনের কমলা পাতায় ঢাকা মেপল গাছটা খুব ভালো লেগে গেল মিতালির।

(ছয়)

এই কদিনেই নতুন জায়গায় বেশ মানিয়ে নিয়েছে মিতালি। প্রথম কদিন দিনের বেলায় অঘোরে ঘুমিয়েছে আর রাত্রে জেগে কাটিয়েছে। পলাদি বলছিল, "বায়োলজিক্যাল ক্লকের জন্য টাইম জোন পরিবর্তন হলে এমনটা সকলের হয়।"

তমোঘ্নদাও এর মধ্যে বার্সিলোনা থেকে ফিরে এসেছে। মিতালির সঙ্গে পলাদি আলাপ করিয়ে দিতে, শুধু তাকিয়ে হেসেছিল, কথা-টথা তেমন বলেনি। একদিনই শুধু বলেছিল, "মিতালি, তুমি মোচা রাঁধতে পারো?" মিতালি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতে, সেদিনই একটা আস্ত মোচা হাজির করেছিল। সঙ্গে ড্রাই কোকোনাট ফ্লেক্স। জম্পেশ করে রেঁধেছিল, সে নারকেল কোরা দিয়ে মোচা। দুজনেই খেয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আজকাল দিনের বেলায় মিতালিই রান্নাটা সেরে রাখে। পলাদি ভীষণ আপত্তি জানিয়েছিল, "না, না, এটা ঠিক হচ্ছে না। ইস এইসব করানোর জন্য তোমাকে আনা হয়েছে নাকি!" মিতালি কোনও আপত্তি শোনেনি। বলেছিল, "তার মানে, তুমি আমাকে নিজের বোন ভাবো না, তাই তো? আর আমি বুঝি নিজের বাড়িতে কাজ করতাম না?" পলাও আর কিছু বলেনি। শুধু বলেছিল, "এখন যা খুশি করে নাও। এরপর কিন্তু সম্পূর্ণ বেড রেস্টে থাকতে হবে। তখন আমার পারমিশান ছাড়া কুটোটিও নাড়বে না।" এই সমস্ত কথাই তমোঘ্নদার সামনে হচ্ছিল। মিতালি আড় চোখে তাকিয়ে দেখছিল, তমোঘ্নদা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই মিতালির শরীরটা কেমন শিরশির করে উঠল। আর কদিন পরে এরই সন্তান গর্ভে ধারণ করতে হবে।

তারপর কটা দিন ব্যস্ততার সঙ্গে কেটে গিয়েছে বারবার ক্লিনিকে গিয়ে। প্রথমবার ওদের তিনজনের সঙ্গেই একটা সিটিং-এ কাউন্সেলার সমস্ত প্রসেসটা বোঝাচ্ছিলেন। যেহেতু ডোনারের কাছ থেকে ওভাম বা স্পার্ম নিতে হচ্ছে না, শুধু মাত্র

পলার ইউটেরাসের ত্রুটির জন্য সে সন্তানসম্ভবা হলেও এমব্রায়ো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই একজন ধারক মাতার দরকার। সেই অর্থে যে বাচ্চাটি জন্মাবে, তার বায়োলজিক্যাল বাবা-মা তমোঘ্ন আর পলাই থাকবে। এত কিছু বোঝে না মিতালি। তবু অদ্ভুত লাগছিল তার, যে সন্তানকে তিলে তিলে গর্ভগৃহে বড়ো করে তুলবে, তার নাকি মা, সে না! নেক্সট সিটিং-এ এক্সপার্ট গায়নোকলজিস্ট বোঝাচ্ছিলেন, সমস্ত প্রসেসটা পাঁচটা ধাপে হয়। প্রথমে ফলিকল ডেভলপমেন্ট, তারপর উসাইট অথাৎ ডিম্বাণু সংগ্রহ, পরের ধাপে উসাইট কালচার করা হয় এবং ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ঘটানো হয়। এবং তারপর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল চতুর্থ ধাপ, যেখানে সারোগেট মাদারের শরীরে এমব্রায়োটি ট্রান্সফার করা হয়। তারপর সমস্ত ব্যবস্থাটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে রাখা হয়। পলার কাছে শুনেছে, সামনের মাসেই পলার শরীর থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হবে।

পলাদির জন্য খুব কষ্ট হয় মিতালির। একটা বাচ্চার জন্য কী পাগল! অকাতরে ডলার খরচ করছে তারা। আর তাদের গরিব দেশে নিঃসহায় ভিখারিণীর কোলেকাঁখেও শিশু খেলা করে। ঈশ্বর যে কোথাও কোথাও কেন এত কৃপণ, ভেবে পায় না সে। আজও মনের খুশিতে রাত্রের রান্না সেরে রাখছিল সে। পলাদিরা কাঁচকলার কোফতা খেতে খুব ভালোবাসে। তাই বানাচ্ছিল সে, খুব মন দিয়ে। অনেকবার কুকারে সিটি দিয়ে তবে কাঁচকলাগুলো সিদ্ধ করা গিয়েছে। মেক্সিকো থেকে নাকি এই কলাগুলো আসে। যেমন চেহারা, তেমনই ত্যাঁদড়। কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। ঠিক এই সময়ই টের পেল দরজা খুলে যাওয়ার। ওদের দুজনের কাছেই চাবি থাকে। যে যখন আসে, নিজেরাই দরজা খুলে ঢুকে পরে। মিতালি কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, তমোঘ্নদা ফিরেছে। কেমন খটকা লাগল মিতালির। ওরা তো কেউই এত তাড়াতাড়ি ফেরে না। তমোঘ্ন সিঁড়ি বেয়ে উপরের বেডরুমের দিকে উঠে গেল। মিতালি কিচেনে এসে রান্নাটা নামিয়ে, সবকিছু গুছিয়ে বেরিয়ে এসেছে কী আসেনি, দেখছে, উপরে দাঁড়িয়ে আছে তমোঘ্ন।

বোঝাই যাচ্ছে সদ্য স্নান সেরেছে। মিতালিকে দেখেই বলল, "একটু জুস দিয়ে যেও তো।" তারপরেই আবার নিজের রুমে ঢুকে গেল। মিতালি তাড়াতাড়ি ফ্রিজ খুলে কাচের গ্লাসে অরেঞ্জ জুস ঢেলে, একটি ট্রেতে বসিয়ে, উপরে নিয়ে গেল। দরজার সামনে এসে নক করল, ভিতর থেকে তমোঘ্নদার আওয়াজ ভেসে এলো, "ভিতরে এসো।" মিতালি ভিতরে এসে বেড সাইড টেবিলটায় জুসের গ্লাসটা রেখে চলে আসছিল। তমোঘ্ন বিছানায় শুয়েছিল। হঠাৎ ডাকল, "শোনো, আমার মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, একটু ম্যাসাজ করে দেবে?" মিতালি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ও বুঝতে পারছে না, ওর কী করা উচিত! এই সব কাজের কথা তো কনট্রাক্টে ছিল না। রান্নাটা বা বাড়ির এটা-ওটা

কাজ, সে করে ঠিকই সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেতে, কিন্তু এভাবে মাথা টিপে দেওয়া! নাহ ব্যাপারটা ওর ভালো লাগছিল না মোটেই। ওদিকে তমোঘ্ন রগের দুপাশ আঙুল দিয়ে টিপে যন্ত্রণাসুচক একটা আওয়াজ করে ফেলল। মিতালি আর কিছু না ভেবে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন বুঝল, তমোঘ্নদার কিছুটা আরাম হয়েছে, চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখনই সে উঠে আসছিল, আর পলকেই কী যে হল, ঠিক করে বুঝে ওঠার আগেই নিজেকে আবিষ্কার করল তমোঘ্নর শরীরের নীচে। এক হাতে শক্ত করে মিতালির কোমর পেঁচিয়ে রেখে, আরেক হাত দিয়ে দ্রুত ওর কামিজের চেন খুলে সেটা পেট পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে তমোঘ্ন। মিতালি প্রবল বাধা দেবার চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়াতে পারছে না। কোনও ক্রমে বলল, "এ অন্যায়, আমাকে ছাড়ুন।" গর্জে ওঠে তমোঘ্ন, "কীসের অন্যায়! কদিন পরে তো আমার সন্তানকে ধারণ করতে যাচ্ছই!" মিতালি তবু যুক্তি দেবার চেষ্টা চালাচ্ছিল, 'কিন্তু সেটা তো অন্যভাবে, এভাবে কখনও নয়'। ওর সমস্ত প্রতিরোধ খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। মিতালি দেখল, তমোঘ্ন নামক শ্বাপদটা একটু একটু করে ওর শরীরের দখল নিয়ে নিল। ওর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে এক ছুটে মিতালি নিজের জন্য নির্দিষ্ট রুমটিতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ হহু করে কাঁদল। তারপর রূম লাগোয়া টয়লেটে ঢুকল ধারাস্নানে নিজেকে ক্লেদমুক্ত করতে। টয়লেট লাগোয়া আয়নায় দেখলো স্তন দুটোতে আঁচড় আর কামড়ের অজস্র চিহ্ন। হঠাৎ ওর ইন্দ্রনীলের প্রতি বিতৃষ্ণায় মন ছেয়ে গেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না। দরজা ধাক্কাধাক্কিতে চোখ কচলাতে কচলাতে দরজা খুলে দেখে, পলাদি অফিস থেকে এসে পড়েছে। ও বেরিয়ে আসতে ওকে বলে, "বাব্বা কী ঘুম রে তোর! কখন থেকে ডাকছি। আজ তো তোর তমোঘ্নদাও আগে এসে গেছে, এসে দেখি বাবু বিছানায় শুয়ে শুয়ে ল্যাপটপ হাটকাচ্ছেন আর তুই এদিকে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমচ্ছিস। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে আয়। চা বানিয়েছি।" তিনজনে একসঙ্গে চা-সিঙাড়া খেল। মিতালি মুখ নীচু করে খাচ্ছিল দেখে, পলা একবার জিজ্ঞেস করল, "কী রে, কী হল, শরীর খারাপ নাকি?" মিতালি ঘাড় নাড়ল। একবার আড়চোখে তমোঘ্নকে দেখল, নির্লিপ্ত মুখে লোকটা সিঙাড়াতে কামড় বসাচ্ছে। মিতালির সঙ্গে চোখাচোখি হতে, অল্প একটু হাসল। মিতালির হঠাৎ খুব বমি পেল। এক ছুট্টে ও টয়লেটে ঢুকে গিয়ে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল। পলা সেদিকে তাকিয়ে হতভম্বের মতো বলল, "কী হল বলো তো মেয়েটার!" তমোঘ্ন পাত্তা না দেওয়া গলায় বলল, "এসে থেকে তো দেখছি ঘুমোচ্ছে। মনে হয়, অ্যাসিড হয়ে গিয়েছে। একটা অ্যান্টাসিড খাইয়ে দাও বরং।"

ঘর অন্ধকার করে শুয়েছিল মিতালি। কিছুক্ষণ পরেই পলা ওষুধ আর জলের গ্লাস নিয়ে এল। মিতালির মাথায় হাত রেখে বলল, "ওষুধ রেখে গেলাম খেয়ে নিস। আর কী হয়েছে বলবি তোর? এত আপসেট তোকে কখনও দেখিনি। তুই তো ভীষণ সাহসী আর লড়াকু মেয়ে।" মিতালি নিজেকে আর সামলাতে পারে না, শরীরে অজস্র ব্যথা। তার থেকেও ব্যথা ওর মনে। কোনও রকমে উঠে বসে পলাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল।

(সাত)

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল মিতালির। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল। সারারাত ধরে তুষারপাত হয়েছে। বাড়ি, রাস্তা এমনকী সামনের গাছগুলোও তুষারের পরতে ঢেকে গিয়েছে। আর তার উপর সকালে প্রথম সূর্যরশ্মি ঝকঝক করছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল, সেই দৃশ্য। মনটা হঠাৎই খুব ভালো হয়ে গেল মিতালির। কাল রাত্রে বাড়িতে ফোন করেছিল। টুয়ার স্বর কেমন যেন বিষণ্ণ ছিল। আর বাবুন তো ফোনেই কান্নাকাটি শুরু করে দিল। শেষে পলাদি হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে রেখে দিল। তারপর খুব গম্ভীর মুখে বলেছিল, "চোখের জল মুছে ফেলো, মিতা। এইসময়টা টেনশন করবে না একদম।" মিতালি চোখের জল সামলেছিল ওদের সামনে। কিন্তু রাত্রে নিজের ঘরের নির্জনে আর সামলাতে পারেনি। এই মুর্হূতে প্রকৃতি যেন নিজের হাতে ওর দুঃখ মুছিয়ে দিচ্ছে, বাইরের নিসর্গ ওকে বাকরুদ্ধ করে দিল। ঠিক এই সময়ই পলাদি দুকাপ কফি নিয়ে ওর ঘরে নক করল। একটা মগ মিতালির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, সেও জানলার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল। তারপর বলল, "দেখছো মিতা, কী অপূর্ব সুন্দর এই দৃশ্য! এখান থেকে ফিরে যাওয়ার সময় অনেক কিছু তুমি নিয়ে যাবে।" আপাতনিরীহ কথা, কিন্তু আজকাল মিতালির মন মেজাজ বিক্ষিপ্ত থাকে, কথাটা শুনেই মনে হল, পলাদি কি তাহলে টাকার খোঁচাটা দিল? ভাবল, কড়া করে দু কথা শুনিয়ে দেয়। তারপরই কী মনে হতে চুপ করে গেল।

এক সময় ওর কাঁধে হাত রাখল পলা। তারপর বলল, "কাল ওভাবে বলাটা ঠিক হয়নি, আই অ্যাম সরি।" মিতালি চুপ করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। পলা আর ওকে ঘাঁটাল না। ওর রুম ছেড়ে বেরোবার সময় বলে গেল, "তৈরি হয়ে নীচে এস। ব্রেকফাস্ট করেই আমাদের বেরোতে হবে, মনে আছে তো?" এতক্ষণে মিতালির মনে পড়ল,

আজকে তো সেই ক্লিনিকে যাওয়ার কথা। তার দেহে প্রতিস্থাপিত হয়ে গিয়েছে এমব্রায়োটি, যা তমোঘ্ন আর পলার অস্তিত্ব বহনকারী। রুটিন মতো এমব্রায়ো ট্রান্সফারের দু সপ্তাহ পরে ক্লিনিকে একটা ছোট্ট টেস্ট করে কনফার্ম হওয়া। মিতালি টের পেয়েছে, তার গর্ভগৃহে সে বাড়ছে। সেই টুয়া বাবুনের আসার সময়কার অনুভূতি তার সারা শরীর জুড়ে। সকালে বিছানা ছেড়ে নামতে কেমন মাথাটা আজকাল টলে যায়, খাবারের রুচি নেই, তলপেটটা মাঝে মাঝে খিঁচে ধরছে। তবু সেদিন তমোঘ্নদা যখন খাবার টেবিলে প্রশ্ন করেছিল, "মিতালি কিছু টের পাচ্ছ? কী মনে হচ্ছে?" পলাদি সেকথা শুনে ব্যগ্র হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে। মিতালি এক ঝলক দুজনের মুখ দেখে হঠাৎই একটা নিষ্ঠুর খেলা খেলেছিল, "না তো! যেমন ছিলাম, তেমনই আছি। আমার মনে হয় তোমাদের অত ডলার বেকার গেল।" পলকে কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল পলাদির মুখ, আর তমোঘ্নদা তড়িঘড়ি দায়সারাভাবে ডিনার শেষ করে উঠে গিয়েছিল। নিষ্ঠুর আনন্দে ওর মনটা ভরে গিয়েছিল। পরে নিজের মনকে সে প্রশ্ন করেছে, কেন সে এমন করল? আজকাল মিতালি নিজেকেই ঠিকভাবে বুঝতে পারে না। নিজের চোখেই নিজে একটা প্রশ্ন চিহ্নের মতো থমকে আছে।

ক্লিনিক থেকে যখন বেরিয়ে এল, ওদের দুজনের মুখে যেন যুদ্ধজয়ের আনন্দ। মিতালির খুব ভালো লাগছিল এবং লজ্জা লজ্জাও করছিল। পার্কিং পর্যন্ত ওকে জড়িয়ে সন্তর্পণে নিয়ে এল পলাদি। ড্রাইভিং সিটে নিজে বসে, পাশে যত্ন করে মিতালিকে বসিয়ে দিল। পিছনের সিটে বসা তমোঘ্নকে উদ্দেশ্য করে বলল, "তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে নামিয়ে দিই?" "খেপেছ? এমন একটা গুড নিউজ সেলিব্রেট করতে হবে না? তার থেকে চলো, শপিং করে বাইরে কোথাও লাঞ্চ করি।" পলাদিরও কথাটা মনে ধরল। ড্রাইভিং করতে করতে পলাদি মিতালিকে ডুজ আর ডোন্ট-এর একটা লম্বা লিস্ট শোনাচ্ছিল। মিতালির মুখে মৃদু মৃদু হাসি লেগেছিল। তমোঘ্ন এক সময় বিরক্ত হয়ে বলল, "আঃ, থামো তো, এমন করছ, যেন মিতালি প্রথমবার কনসিভ করল।" পলাদি সে কথা শুনেই চটে গেল, "এই শোনো, এই সব মেয়েলি কথায় তোমায় কে নাক গলাতে বলেছে? তুমি শুনলে না, ডক্টর কী বললেন? অন্তত সামনের দুটো মাস ওকে খুব সাবধান থাকতে হবে। মুভমেন্ট যতটা সম্ভব কম করতে হবে।"

মিতালির নড়াচড়া একেবারে নজরবন্দী হয়ে গিয়েছে। পলাদি নীচের ফ্লোরে ওর থাকার ব্যবস্থা করেছে। সুন্দর সুন্দর টয়, আর বিগ বাই থেকে কেনা ল্যামিনেটেড এক রাশ বাচ্চার ছবিতে ওর ঘরটা খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে। মিতালি এমন ঘর

সিনেমার পর্দায় দেখেছে। এই বয়সে নিজেকে সিনেমার নায়িকার সঙ্গে মেলাতে ভীষণই লজ্জা করছিল। মনে মনে বলছিল, এদের আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি না। আজ দুপুরে একটু গড়াচ্ছিল, স্বপ্নে দেখল, বাবুনের শুকনো মুখ। ওদেশে কটা বাজে সে হিসেব না করেই ডায়াল করে বসল। ঘুম জড়ানো কণ্ঠ ইন্দ্রনীলের, "কী ব্যাপার, এত রাত্রে? সব খবর ঠিক আছে তো?" "হ্যাঁ, বাবুন, টুয়া ভালো আছে তো? বাবুনের জন্য মন খারাপ করছিল।" "ওরা ঘুমোচ্ছে এখন। ভালোই আছে। বাবুন মাঝে মাঝে তোমার জন্য খুব কাঁদে।" "আর তুমি? তুমি কেমন আছো? একা হাতে সব সামলাতে খুব কষ্ট হচ্ছে, না গো?" ও প্রান্তে কিছুক্ষণ নীরব থাকে ইন্দ্র। তারপর প্রশ্ন করে, "তোমার খবর?"

মিতালি নিঃশব্দে ফোন রেখে দেয়। কী যেন বলতে চেয়েও বলতে পারে না ইন্দ্রকে। অথচ আগের দুবার ইন্দ্রকে প্রথম খবরটা দেওয়ার জন্য সে কী ব্যাকুলতা!

নিজের অল্প স্ফীত পেটের উপর হাত রাখে মিতালি। অনুভব করে তার গর্ভগৃহে বেড়ে ওঠা প্রাণটার অস্তিত্ব। বাবুন, টুয়ার সঙ্গে একে তফাৎ করতে পারে না সে। হঠাৎ হু হু করে বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পরেই নিজেকে সামলে নিল। চোখের জল মুছে, পলাদির এনে দেওয়া উল কাঁটা নিয়ে বসল। শুয়ে বসে দিন কাটতে চায় না বলে, সেদিনই পলাদিকে বলেছিল, একটু উল এনে দেওয়ার কথা। এনে দিয়েছিল পলাদি। জিজ্ঞেস করেছিল পলাদি, "কী করবে গো উল নিয়ে?" "তোমার বাচ্চার জন্য টুপি, মোজা আর সোয়েটার বানিয়ে রাখব।" হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল সেকথা শুনে, "না, না আগে থেকে এসব একদম নয়। আগে বাচ্চা জন্মাক তারপর..." স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল মিতালি। মডার্ন আইটি সেক্টরে কাজ করার মেয়ের মানসিকতা দেখে। কই মিতালি তো একটা সাধারণ মেয়ে, টুয়া বাবুনের বেলায় ওরা পেটে থাকাকালীন কত কী বানিয়ে রেখেছিল। পলাদির এনে দেওয়া উল দিয়ে ওকেই একটা পুলওভার বানিয়ে দিয়েছিল। ওর হাতের কাজ চমৎকার। পলাদির সেটা খুব পছন্দ হয়েছিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলেছিল, "দেশে ফিরে তুমি একটা মেশিন কিনে প্রফেশন্যালি বুনতে শুরু কর। ভালো অর্ডার পাবে। যাওয়ার আগে আমি তোমাকে ডিজাইনের কিছু বই কিনে দেব।"

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় মিতালির। সত্যি এভাবে তো সে কোনওদিন ভেবে দেখেনি! দেশে ফিরেই একটা মেশিন কিনবে সে। তার আগে কলকাতার ভালো জায়গা থেকে একটা কোর্স করে নেবে। একদিন তমোঘ্নদা স্কাই কালারের উল এনে দিয়ে বায়না ধরল, "মিতালি আমার জন্যও কিছু একটা বানিয়ে দিও তো।" তারপর পলার কান বাঁচিয়ে বলল, "আর ক মাস পরে তো ফিরেই যাবে। অন্তত তোমার হাতের বোনা

সোয়েটার দেখে তোমার অভাব কিছুটা মেটাব।” সেই ঘটনার পর থেকে তমোঘ্নকে দেখলেই জ্বলে যেত মিতালি। তবে আজকাল ওর মুখে ক্ষমা-সুন্দর হাসি, অদ্ভুত লাবণ্যে ভরে থাকে ওর মুখ। কারোর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে ভালো লাগে না। মন দিয়ে তমোঘ্নর জন্যও বুনতে শুরু করে দিল।

(আট)

“বাপি বলো না, মা কবে আসবে? বলো না বাপি?” সেই থেকে বাবুন সমানে ঘ্যানঘ্যান করেই যাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে, ছেলেটা তত যেন অবুঝ হয়ে যাচ্ছে। টুয়াটা বাড়িতে থাকলে তবু ভাইকে সামলে রাখে। কিন্তু এই ভরদুপুরে সেও তো স্কুলে। আজকাল ইন্দ্রর খুব ক্লান্ত লাগে। একা হাতে রান্না করা, দুটো বাচ্চার দায়দায়িত্ব সামলানো। তার উপর পুজোর আগে আগেই বিধুকাকুর কথা মতো শাড়ির ব্যবসাটা শুরু করেছিল। প্রথমে ছোট্ট করে আশেপাশের স্কুল, কলেজগুলো দিয়েই শুরু করেছিল। শান্তিপুর, ধনেখালি থেকে তাঁতের শাড়ি এনেছিল। বেশ ভালো ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। দিদিমণিরা প্রায়ই ফোনে নতুন শাড়ি আনার অর্ডার দিচ্ছে। ঘুরে ঘুরে শাড়ি নিয়ে যেতে পরিশ্রম খুব। বিধুকাকু সেদিন একটা প্রস্তাব দিলেন, “আচ্ছা ইন্দ্র, তোমাদের বৈঠকখানা ঘরটা একটু সারিয়ে সুরিয়ে ছোটো করে একটা দোকান দিলে হয় না? শুধু শাড়ি নয়, গ্রামের মানুষের প্রয়োজনের জিনিসগুলো যেমন ধুতি, বিছানার চাদর এসবও রাখলে?” কথাটা মনে ধরেছিল ইন্দ্রর, তাতে বাড়িটাও সামাল দিতে পারবে। বাবুনের কথায় চিন্তাজাল ছিন্ন হল, “বাপি, বলো না, মা কবে ফিরবে? তোমার রান্না বাজে, বিশ্রী। আমি রোজ রোজ খাব না এই রান্না।” অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে ইন্দ্র। বিধুকাকু এতক্ষণ বসে বসে সব দেখছিলেন। তিনিই বললেন, “শীলা একটা কাজ খুঁজছিল, দেখি ওর সঙ্গে কথা বলে। যদি রান্নাবান্না আর ঘর সংসার গুছিয়ে রাখার দায়িত্বটা নিতে পারে, সবদিক রক্ষা হয়।”

হাতে যেন চাঁদ পায় ইন্দ্র। বিধুকাকুর উদ্দেশে বলে ওঠে, “কাকু, দেখুন না তাহলে একটু, আমি একা সব দিক পারছি না। মেয়েটি রাজি হলে খুব ভালো হয়।”

দিন দুই পরে এক সন্ধেবেলায় শীলা এল। অল্পবয়সি বিধবা। দাদা-বৌদির সংসারে গলগ্রহ হয়ে আছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখল ইন্দ্র, শরীরে যেন দু কুল ছাপানো জোয়ার। মুখখানি খুব মিষ্টি। দিন কয়েকের মধ্যেই দেখা গেল, বাবুন আর টুয়ার খুব পছন্দের মানুষ হয়ে গেল শীলা। শীলাপিসি ছাড়া তাদের এক দণ্ড চলে না। ওদের

খাওয়ানো, স্কুলের ব্যাগ গুছিয়ে দেওয়া, তৈরি করে স্কুলে পাঠানো, সবেতেই শীলা পিসিকে চাই। বাবুন তো এক একদিন বায়না করে, শীলাপিসির কাছে রাত্রে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমোবে। শীলা সে রাত্রে রয়েই যায়। ভিতরের ঘরে টুয়া আর বাবুনকে দু পাশে নিয়ে ঘুমোয় আর ইন্দ্র বাইরের বারান্দায়।

এক রবিবার ফোন করে বাচ্চাদের মুখে শীলার খবর শুনল মিতালি। একটু খারাপই লাগল। একজন রান্নার লোক রেখেছে সেটা মিতালিকে জানাতে কী হয়েছিল ইন্দ্রর? "আরে, তুমি বেকার রাগারাগি করছ, ওটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না যে, জানাতেই হবে। আর তাছাড়া আজকাল আমাকে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয় প্রচুর। অত মনেও থাকে না।" রাগ করলেও পরে সামলে নেয় মিতালি। আহা! একা পুরুষমানুষ, সবদিক সামলাচ্ছে এই কী কম কথা! তাছাড়া ওর শাড়ির বিজনেস ভালোই চলছে। কদিন আগেই বলেছিল, একটা দোকান দেওয়ার কথা চলছে। এখন কী আর এসব তুচ্ছ ব্যাপার ধরলে হয়!

ফোন রেখে চুপচাপ শুয়েছিল। শরীরটা খুব ভারী হয়ে গিয়েছে। হাঁসফাঁস লাগে আজকাল। তবু ঘরের মধ্যেই রুটিন মেনে রোজ সকালে-বিকেলে হাঁটে আর কিছু ফ্রি হ্যান্ড করে মিতালি। পেটের মধ্যে অতি যত্নে বেড়ে উঠছে তমোঘ্ন-পলার সন্তান। রেগুলার রুটিন মেনে চেক-আপ হচ্ছে, বেবি ভালোই আছে। তমোঘ্নদা আর পলার হাসি হাসি মুখ দুটো দেখে ওর মন ভরে যায়। পলাদি কখন অফিস থেকে ফিরেছে টেরই পায়নি মিতালি। ওর দরজা নক করতে তাকিয়ে দেখে পলাদি হাতে সদ্য শপিং করা প্রচুর জিনিসপত্র। দেখেই মিতালি হাঁ-হাঁ করে ওঠে, "আবার কী হাবিজাবি আনলে বলো তো?" "ওরে বাবা, তেমন কিছু নয়, কয়েকটা ড্রেস। এগুলোকে মেটারনিটি ড্রেস বলে।" মিতালি উলটেপালটে দেখে। টপ, নাইটি বা প্যান্টের কাছে বেশ অন্যরকম কাটিং, যাতে স্ফীত পেট নিয়ে সমস্যা না হয়। সত্যি এরা কত কিছু ভেবে এসব বানায়। মিতালি হেসে উঠল, "আমি আর কোথায় যাচ্ছি! শুধুশুধু গুচ্ছের টাকা নষ্ট করলে।" পলা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তারপর বলে, "আসলে আমার স্বপ্ন ছিল, আমি যখন কনসিভ করব, ঠিক এমন সুন্দর সুন্দর ড্রেস পরে ঘুরব।" মিতালি দেখল, ঘরের পরিবেশটা কেমন যেন ভারী হয়ে উঠছে। এখুনি ওকে কিছু একটা করতে হবে। ঠিক সময়েই পেটের দুষ্টুটা, সজোরে একটা লাথি কষাল। পেটে হাত দিয়ে মিতালি অনুযোগ করল, "দেখছো পলাদি তোমার কথার অবাধ্য হয়েছি বলে, তোমার বাচ্চা আমায় লাথি মারল।" পলা দৌড়ে এসে মিতালির পেটে কান ঠেকিয়ে বলতে শুরু করল, "এই তো, এই তো রে, কেমন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে

দুষ্টুটা পেটের ভিতর।” দুই মা জগত সংসার ভুলে অনাগত সন্তানের স্পন্দনে বুঁদ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

এর মধ্যে মিতালি একদিন, দেশে ফোন করে জানতে পারল, ইন্দ্র নিজের দোকান দিয়েছে। আর মাঝে মাঝে স্কুল কলেজেও শাড়ি সাপ্লাই দিতে যাচ্ছে। শীলার সঙ্গেও কথা বলল একদিন। মেয়েটি বেশ, নিজের সংসার হারিয়ে পরের সংসারকে বুক দিয়ে রক্ষা করছে। তার ছেলেমেয়ে দুটোকে আপন করে নিয়েছে। মিষ্টি করে বলল, “দিদি একদম চিন্তা কোরো না, আমি সব সামলে নিচ্ছি।” বড়ো স্বস্তিবোধ করেছে মিতালি। রোদ পড়ে এলে সামনের বাগানে একটু হাঁটে সে। পলাদি অফিস থেকে এসে গেলে সেও সঙ্গ দেয়। হাঁটতে হাঁটতেই ভাবে ফিরে গিয়ে সেও কিছু করবে। পলাদির কথা মতো উল বোনা মেশিন কিনে শুরু করে দেবে। আর বাড়িটা একটু সংস্কার করে বাকি টাকাটা ফিক্সড করে দেবে। মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়, যাকে শরীরে ধারণ করেছে, সে কি কোনও অর্থেই তার সন্তান নয়? সেই সন্তান কোনও দিনই তার অস্তিত্বটুকুও জানবে না? জীবনে কোনওদিন শত ইচ্ছে হলেও কি, এই সন্তানের মুখ সে দেখতে পারবে না? এই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাবে? এই যে নিজের দেহরসে পুষ্ট করছে যাকে, সে একদম পর হয়ে যাবে? সে তার কেউ নয়! তবে যে বলে, নাড়ির বন্ধন, এও তো তার নাড়ি ছিঁড়েই জন্ম নেবে। তাহলে? কেমন এ নিয়ম? বুকের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা পাক খায়। দুচোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে নামে। তমোঘ্ন ইশারায় পলাকে দেখালে, পলা ন্যাপকিন দিয়ে চোখের জলটুকু পরম মমতায় মুছিয়ে দেয়। আর স্বান্তনা দেওয়ার কণ্ঠে বলে, “এই স্টেজে খুব ইমোশন্যাল হয়ে যায় সবাই, নিজেকে কন্ট্রোল করো মিতা।”

চাপা গলায় ওরা আলোচনা করে, কী হয়েছে বলো তো মিতার! আজকাল খুব অন্যমনস্ক থাকে। কারণে অকারণে একা বসে বসে কাঁদে। আমার খুব একটা সুবিধের ঠেকছে না। ও আবার অন্য কিছু ভাবছে না তো? তমোঘ্ন বউকে ধমকায়, “কী যে বলো তুমি, তার ঠিক নেই। এতদিন বাড়ি ছাড়া, তাই হয়তো মন খারাপ। তুমি হলে কী করতে?” পলা আর কথা বাড়ায় না। মিতালি সবকিছু আড়াল থেকে শুনে খুব লজ্জা পায়, ছি ছি, পলাদি তাকে কত ভালোবাসে। নাহ আর আজেবাজে ভাববে না সে। আজ একটু হলেই ধরা পড়ে যাচ্ছিল সে। ভাগ্যিস তমোঘ্নদা থামিয়ে দিল পলাদিকে। ক্লান্ত পায়ে সে নিজের ঘরে ফিরে আসে। তারপর নরম বিছানার মধ্যে নিজেকে সঁপে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে দু চোখ ঝেঁপে ঘুম নামে। সব চিন্তা থেকে আপাতত ছুটি তার।

(নয়)

উপলব্ধির অন্ধকার ঘিরে ধরছে মিতালিকে। পেঁজা পেঁজা অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে সে। নতুন করে চিনছে সম্পর্কের ফিকে হয়ে যাওয়া সুগন্ধ। নতুন করে ছুঁয়ে নিচ্ছে রং জ্বলে যাওয়া মুখোশের নীচে আটকে থাকা এতকালের অচেনা মুখ। ওপরের ফ্লোর থেকে ভেসে আসছে নবজাতকের কান্না। নাহ্, কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়নি মিতালির। আসলে ওর ঘুমই আসেনি। শুয়ে শুয়ে আচমকা খালি হয়ে যাওয়া পেটের উপর হাত দিয়ে ভাবছিল, এই কত মাস যে এখানে ছিল, সত্যিই কি সে তার আত্মজ নয়? জিন না দিতে পারলে বুঝি মা হওয়া যায় না? তার এই গর্ভ, তার দেহরস শোষণ করে বেড়ে ওঠা একরত্তি শিশুটার কেউ নয় সে? আজ থেকে ঠিক আট দিন আগে হসপিটালে তমোঘ্ন আর পলার সন্তানের জন্ম দেয় সে। একদম নর্মাল ডেলিভারি। তাই পরেরদিনই বাচ্চাসহ মিতালিকে রিলিজ করে দিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পর সন্তানকে কোলে নিয়ে ওপরে উঠে চলে গিয়েছিল পলা। মিতালি পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে চাইলে কঠিন ভাষায় ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, "আহ, তুমি আবার আমার পিছু ধরলে কেন? যাও নিজের রুমে গিয়ে রেস্ট নাও।"

এই ক মাসে ওরা বেবি কেয়ারের উপর কোর্স করেছে। তাই খাওয়ানো, ন্যাপি পরানো, এসব নিয়েও মিতালির সাহায্য প্রয়োজন হয়নি। মিতালি সেদিন হসপিটাল থেকে এসে ফ্রেশ হয়ে বাচ্চার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছোট্ট একরত্তি গোলাপি বাচ্চাটা বেবি কটে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পলা আর তমোঘ্ন আত্মমগ্নের মতো বলে যাচ্ছিল, এক মাথা কোঁকড়া চুলটা তমোঘ্নর মতো, গায়ের রংটা একদম পলার মতো পিঙ্কিশ হোয়াইট আর চোখের নীল মণি দুটো তমোঘ্নর বাবার মতো। মিতালি খুব খুঁটিয়ে আরেকবার ওদের পিছন থেকে গলা বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে দেখল। সত্যিই তো ওর মতো একটুও নয়। না মুখ, না চোখ, না হাত-পা, আঙুল! ওকে দেখতে পেয়েই পলা ফোঁস করে উঠেছিল, "তুমি আবার এ ঘরে কেন?" মিতালি কোনওক্রমে বলল, "পলাদি ওর তো খাবার সময় হল, তাই খাওয়াতে এলাম।" "কী খাওয়াবে? মাই গড! ব্রেস্ট ফিড করাবে নাকি তুমি? শোনো মিতালি, তোমার কাজ শেষ। কদিন রেস্ট নাও। আর প্যাকিং করে রাখো। টিকিট পেলেই তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

স্তম্ভিত হয়ে যায় মিতালি। তবু আমতা আমতা করে বলে, "কিন্তু কী খাবে ও?" "ও নিয়ে তুমি ভেবো না। এই যে ফর্মুলা আছে, এটা ওর খাবার।" মিতালি তাকিয়ে দেখে, টেবিলের উপর রাখা ছোট্ট ছোট্ট শিশিতে রেডিমেড তরল দুধ, এটাকেই ফর্মুলা, না

কী যেন বলছে। অপমানিত মিতালি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। আর কানে আসে তমোঘ্নদার কথা, "আহ পলা, তুমি না বড্ড বেশি রুড বিহেভ করছ মেয়েটার সাথে। আর তাছাড়া ব্রেস্ট ফিড তো ডক্টররাও সাজেস্ট করেন, অসুবিধাটা কোথায় তাহলে?" প্রত্যুত্তরে পলাদির উত্তর কেউ যেন মিতালির কানে গরম সিসা ঢেলে দেয়। "অসুবিধা কোথাও নেই তো। ইসস ওর খোলা বুক দেখার সাধ হয়েছিল বুঝি তোমার?" মিতালি আর দাঁড়ায়নি। দৌড়ে নিজের বরাদ্দ ঘরটিতে ঢুকে যায়। এপাশ ওপাশ করছিল মিতালি। কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বাচ্চাটার কান্না এবার থেমে গিয়েছে। কদিন ধরেই নবজাতককে শুভেচ্ছা জানাতে বাড়িতে অতিথি সমাগম হচ্ছে। সেই সব অতিথিদের সাধ্যমত আপ্যায়ন করেছে মিতালি। এই ক মাসে নানা অনুষ্ঠানে ওর সঙ্গে অনেকের পরিচয় হয়েছিল। মিতালির বিদায় বেলা উপস্থিত জেনে তারাও ওর জন্য টুকিটাকি গিফট নিয়ে আসছে। কোনও কিছুই ছুঁয়ে যাচ্ছে না মিতালিকে। ও যেন আনন্দ আর বিষাদে মিশেল এক নারীমূর্তি। একদিকে দুই সন্তানের কাছে ফিরে যাওয়ার আনন্দে বিভোর, তো আরেকদিকে এই সন্তানকে ছেড়ে যাওয়ার বিষাদে নীল। নাহ, আজ আর রাত্রে ঘুম আসবে না। লাইট জ্বালিয়ে ও নিজের জিনিসপত্তর গোছাতে বসল। এই ক মাসে জিনিস তো কম জমেনি। কী মনে হতে পলাদির কিনে দেওয়া হ্যান্ড ব্যাগ, পোশাক, কসমেটিক্স আর বাচ্চাদের জন্য কিনে দেওয়া সফটটয়গুলো ওয়ার্ডরোবের এক কোণে ফেলে রাখল। কেন যেন মনে হল, এই উপহারগুলোতে আন্তরিকতার স্পর্শ নেই, এগুলো যেন ঘুষ।

পরেরদিন সকালেই ট্রাভেল এজেন্ট ফোন করে জানাল, মিতালির দেশে ফেরার টিকিটের বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে মিতালি। যত তাড়াতাড়ি এই মায়ার বাঁধন কাটানো যায়, ততই ভালো। শিকাগো থেকে লন্ডনের হিথরো, তারপর ওখানে থেকে দিল্লি হয়ে দমদম। এত সব শুনে বুক কাঁপছিল মিতালির। আসার সময় তো পলাদির সঙ্গে এসেছিল। কথা ছিল, ফেরার সময় তমোঘ্নদা দিতে যাবে। কিন্তু এখন যা শুনছে, ওকে একাই যেতে হবে। পলাদি হেসে হেসে আশ্বস্ত করল, "দূর মেয়ে, এত ভয় পাবার কী আছে? ঠিক পারবে। আরও কতজন যাবে। ঠিক চেনাজানা হয়ে যাবে।" তারপর তমোঘ্নর উদ্দেশ্যে বলল, "তুমি বরং এর মাঝে একদিন মিতালিকে নিয়ে একটু শপিং করিয়ে আনো। ওর বাচ্চাদের জন্য কিছু কিনে দিও। আমি তো বেবিকে নিয়ে এখন বাইরে বেরোতে পারব না।" কঠিন স্বরে মিতালি বলে, "অনেক তো দিয়েছো তোমরা, আমার প্রাপ্যর থেকে অনেক বেশি পেয়েছি। ইন্দ্রনীল জানিয়েছে টাকাটা অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেছে। আর কিছু আমার দরকার নেই।"

পলা আর কথা না বাড়িয়ে বাচ্চার ন্যাপি পালটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তমোঘ্ন শুধু একবার বলল, "ফেরার ডেটটা ইন্দ্রনীলবাবুকে জানিয়ে দাও।" মিতালি অল্প হেসে বলল, "থাক না, হঠাৎ গিয়ে বেশ চমকে দেব।"

আর মাত্র দুটো দিন তার এদেশে থাকার মেয়াদ। খুব ইচ্ছে করছে কটা দিন ধরেই বাচ্চাটা বুকের কাছে নিয়ে শুয়ে থাকতে। ওর কচি দেহের সুবাস নাকের মধ্যে টেনে নিতে, যাতে সারাজীবন তা ধরে রাখতে পরে। কিন্তু সেদিনের পর থেকে ও পারতপক্ষে বাচ্চাটার কাছে ঘেঁষে না, পলাদি যদি কখনও কোনও কাজে ব্যস্ত থাকে, আর ওকে হয়তো বলে একটু ধরো তো বেবিকে, মিতালি সন্তর্পণে কোলে নেয়, ঠিক যতটুকু সময় পলাদি ওকে দেয়, ততটুকুই। আগ বাড়িয়ে চায় না। বাচ্চাটা হসপিটাল থেকে আসার পরপরই পলাদি আর অফিস যায় না। সারাদিন ল্যাপটপ খুলে বসে থাকে। বাড়ি থেকেই কাজ করে। সেদিন অনেকক্ষণ কাজ করে টয়লেটে ঢুকল স্নান করতে। আর ঠিক সেই সময়ই বাচ্চাটা ঘুম ভেঙে কান্না শুরু করে দিল। পলাদি বেডরুম লাগোয়া টয়লেটের দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে মিতালিকে ডাক দিল, "ও মিতা, ওকে একটু ধরো তো, কেন যে কাঁদছে!" মিতালি পড়িমরি করে দৌড়ে এসে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, পলাদির সারা শরীর সাবানের ফেনায় মাখামাখি। ও আসতেই পলা টয়লেটের দরজা বন্ধ করে দিল। অভিজ্ঞ চোখে মিতালি বুঝতে পারল, বাচ্চাটার খিদে পেয়েছে। কী যে হয়ে গেল ওর, পলকে নাইটির বোতাম খুলে একটা স্তন বাড়িয়ে দিল। বাচ্চাটাও খাদ্যের উৎসের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠল। আর টয়লেটের ভিতর থেকে পলার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "উফ কী কান্নাটাই না কাঁদছিল। তোর কোলে যেতেই রাজপুত্র চুপ।" কতক্ষণ এভাবে বসেছিল মিতালি জানে না। কখন যেন পলাদি স্নান সেরে বেরিয়ে এসেছিল। আর সেই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল, "হাউ ডেয়ার ইউ? ওই নোংরা বুকের দুধ আমার বাচ্চাকে কেন খাওয়াচ্ছিস তুই? বারণ করেছিলাম না তোকে আমি?"

পলকে ছোঁ মেরে বাচ্চাটাকে তুলে নেয় পলা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে, "যা, বেরিয়ে যা, আমার রুম থেকে। দূর হ চোখের সামনে থেকে।" চোখের জল বাঁধ মানে না মিতালির। দৌড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখে, তমোঘ্নদা কখন যেন ফিরে এসেছে। স্ত্রীর ব্যবহারে সেও হতচকিত। মিতালি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করতে যাওয়ার আগের মুহূর্তে তমোঘ্ন এসে দাঁড়ায়। বুকের মধ্যে টেনে নেয় মিতালিকে। সমব্যথীর মতো মিতালির মাথায় হাত বোলায়। মিতালির স্তন থেকে একফোঁটা দু ফোঁটা তখনও ঝরছিল অমৃতসুধা,

যা তমোঘ্নর টিশার্ট ভিজিয়ে দেয়। এই মুহূর্তে তমোঘ্নকে খুব আপন মনে হয় মিতালির। সেই কামুক মানুষটার মুখোশ ফেটে গিয়ে যেন একটি দরদী-মরমী বন্ধু বেরিয়ে এসে তাকে দিতে চাইছে স্বান্তনার প্রলেপ। তমোঘ্নকে আঁকড়ে ধরে কান্নার বেগ সংবরণ করার চেষ্টা করে মিতালি।

(দশ)

"মিতা কত রোগা হয়ে গেছ তুমি!" "বৌমা, কী এমন কাজের বাড়ি ছিল তোমার, যে এক বছরের উপর একবার ছুটি নিয়েও আসতে পারোনি। আর বম্বে না মুম্বাই, সে আর এমন কী দূর!" "দিদি, দেখে যা, মা আমার জন্য কত্ত খেলনা নিয়ে এসেছে।" "মোটেই না ভাই, ওগুলো শুধু তোর জন্য আনেনি, আমাদের জন্য এনেছে মা, তাই না?" ঘুমের মধ্যে ইন্দ্র, বিধুকাকু, বাবুন, টুয়া কত না সম্বোধনে তাকে ডেকে যায়। বড়ো ক্লান্ত বোধ করে সে। ঘুমিরে অতলে আরও তলিয়ে যায়। পাশের সিটের মাসিমা ঠ্যালা দেন। "এই যে মিতালি সিট বেল্ট বেঁধে নাও। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দমদম পৌঁছে যাব।" চোখ কচলে সিট বেল্টটা বেঁধে নেয়। দিল্লি থেকে মাত্র এইটুকু পথেই কখন চোখ লেগে গিয়েছিল বুঝতেই পারেনি মিতালি। তাহলে সে পৌঁছে গেল! পাশের সিটের মাসিমা বেশ আলাপী। ছেলের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বছরে একবার করে চলে যান। ছেলে বৌমা বলে, একার সংসার আগলে পড়ে না থেকে, পাকাপাকি চলে আসতে। দেশের টান বড়ো টান। সে টান ছিন্ন করে যেতে পারেন না । এই মাসিমা পাশেপাশে ছিল বলে নির্বিঘ্নে বারবার প্লেন চেঞ্জ করে আসতে অসুবিধা হয়নি। বোর্ডিং-এর সময় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। উনিই আলাপ করে নিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, "প্রথমবার একা যাচ্ছ বুঝি? যারা তোমায় ছাড়তে এসেছিল ওরা কারা?" মিতালি জানিয়েছিল, দূর সম্পর্কের দিদি জামাইবাবু। দিদির বাচ্চা হওয়ার জন্য সে কয়েকমাস এসেছিল। মাসিমা ওর মুখের উপর ভালো করে তাকিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, "তা দিদি মনে হচ্ছে খুব খাটিয়ে নিয়েছে এই ক মাসে? তোমার চোখে মুখে তো বেশ ক্লান্তির ছাপ।"

সেই মাসিমার সহায়তাতেই প্রি-পেড ট্যাক্সি বুক করে নিয়েছিল এয়ারপোর্টেই। ট্যাক্সিতে একা ফিরতে ফিরতে ভাবছিল, ইন্দ্র ঠিক রাগারাগি করবে। একা একা ট্যাক্সি করে ফেরার কী দরকার ছিল? আর তাছাড়া ওর ফেরার খবরটাই বা কেন দেয়নি?

মিতালি তখন ফিক করে হেসে দেবে আর তাই দেখে ইন্দ্র আরও রেগে যাবে, গজগজ করবে, “এই পলা ভদ্রমহিলাটাই বা কেমন রে বাবা, প্রয়োজনের সময় আমার বৌটাকে নিয়ে গেলি আর এখন একা একা ছেড়ে দিলি? একটা ফোন করে খবর দেওয়ার প্রয়োজনটাও বোধ করল না!” মিতালির তখন বয়েই যাবে ইন্দ্রর রাগকে পাত্তা দিতে। ও বাবুনকে কোলে তুলে নেবে আর টুয়া ওর কোমর জড়িয়ে অবাক হয়ে দেখবে। তারপর বলবে, “মা এই রকম লং স্কার্ট সবসময় কেন পরো না তুমি? কী সুন্দর লাগছে তোমাকে!” এই সব সুখ স্বপ্নে ভাসতে ভাসতেই চোখের পর্দায় ভেসে উঠল বাচ্চাটার কথা। ওকে মনে মনে নাম দিয়েছে মিতালি ‘স্বপ্ন’। সত্যিই তো ওই শিশু তার যাবতীয় স্বপ্নপূরণ করে দিয়েছে। ভাগ্যিস পলাদি শেষ মুহূর্তে একটু নরম হয়েছিল। বাচ্চাটাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে ওকে ছাড়তে এসেছিল। শেষ মুহূর্তে স্বপ্নকে বুকে জড়িয়ে কপালে স্নেহ চুম্বন করেছিল মিতালি। ঘোর ভাঙল ড্রাইভারের কথায়, “ম্যাডাম রাস্তার হাল খুব খারাপ। যে কোনও মুহূর্তে আমার গাড়ি ফেঁসে যেতে পরে। আরও এক্সট্রা একশো টাকা লাগবে কিন্তু।” মিতালি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। তমোঘ্নদা ফেরার সময় কিছু টাকা দিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, “সঙ্গে রাখো, কাজে লাগবে কলকাতায় পৌঁছে।” এক জায়গায় ট্যাক্সি থামিয়ে নাড়ির জন্য কিছু ফল মিষ্টি কিনে নিল মিতালি।

সন্ধের মুখে তাদের জরাজীর্ণ বাড়িটার সামনে হলুদ-কালো ট্যাক্সিটা এসে থামল। পথচলতি দু-একজন মানুষ কৌতূহলে ফিরে ফিরে দু-একবার তাকিয়ে, যে যার নিজের মতো চলে যাচ্ছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার বাড়িটার ভগ্ন দশার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে মিতালিকে দেখল ভালো করে। যেন মেলাতে চাইছে। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে এতটা পথ ট্যাক্সিতে আসা ম্যাডামের সঙ্গে এই নাড়ির সম্পর্কটা কতটা বেমানান। না, ভুল হচ্ছে না কোথাও। ম্যাডাম একটু আগেই তো বললেন, “এই যে আমার বাড়ি এসে গেছি।” তারপর কিছুটা আনমনেই বলেছিল, “ছেলেমেয়ে দুটো গেল কোথায়!” ট্যাক্সিটা বেরিয়ে যেতে, দু হাতে ব্যাগগুলো নিয়ে ধীরে ধীরে খোলা দরজা দিয়ে উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় উঠল মিতালি। ইন্দ্রকে দেখা যাচ্ছে না। সব গেল কোথায়! অন্ধকার হয়ে আসছে, বাচ্চাগুলো কি এখনও খেলে বাড়ি ফেরেনি? ইস কী আরম্ভ করেছে সব? শুধু খেলা আর খেলা। আর ইন্দ্রটাও তেমন কোনও দিকে দেখে না।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেল মিতালি। কেউ যেন ওর পা দুটো ওখানেই পেরেক দিয়ে আটকে দিয়েছে। নড়তেও ভুলে গেল ও। বারান্দার উপরে দীর্ঘ ছায়া। ঘরের মধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ এক জোড়া নারী পুরুষের ছায়া। আর ছায়ার অবয়ব বলে

দিচ্ছে, পুরুষ ছায়াটি ইন্দ্রনীলের। কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়েছিল মনে নেই। একটা সময় মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। ইন্দ্র চমকে উঠে বলল, "কে? কে ওখানে?" মুখোমুখি দাঁড়াল মিতালি। অন্য ছায়াটি ততক্ষণে পিছু হটে গিয়েছে। ইন্দ্রর মুখ থেকে কোনও কথা সরল না। ওকে পিছনে ফেলে মিতালি ঘরের মধ্যে এগিয়ে গেল। আর ঠিক তখনই ছেলে মেয়েরা টিউশন পড়ে হৈ হৈ করতে করতে ফিরল। শীলা ততক্ষণে ওর জন্য দু বালতি স্নানের জল তুলে ডেকে গেল, "বৌদি, বাথরুমে জল দিয়েছি। স্নান করে নিন, চা বসাচ্ছি।"

অনেক রাত্রে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে গেলে, ইন্দ্র মিতালির পা দুটো জড়িয়ে ধরল। গলায় বিষণ্ণতা, "মিতা ক্ষমা করো, আসলে আমিও তো রক্তমাংসের মানুষ। এতগুলো দিন তুমি ছাড়া, তাই মানে..." কথা হাতড়ায় ইন্দ্র। মিতালিকে ওকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় পিছনের আগাছাভর্তি বাগানে। একপা একপা করে নেমে যাচ্ছে সে সীমাহীন আঁধার গর্ভে। দূরে কোথাও একটা রাতচরা পাখি ডেকে উঠল। ঘুমের মধ্যে সেই শব্দ শুনে বাবুন যেন কেঁদে উঠল। কিছুই স্পর্শ করল না মিতালিকে। ও আরও আঁধার মেখে একটু একটু করে জমাট আঁধার মানবী হয়ে গেল একসময়।

❑ ❑ ❑ ❑

নিভৃতে যতনে

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

এই গল্প যখনকার, সে সময় মোবাইলের এত রমরমা ছিল না। একটা ল্যান্ডলাইন পেতেও অনেকদিন আবেদন করে বসে থাকতে হত। ফলে মানুষের নিজস্ব সময় অনেকটা থাকত। এস এম এস না থাকায় নিজের মনের কথা লোকে চিঠিতে লিখত। কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রেরকের হাতের ছোঁয়া, গোপন শ্বাস, বসবাসের আবহাওয়াও খাম বা ইনল্যান্ডে বন্দী হয়ে আসত পিয়ন মারফত। জীবন এত দ্রুতগামী ছিল না। দু দণ্ড অবসর ছিল কাছে বা দূরে থাকা চেনা মানুষদের স্মৃতিচয়ন করবার। সে সময়ে গ্রামবাংলায় প্রেমকে উঁচুস্বরে প্রকাশ করা সহজ ছিল না। তাই তার একটা চোরা প্রবাহ থাকত। আর এই গল্প যেখানকার, সেই সিঙ্গুর জায়গাটাও কারখানা, আন্দোলনের দৌলতে এত বিখ্যাত হয়নি।

সিঙ্গুরনিবাসী তাপস লাহা সে সময় লোকাল ট্রেনে কলেজ যেত। আর 'কলেজ যাচ্ছি' এই বলে হাসিমুখে চেনা লোকেদের সামনে দিয়ে পথ পার হত। 'কলেজ যাচ্ছি' কথাটা বলতে তাপসের বেশ ভালো লাগত। কারণ সে ভাবত ঐ সব পথচলতি লোকেরা ভাবছে – সেদিনের ছোটো তাপস আজ কত বড়ো হয়ে গেল। এই বড়ো হওয়াটা নিজেকে বুঝিয়ে দিতে তাপস নিয়ম করে হাতে ঘড়ি পরত, সরু গোঁফটা মধ্যরেখার দুপাশে মাপে মাপে সমান ভাবে ছড়িয়েছে কিনা তাই নিয়ে খুঁতখুঁত করত। তবে মাঝখানে সিঁথি করে চুল আঁচড়াবে কিনা তা নিয়ে সে একটু দোনোমনো অবস্থায় ছিল। যদি বাবা কিছু বলে। আসলে তাপসের মতো ভালো ছেলে অপূর্বপুর পূর্বপাড়ায় আর নেই, মা-কাকিমারা একথা বারবার বড়ো গলায় জাহির করত। সেই মতো তাপসেরও নিজের রক্ষণাবেক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার একটা দায় ছিল। তাই হাজার ইচ্ছা হলেও স্টেশনের পত্রিকার স্টলের কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের পত্রিকাগুলোর মলাট তাপস কাছে গিয়ে দুচোখ ভরে দেখতে পারত না। আড়চোখে দেখে নিতে হত। অথচ তাপস নিজের বয়সি অনেককে সেগুলো হাতে নিয়ে পড়ে দেখতে দেখেছে।

কলেজে সেদিক থেকে সে অনেক মুক্ত। তবুও কলেজের ভেতর তার ভালো থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। চারপাশে বেঞ্চে তরুণ তরুণীদের হৈ চৈ হাস্যালাপ। যারা পর্দায়

থাকার রয়েছে। তাপস কেবল দর্শক। 'আঙুর ফল টক' বলে কতদিন আর নিজেকে ভুলিয়ে রাখা যায়? অন্যদিকে চুপচাপ ভয়ে ভয়ে থাকা মেয়েও যে নেই তা নয়। তবে তাদের কাছে পৌঁছতে গেলে আবার নিজের টাইপ ভাঙতে হবে। দৈবাৎ এ দুর্দৈব অবসান করে শিপ্রা প্রশ্ন করে বসল, "তুই কোথায় থাকিস?" যেন স্থায়ী ঠিকানা ছাড়া অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে না। মাস কেটে গেছে এখনও কথাবার্তা কাটখোট্টা বস্তুবাদেই সীমাবদ্ধ। কোন স্যার কেমন পড়াচ্ছে। ক্লাস নোট। রেলের টাইম টেবিল। যাক গে, জলে ডুব দেওয়ার গভীরতা না থাক মাড়িয়ে চললেও হবে! তার আর্দ্র স্পর্শ মালুম করছি, এ কথা বিশ্বাস করলেই হল। তাপস তেমন বিশ্বাসেই অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু কেউ তাকে ফলো করছে এমন একটা অস্বস্তি তাকে মাঝে মাঝে তাড়া করতে লাগল। সে পিছন ফিরে কাউকে দেখতে পেত না, তবে এমনটা তার মনে হত। কে ফলো করছে তাকে? কে জানে। তার উদ্দেশ্য আলতো পিছুটান দেওয়া, না পিছনে কষে লাথি মারা তাও স্পষ্ট নয়। কিন্তু তাপস তাকে অনুভব করত। বিশেষ করে শিপ্রা সঙ্গে থাকলে। কেউ যেন আড়াল থেকে ড্যাবড্যাব করে দেখছে। তবে তাপস ব্যাপারটায় পাত্তা দেবে না মনস্থির করে শিপ্রার সঙ্গে ঘোরাঘুরি চালিয়ে যাচ্ছিল।

সেদিন শনিবার ছিল। দমকা হাওয়া জোরদার ছিল। তাপস প্যারিমোহন কলেজের গেটটা অতিক্রম করে রাস্তায় নামতে যাবে, শিপ্রা পেছন থেকে ডেকে দাঁড় করাল। "কদিন কলেজ আসিসনি যে? শরীর খারাপ হয়েছিল?"

তাপস বিনীতভাবে বলল, "ক্লাসও তো তেমন ছিল না।"

"শুধু ক্লাস করতেই আসিস বুঝি?"

বিনা আয়োজনেই তাপস কেমন আপ্লুত হয়ে পড়ল। শিপ্রার কথাগুলো রোম খাড়া করতে করতে ত্বক বেয়ে এগিয়ে চলেছিল। তাপস কথার খেই হারিয়ে বোধ হয় বলতে যাচ্ছিল, "এত হাওয়া কোথা থেকে আসছে বল তো?" এমন সময় হঠাৎই তার চোখে পড়ল রাস্তার ওপারে পান সিগারেটের দোকানটার দিকে। দোকানের আড়ালে লুকিয়ে উঁকি দিচ্ছে বাবা। চোখাচোখি হয়ে যেতেই তাপস শিপ্রাকে চেনে না এমন ভান করতে যাবে, তার আগেই বাবা দৌড়ে একটা রিশা চড়ে আচমকা অদৃশ্য হয়ে গেল। সোমবার কলেজে আসতেই পানের দোকানি তাপসকে ডেকে দুটো চামড়ার চটি দিয়ে বলেছিল, "সেদিন তাড়াতাড়িতে তোমার বাবা এ দুটো ফেলে গিয়েছিলেন।"

জুতো ব্যাগে ভরে তাপস তৎক্ষণাত বাড়ি ফেরে। তাপসের মেয়েদের সঙ্গে মেশার চেষ্টা সেই প্রথম, সেই শেষ।

২

বিয়ের একুশ দিন পর বিকেলবেলা একা একা ছাদে দাঁড়িয়ে এসব কথাই মনে পড়ছিল তাপসের। যে বাবা তাকে লক্ষ রাখার জন্য কলেজের সামনের পানের দোকানদারকে মাসোহারা দিত, চাকরি পেতে না পেতে সেই বাবাই কিনা নিজের উদ্যোগে একটা জলজ্যান্ত মেয়ে এনে ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। পুকুরপাড়ে তালগাছে বাবুই পাখির আপন ঠোঁটে বোনা বাসা ঝুলছে। তার গোড়ায় শতরঞ্চি পেতে বসে মনু মিত্তির মাছ ধরছিল। ভদ্রলোক সুতো খরচে খুব কার্পণ্য করেন। বঁড়শিতে মাছ গাঁথলে নিজেও ছিপ সমেত জলে নেমে যাবেন, তবু সুতো ছাড়বেন না। লোকে এই নিয়ে প্যাঁক দিলে বেজায় চটে যান। বলেন, "মাছকে খেলিয়ে তুলতে হয়।" তাপস বাবুই পাখিদের আনাগোনার দৃশ্য থেকে পুকুরে চোখ নামিয়ে অপেক্ষা করছিল কখন মনু মিত্তির জলে নামেন। পিঠে একটা নরম হাতের ছোঁয়া পেয়ে ফিরে তাকাল। শুচিস্মিতা। তাপসের নববধূ। বর্ধমানের গুসকরায় তাপসের মাসির বাড়ি। মাসিই সম্বন্ধ এনেছিল। সৌন্দর্যের গায়ে তুলি দিয়ে চপলতা মাখিয়ে সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতিতে তাকে আস্বাদনযোগ্য করে তৈরি করেছে ঠিকই, কিন্তু সে চিক্কন এখন তাপসের নার্ভাসনেস বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কাজে লাগে না। এক্ষেত্রে শুচিস্মিতা এসেই, "দেখো দেখো! ঐ লোকটা কেমন ছিপ হাতে জলে নেমে গেছে জামা কাপড় পরে। কী করছে?"

"মাছের সঙ্গে ধরাধরি খেলছে। জিজ্ঞাসা করলে অবশ্য বলবে, খেলাচ্ছে।"

এই উত্তরে শুচিস্মিতা অট্টহাস্য করে তাপসের গায়ে এসে পড়ায় তাপস গুটিয়ে গেল। বলা বাহুল্য, একান্ত আদিম প্রবৃত্তিটি ছাড়া আর কারও দ্বারা তাপসের এ লজ্জাহরণ মুশকিল। বিশেষত মেয়েদের কাছে স্বাভাবিক হবার অনভ্যাসটা যেন তাকে এমন প্যাকেটে ভরে রেখেছে যে, পাশের বউটা যে নিজেরই সেই অনুভূতিটাও শক্তভাবে গড়ে ওঠেনি। তবে গা শিরশির করা মিষ্টি অনুভূতিটা একদিন ছিল। রোম্যান্টিক গানের কলি বাথরুমের দেওয়ালে ধাক্কা খেত। স্কুলে মন্দিরা। মিটিমিটি হাসত থেকে থেকে। দেখেও দেখিনি ভাব কতবার তাপসকে করতে হয়েছে। যাওয়া আসার রাস্তায় ওদের বাড়ি পড়ত। আড়চোখে তাকিয়ে নেওয়ার মজা। একবার স্কুলে অঙ্কের স্যার দুজনের গণিতে পারদর্শিতার একসঙ্গে প্রশংসা করে বসলেন। ব্যস আর যায় কোথায়, বন্ধুরা অ্যায়সা রাগাতে শুরু করল যে তাপস মন্দিরাদের নাড়ির সামনে দিয়ে সোজা রাস্তা ছেড়ে বিকল্প পথে ঘুরে ঘুরে যাতায়াত করতে থাকল। স্ক্যানডালের ভয় তাপসের হাড়ে মজ্জায় পরজীবী হয়ে বাস করত, আর ভালোলাগার যেটুকু রস ভেতরে ভেতরে বইতে চাইত তার সবটুকু চুষে নিত। তা বলে কি নিস্তার আছে! ঐ যে ঘোষদের মালা, সুজয়বাবুর ফিজিক্স ব্যাচের আলোচনার বস্তু ছিল। পড়ার বইয়ের সঙ্গে কবিতার বই নিয়ে ঘুরত। এই কাব্য,

পড়াশুনার চাপ মিশে গিয়ে এতই জলঘোলা হল যে ডাকাবুকো সুমনেরও কবিভাব জাগ্রত হয়ে গেল। মালাকে সবাই বলত 'হট'। সেই সূত্রে মালা কতটা গরম, তা সপ্রেম নিবেদন করতে সুমন একটা কবিতা লিখেছিল। তাপস সেটা পড়েছে। দু লাইন এখনও মনে আছে। কী যেন?

"আমি তোমার প্রেমে/ যাই দরদরিয়ে ঘেমে।"

তাপস উষ্ণতা অনুভব করত। সময় সময় ছেঁকা লাগার ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ত। প্রকৃতির অদ্ভুত নিয়ম, লাফালাফি করল অন্য সবাই আর মালা থেকে ফুল পেল তাপস। ইলেভেনের অ্যানুয়াল পরীক্ষা এসে গেছে এই অজুহাতে ব্যাচ ফাঁকা ফাঁকা যাচ্ছিল। তেমনি একদিন নাড়ির কাছে ফুটেছে বলে সবাইকে দিতে দিতে চার পাঁচটা চাঁপাফুল তাপসকে ধরিয়ে দিল মালা। কী লাভ হল? তাপস বেগতিক বুঝে নিজে বেসামাল হয়ে তড়িঘড়ি টিচার বদলে ফেলল। কিন্তু একথা বোধ হয় কেউ জানে না যে, তাপস ডায়েরির মধ্যে যত্ন করে রেখে দিয়েছিল ফুলগুলো। কখনও মালার সঙ্গে দেখা হলে বাড়ি ফিরে সবার অলক্ষে সেই শুকনো ফুলের আঘ্রাণ নিয়ে তৃপ্তিতে চোখ বন্ধ করত। সমাজ জিনিসটা কেমন যেন, একফোঁটা রস পেলেও টেনে নেয়, তারপর চর্চায় নিন্দায় ভাগাভাগি করে ধরে রাখে, যতক্ষণ না সেই মানুষটা জ্বলেপুড়ে মরছে। তাপস ভালো ছেলে, তাই সম্পর্ক গড়ার কঠিন রাস্তায় পা না বাড়িয়ে কল্পনায় ভাবনায় সিনেমায় মিশিয়ে সম্ভোগ করেছে নিজের প্রেমকাহিনিকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতেও পেরেছে তার শূন্যতা। অথচ আজ রীতিমতো অ্যাটেস্টেড করা বউ। সমাজ সংসার বাবার – সবার সই ও স্ট্যাম্প আছে তাতে। তার সঙ্গে কি গড়ে উঠতে পারে না ভালোবাসার গল্প? দাম্পত্যের নিরাপদ পরিবেশেও দায়দায়িত্ব কর্তব্যবোধের ডালপালায় চাপা পড়ে অল্পসময়েই কি মনের সবুজ রঙ সাদা হয়ে আসে! তাপসের অফিসের সুবক্তা রঞ্জন সেদিন বিয়ে প্রসঙ্গে বলছিল – ভালোবাসা হল মাছের মতো আর বিবাহ জীবন ডাঙা। যতদিন অবিবাহিত আছ, ততদিন জল। তাতে ভালোবাসার খোঁজে চার ফেলে ছিপ নিয়ে বসে থাকো। ধৈর্য নিষ্ঠার অভাব চলবে না। তাতেও সে অধরা কতবার টোপের খাবার খেয়ে হতাশায় ফেলে চলে যাবে। কিন্তু বঁড়শিতে গাঁথলে এক হ্যাঁচকায় ডাঙায় তুলবে আর সংসারে খাবি খেতে খেতে মরে যাবে ভালোবাসা।

কথাগুলো শোনার পর অষ্টপ্রহর কষ্ট পেয়েছে তাপস। তার এতকালের প্রেম করার ইচ্ছা! ইস্, তখন যদি ফুল পেয়ে একটু সাহস দেখাতাম। লোকের মুখে কত শুনেছিলাম – কলেজ লাইফ। সেখানেও! বাবা তো ঐরকমই। ছোটোবেলা থেকে দেখছি। গুপ্তচরবৃত্তি করবেই। তা বলে ঘাবড়ে গিয়ে! তিন তিনটে বছর! শুচিস্মিতাই বা এতদিন

কোথায় ছিল? কতবার মাসির বাড়ি গেছে সে। কই তখন তো একটিবারও দেখা পায়নি। এল তো এল একেবারে বধূরূপে। রঞ্জনদারও যখন এই মত। তাপসের বেশ বোধোদয় হতে লাগল। না বুঝে সে বিয়ের মন্ত্রের মুখোশে ঢাকা ভালোবাসার শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করে ফেলেছে। নাহলে এই তো শুচিস্মিতা আসছে যাচ্ছে, কত কী ফিসফাস বলে যাচ্ছে। কোথায় কল্পনা, কোথায় সিনেমা, কোথায় সেই লাভ স্টোরি!

পুকুরপাড়ে জল থেকে উঠে মনু মিত্তির তখন ভিজে জামা কাপড়ে মাছ শিকারের মজা লুটছিল। মনু মিত্তিরের এই নিত্যকর্ম এই মুহূর্তে হঠাৎই তাপসকে অন্যরকম একটু নাড়া দিয়ে গেল। জল-ডাঙা-মাছ-সংসার-রঞ্জনদা সব ঘেঁটেঘুঁটে আচরণটা কিছু ইঙ্গিত করছিল। মনু মিত্তির যেন বৈবস্বত মনু হয়ে তাপসকে বিবাহপরবর্তী জীবনের প্রেম নিয়ে কোনও আইনকানুন বাতলে দিয়ে গেলেন। "তাহলে জলে নামতে হবে।"বতাপসের মুখে 'পেয়েছি!' ধরনের উৎফুল্লতা ফুটে উঠল। আলাদারকম কী কী করা যায় ভাবতে ভাবতে গার্হস্থ্য ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে ভালোবাসাকে ক্ষয় রোগের হাত থেকে বাঁচাবার একটা বড়োসড়ো শপথ করল সে মনে মনে।

বুধবার সকালটা সত্যি অন্যরকম ছিল। ভোর ভোর শুচিস্মিতার মাথায় একটা কাক অপকর্ম করে দিয়ে বৈচিত্রের সূচনা করেছে। তাপসের নীচের ঘরের জানলার কাছে একটা রজনীগন্ধার শিস লম্বা হয়ে চলে এসেছিল। তাপস জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল বাগানে এ-ফুলে ও-ফুলে পর্যায়ক্রমে বসে উড়ে প্রজাপতিরা মিউজিক্যাল চেয়ার খেলছে। আজ অফিস যাব না। শুচিস্মিতাকে নিয়ে বেরব। কাল সারারাত ধরে তাপসের উৎসাহ জোয়ারের জলের মতো বেড়েছে। তা দিয়ে ধুয়ে মেজে তাপস মনটাকে একদম টিনেজের জৌলুস এনে দিয়েছে। সকাল থেকেই তাপস ভাবছে এ তো সবাই করে প্রথম প্রথম। তা হোক। আগে সবার মতো করেই শুরু তো করা যাক। পরে নিজের স্টাইলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। ওদিকে অফিসভাত নেই। মহিলামহল কাজে ঢিলেমি শুরু করে দিয়েছে। তাপস গুনগুন করতে করতে স্নান সেরে নিয়ে হাঁকডাক করতে লাগল, "কী হল, এগারোটা বাজে।"

সে সময়ে বাইরে একটা সাইকেলের বেল বাজল। ডাকপিয়ন এসেছে। কাজের মেয়ে যমুনা একটা চিঠি এনে দিল। তাপস খামটা উলটে পালটে দেখে। তাপস লাহা/ প্রযত্নে দুর্গাপ্রসাদ লাহা/ অপূর্বপুর/ সিঙ্গুর...

কে আবার চিঠি লিখল? তেমন কেউ... তাপস খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে।

প্রিয়তম তাপস,

তোমায় নিয়ে গড়া সুখের স্বর্গ ভাঙলে নিমেষেই। যে ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে ছুঁয়ে গেছি সর্বক্ষণ, তা তোমার কাছে আজ হাওয়ার সুড়সুড়ির মতো গা সওয়া হয়ে গেল। তোমার সাড়া আজও আমার প্রাণে সুর হয়ে ধরা পড়ে। বেজে ওঠে অন্তরের পিয়ানোয়। আর হয়তো বাজবে না। কাপুরুষ! বাবা বলল আর পা পা করে ছাদনাতলায় হাজির হলে। একবারও আমার কথা মনে পড়ল না। নিজের বুকে হাত দিয়ে শোনো, আমায় অনুভব করতে পারো কিনা। চিরদিন আমি সেখানে থাকব। তুমি ভুলতে চাইলেও থাকব। তোমায় ভুলতে দেব না কোনদিনও।

ইতি

তোমারই...

চিঠিটা পড়া শেষ হতেই তাপস ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল। কণ্ঠজুড়ে সে জলতেষ্টা টের পাচ্ছিল। কিন্তু চোখের সামনে তার নতুন সংসারটা জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে দেখে চমকে ওঠায় তেষ্টাটা হড়কে পেটে চলে গেল। যদি বাবার হাতে পড়ত, বা শুচিস্মিতার! তাপস মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে সামনে থেকে পিছনে চেপে ধরে। ছি! ছি! দুপুর দুপুর তাপস বেড়াতে গিয়েছিল বটে, তবে মনের মধ্যে বেড়ানোর মতো বেড়িয়েছে দুর্ভাবনাগুলো। কে করল এমন কাজ? বন্ধুরা কেউ এমন ক্ষতিকর রসিকতা করবে না। জীবনে কারও সঙ্গে কোনদিন কোনও ইনভল্ভমেন্ট ছিল না। তাহলে নিভৃতে কেউ কি... বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রবীণ গাছগুলো তাপসের দুর্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। হাওয়ার বেগ বেড়েছে, কমেছে। তাপস আনমনা। আইসক্রিম গলে হাত বেয়ে কনুই এর কাছে এসেছে। শুচিস্মিতা সযত্নে মুছিয়ে দিয়েছে রুমাল দিয়ে।

রাত্রে অতীত ঘেঁটে তাপস তিনটে মেয়ের নাম মনে করতে পারল। মন্দিরা, মালা আর শিপ্রা। এদের মধ্যে মন্দিরার বিয়ে হয়ে গেছে। শিপ্রার খবর জানা নেই। ব্রহ্মচর্য জীবনের বিচ্যুতি কাঁটায় কাঁটায় পরিমাপ করার জন্য তখন বাবা সক্রিয় ছিল। একসঙ্গে পাঠক্রমকে পরিভ্রমণ করতে করতে কখন সে কক্ষচ্যুত হয়েছিল, তাপস তার আভাস পায়নি। ঘাড় নিচু করে ঘুরতেই ব্যস্ত ছিল। অতএব সন্দেহের তালিকায় একমাত্র মালা। তাপসের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে মালার বাবা নন্দ ঘোষ কবার এসেছিল তাপসের বাবার কাছে। দুর্গাপ্রসাদবাবু নন্দ ঘোষের পরিবারকে তেমন পছন্দ করতেন না। তাছাড়া সমবয়সি বলেও হয়তো তেমন আগ্রহ দেখাননি। তবে কি মেয়ের গোপন প্রেমের

ওকালতি করতে এসেছিল? এসব সাতপাঁচ ভাবল তাপস। তবে মনের দুঃখ এক চিঠিতে শেষ করেছে এবং আজ সে বিবাহিত তাই আর কিছু করবে না নিশ্চয়ই। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে চিঠিটা ছিঁড়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিল। নিশ্চিন্ত!

কিন্তু সত্যিই কি নিশ্চিন্ত হওয়া এত সহজ? তাপস তো দুশ্চিন্তার মধ্যেই পড়ে রইল। অন্তত যতক্ষণ জেগে থাকত বা বিছানায় ঘুমের প্রস্তুতি নিত। প্রেম নিয়ে তার কদিন আগের নড়ে চড়ে ওঠা আইডিয়াগুলো পাত্তা না পেয়ে হারিয়ে যেতে বসল। শুচিস্মিতা আহ্লাদে বিছানা তৈরি করে কোনও কোনও দিন পুলকিত হত। কিন্তু সোহাগের গন্ধ তাপসের নাক বন্ধ বুঝে পাশ কাটাত। তারপর শুচিস্মিতার সঙ্গে আরও মেপে মেপে ব্যবহার করা শুরু করল। তারপর আবার একটা বুধবার এসে হাজির হল। পারও হয়ে গেল। তাপসের মন বলছিল, আজ অফিস কামাই কর। কাজেই লাগল। ঘর দুয়ারে পায়চারি করতে করতে হাল ছাড়ার মুখে চিঠি এল। তাপসের সমস্ত পূর্ব ধ্যানধারণা নস্যাৎ করে চিঠি এল। এবার সারাদিন বারবার চেষ্টা করেও খুলে পড়ার সাহস জোগাড় করে উঠতে পারল না তাপস। কেবল মনে হতে লাগল কেউ যদি দেখে ফেলে। যদি জিজ্ঞাসা করে কার চিঠি। কখনও পড়তে চেষ্টা করে কোনও শব্দ শুনে লুকিয়ে ফেলল। আবার কখনও শুচিস্মিতার গলার আওয়াজে আটকে গেল। না পড়ে ফেলে দেবে এমনটাও চিন্তা করল, আবার কী লেখা আছে দেখার আগ্রহও তাকে ঘিরে ধরল। অবশেষে বিকেলে বাইরে বেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজে শেষমেশ পড়ার সুযোগ করে নিল।

প্রিয়তম তাপস,

সরি, আগের চিঠিতে কড়া কড়া কথা বলার জন্য। আসলে তোমার বিয়ের খবরটা শুনে এত ভেঙে পড়েছিলাম। আজ মেনে নিয়েছি। ভালোবাসা আবার বিবাহিত অবিবাহিত হওয়ার জন্য আটকায় নাকি? আমার কথা ভাবছ নিশ্চয়ই এখন সবসময়? আমিও সারাদিন তোমায় নিয়েই আছি শয়নে স্বপনে। তোমার সঙ্গে গল্প করতে মাঝে মাঝে তোমার স্বপ্নেও ঘুরতে যাব, কেমন? আড়াল থেকে তোমায় ভালোবাসতে বাসতে যেদিন সামনে আসব সেদিন সব বন্ধন ছেড়ে শুধু আমার কাছেই আসতে চাইবে।

ভালো থেকো।

ইতি তোমারই...

তাপস খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ছুটল বৃষ্টির কাছে। বৃষ্টি তাপসের বাল্যবান্ধবী। এই একটু আগে তাপস যখন এদিকে আসছিল তখন বৃষ্টি স্ম্যাশ

করছিল লাফিয়ে উঠে। তাপস এক ঝলক দেখে এসেছে। ক্লাবের মহিলা ভলিবল টিমের সদস্য ও। একেবারে টম বয় ইমেজ। তাপস তাই বৃষ্টিকে একজন যুবতী বলে মনেই করে না। তাপসদের বাড়ির পরেই যে দোতলা বাড়িটা ওটা বৃষ্টিদের। বৃষ্টি তাপসের থেকে বছর তিনেকের ছোটো। তবে তাপসকে কখনও তাপসদা বলে সম্মান সে দেয় না। সেই এতটুকু বয়স থেকে একসঙ্গে বড়ো হতে হতে গাদি ঘোড়েল ইত্যাদি গ্রাম্য খেলা দিয়ে বন্ধুত্ব শুরু। আজকাল খেলার দিন অস্ত গেলেও পরিস্থিতি বিগড়ে গেলে একবার অন্তত পরস্পর শলাপরামর্শ করেই নেয়। এই বিপদের কথা বৃষ্টিকে ভরসা করে বলাই যায়। এতে লিক হবার ভয় নেই তাপস তা ভালোই জানে। তাপসের ডাকাডাকিতে খেলা ছেড়ে বৃষ্টি তার বয়েজকাট চুল হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে এগিয়ে এল। জরুরি দরকার শুনে উৎসাহে ডগমগ হয়ে উঠল। জলদি পা চালিয়ে বৃষ্টিদের বাড়িতে গিয়ে ওপরের ঘরে সামনাসামনি বসল দুজনে। তাপস চিঠিটা বৃষ্টির হাতে দিয়ে কাতর হয়ে পড়ল। "এত বড়ো বদনাম আমি সইতে পারব না বৃষ্টি। জীবনে আমার ইমেজ খারাপ হয়নি। কত ছোটো হয়ে যাব আমি সবার কাছে। তোর বৌদি..."

বৃষ্টি হাঁ করে চিঠিটা অনুধাবন করার চেষ্টা করছিল। তাপসকে মাঝপথে থামিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল, "অমন করিস না প্লিজ। কিচ্ছু হবে না। দরকারে বৌদিকে আমি বোঝাব।"

"কী বোঝাবি? যাই বোঝাস একটা সন্দেহ থেকেই যাবে।"

"বৌদি তো এখনও পড়েনি।"

"আজ পড়েনি, কাল পড়বে। পরশু বাবার হাতে যাবে। আমি কি অফিস-টফিস ইস্তফা দিয়ে রোজ দরজায় দাঁড়িয়ে থাকব নাকি? পথ চেয়ে বসে থাকব কখন পিয়ন আসবে?"

বৃষ্টি গম্ভীর মুখ করে পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করল। "তোর কাউকে সন্দেহ হয়?"

"কাকে সন্দেহ করব! কেই বা লিখবে! কেনই বা লিখবে!" একদমে সবটা বলার পর তাপস শান্ত হলে পরিবেশে নিস্তব্ধতা নেমে এল। দুজনেই এদিক ওদিক চাওয়াচাওয়ি করল। তাপস আবার বলে উঠল, "আচ্ছা মালা মেয়েটাকে তোর কেমন মনে হয়?"

"মালাদি?" বৃষ্টির চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। আমারও যে সন্দেহ হচ্ছিল না, তা নয়। হিংসা! বুঝলি হিংসা! সেদিন বলছিল তাপসের বৌ তো কারও সঙ্গেই মেশে না। অথচ তাপস কত ফ্র্যাঙ্ক।"

তাপস শুকনো মুখে বিষম খেয়ে যাচ্ছিল।

বৃষ্টি চেঁচিয়ে ওঠে, “দেব দু কথা শুনিয়ে?”

“না না। খেপেছিস। না জেনেশুনে? কেলো হয়ে যাবে শেষে কথাটা পাঁচকান হয়ে।”

“আমি কি সেভাবে বলব নাকি? শুধু কথার প্যাঁচে কথাটা বার করার চেষ্টা করব।”

তাপস কিছুটা চিন্তামগ্ন হল। অথচ কিছু একটা পদক্ষেপ তো না নিলেও নয়। সে বৃষ্টির ওপর আস্থা রেখে বলল, “পারবি? কিন্তু খবরদার যেন চিঠির কথা ফাঁস করিস না।”

“তুই দেখই না। আমাকে তো এতদিন দেখছিস!”

তাপস মৃদু সম্মতি জানায়, “দ্যাখ তাহলে, কী করতে পারিস।”

উভয়েরই আর প্রতীক্ষার বিন্দুমাত্র সময় ছিল না। কিছুটা দূরে বাজারে মালার দাদার বাড়ি সংলগ্ন ওষুধের দোকান। বৃষ্টি হনহন করে সেদিকে এগিয়ে গেল। যেন এক্ষুনি রহস্যের সমাধান করে তাপসকে দেখিয়ে দেবে যে সে কেমন সঠিক লোককে দায়িত্ব দিয়েছে।

দোকানে মালার দাদা ছিল না। একজন কর্মচারী মাল গুছোচ্ছিল। একপাশে টুলে বসে মনু মিত্তির টিউবলাইটের আলোয় মন দিয়ে নিউজপেপারে বাসি খবর পড়ে প্রায় শেষ করে ফেলেছিল। বৃষ্টি দৌড়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, “মালাদি আছে?”

এতে মনু মিত্তির চশমার ওপর দিয়ে বৃষ্টিকে একবার অদ্ভুতভাবে পর্যবেক্ষণ করে উঠে গেল।

এদিকে বারোয়ারির বেদিটায় বসে বসে তাপস বৃষ্টির অপেক্ষায় অধৈর্য হচ্ছিল। ওপরে কালো ঘনিয়ে আসা আকাশ বৃষ্টির পূর্বাভাস জানাচ্ছিল। একটা হাওয়া শুরু হয়ে গেছে। দুর্গাপ্রসাদবাবু এই রাস্তা দিয়েই ফিরছিলেন। তাপসকে একা একা বসে থাকতে দেখে কাছে এলেন, “এখানে অন্ধকারে কী করছিস?”

“বৃষ্টি আসবে, তাই।”

“আসবে কি আবার? এসে গেছে।”

“কই?”

“নে নে ছাতাটা ধর। চল।” এক ছাতায় আশ্রয় নিয়ে দুর্গাপ্রসাদবাবু এবার জানতে চাইলেন, “আজ কীসের ছুটি ছিল তোদের?”

“প্রতি বছর অনেকগুলো ক্যাসুয়াল লিভ জমে যায়।”

"তা বলে এমনি এমনি কামাই করবি! এখানে বসে থাকার জন্য। দরকারের সময়..." দুর্গাপ্রসাদবাবুর আর একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছা করছিল, তা হল শুচিস্মিতাকে কী তাপসের পছন্দ নয়। নতুন বউ ফেলে এখানে একা একা ভিজতে বসেছিল তার ছেলে। এটা থেকে এই চিন্তাটাই মাথায় আসছিল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। তবে সেটা মুখ ফুটে তিনি বলতে পারলেন না।

৩

রাতে খাবার পর ঘরে এসে শুচিস্মিতা তাপসের কোলের কাছে মাথা রেখে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি কিছু খুঁজছ? কদিন কেমন ব্যস্ত দেখছি।"
তাপস তখন ভাবছিল, বৃষ্টি কী উদ্ধার করতে পারল কে জানে। এসে দেখতে পাবে না আবার। বাবাটা এমন এমন সময়ে এসে পড়ে। শুচিস্মিতার কথার ঘোর কাটিয়ে বলল, "তেমন কিছু না। অফিসিয়াল প্রবলেম।"

"বাইরের জিনিস বাইরেই রেখে আসতে হয়। ঘরে বয়ে আনতে নেই।" শুচিস্মিতা তাপসের রোমশ হাতে গাল ঘষতে ঘষতে এবার প্রসঙ্গ বদলে ফেলল, "খোঁজার কথায় মনে পড়ে গেল। আচ্ছা বউ খুঁজেছ কোনওদিন?"

"না আমার চেনাশোনা কারুর বউ হারায়নি কখনও।"

"সে খোঁজার কথা বলছি না। কারও মধ্যে নিজের মনের কাউকে খুঁজেছ কখনও?"

"দরকার কী? না খুঁজেই তো তোমাকে পেয়েছি।"

"উঁহু! না খুঁজে কিছুই পাওয়া যায় না। যা মেলে তা একটা আকৃতি। সেটা যে কিছুদিনের মধ্যেই পুরোনো হয়ে যাবে।"

রাত বাড়ছিল। তাপসের ঘুম আসছিল না। চোখ বুঝলেই দেখতে পাচ্ছিল একজন বিকটদর্শন ভাস্কর কোমল একটা স্বপ্নের পাহাড়ের গায়ে র‍্যাঁদা ঠুকে ঠুকে কার যেন মূর্তি তৈরি করে চলেছে। তাপসের কষ্ট হচ্ছিল পাহাড়টার আঘাত লাগছে বলে। আর তখনই ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। তাপস আস্তে আস্তে উঠে জানলার কাছে গেল। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাটা ভিজে মেঘের ন্যাতাতে মুছে ফেলার পর যেটুকু মাটিতে লেগেছিল তাতে বেশ দেখা যায়। কার ডাকে সাড়া দিয়ে রজনীগন্ধারা বর্ষা বাদল উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে। তাপস ভাবছিল শুচিস্মিতার কথাটা। 'না খুঁজে কিছুই পাওয়া যায় না।'

তাপস একটু দার্শনিকভাবে নিল কথাটা। সত্যিই কি ভালোবাসা খোঁজা বলে কিছু হয়? কিছু পাওয়া যায়? তাছাড়া খোঁজার কী আছে শুনি। উচ্চফলনশীল আনুগত্য? রাশিরাশি তাই বয়ে নিয়ে যাওয়া মাঠ থেকে খামারে। প্রতিদিনের অভিনয়ের টক ঝাল মিষ্টি খাবারগুলো বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তা থেকেই তৈরি। তাপস মাথাটা আর একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কতটা মেঘ আছে আকাশে বোঝার চেষ্টা করে। তাপসের হঠাৎ মনে হয় রজনীগন্ধারা যেন মেঘের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্র খুঁজতে দাঁড়িয়ে আছে। একজন অপরকে বোঝাতে চাইছে কোথায় ছিল তারাটা। অপরজন আঙুল তুলে নির্দেশ করছে – কোথায় ছিল? ওইখানে?

তাপস প্রকৃতি থেকে বিষয়ে ফিরে আসে। এ চিন্তার কোনও অভিমুখ নেই। কোথাও কিছু আছে, ভগবানের মতো বা ভূতের মতো। যা দেখা যায় না। মেনে নিতে হয়। সবটাই বিশ্বাসের অবিশ্বাসের প্রশ্ন। যেটাকে আপন করে নেবে। তার চেয়ে এই বেশ ভালো। যাকে বলে মোটামুটি থাকা।

ঘুমের তাগাদায় তাপস বিছানায় ফেরে। ডিমলাইটের মিহি আলোয় অস্পষ্ট শুচিস্মিতা।

সকাল হতেই তাপসের চিঠি নিয়ে আবার টেনশন শুরু হয়েছে। বিছানায় বসে বসে তাই ভাবছিল যে দরকার মতো মেডিকেল সার্টিফিকেট দেখিয়ে দেবে টাকা দিয়ে কিনে। আগে অফিস থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে এদিকটা পুরোপুরি সামলে নিতে হবে।

এ সময় যমুনা ঘরে ঝুল ঝাড়ার কাজে ব্যস্ত ছিল। যমুনাকে দেখতে দেখতে তাপস প্ল্যান বদলে ফেলল। যমুনাকে ডেকে সে বলল, 'এই যমুনা তোকে দশ টাকা দেব।' "পরে দেবেন। একমাসে খরচ করে ফেলব।"

এমন দুর্বোধ্য জবাব শুনে তাপস বিরক্ত হয়ে বলল, "কেন রে। পরে নিলে কি তারপর মাস আসা বন্ধ হয়ে যাবে? কেন টাকাটা দেব বল তো?"

"মেলা দেখার টাকা।"

"না। মেলার টাকা মেলার সময় পাবি। এখন তোকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।"

কাজের কথায় যমুনা দুপায়ে সমান ভর দিয়ে দাঁড়াল। তাপস স্বর নামিয়ে বলল, "এবার থেকে এ বাড়িতে পিয়ন এলেই সব চিঠি তুই নিয়ে নিবি। তারপর সোজা আমায় এনে দিবি। অন্য কারও কাছে যেন না যায়। পারবি?"

"আপনি যদি আপিসে থাকেন।"

"তাহলে লুকিয়ে রেখে আমি সন্ধ্যেবেলা ফিরে এলে দিবি। সারাদিনই তো থাকিস, এখন থেকে না হয় আমি আসা অবধি অপেক্ষা করবি।"

তাপস দশ টাকা যমুনার হাতে দেয়। "যদি ঠিকঠাক পারিস তবে আরও দশ টাকা পাবি। বুঝলি? কেউ যেন জানতে না পারে। তোর বৌদিও না। যদি কেউ দেখে জিজ্ঞাসা করে তবে বলবি... উম... কী বলবি?"

"বলব... এটা আপনাদের চিঠি নয়।"

"ব্যস, তাহলেই হয়েছে। আমাদের চিঠি নয়তো কি পাশের বাড়ির চিঠি এ বাড়িতে দিয়ে যাবে?"

ধমক খেয়ে যমুনা চুপ করে যায়।

"শোন, কিছু বলার দরকার নেই। বরং বাড়িতে ঢোকার আগে দোরগোড়া থেকে নিয়ে নিবি লক্ষ রেখে। পারবি তো?"

এবার যমুনা মস্ত করে ঘাড় হেলায়।

"আর হ্যাঁ। বাই চান্স অন্য কেউ চিঠি নিয়েও নেয় তবে মোটেই তাকে পড়তে দিবি না। যে করেই হোক ব্যস্ত করে চিঠি হাতানো চাই!"

তাপস যমুনার ওপর কতটা ভরসা করেছিল তা সেই জানে। বাছবিচার না করে তাপস সবাইকে শুনত, কোনটা নেওয়ার কোনটা না নেওয়ার সেটারও কোনও মাপকাঠি ছিল না। এই যেমন অফিসের রঞ্জনদা। তার বাকচাতুর্যে তাপস এমনিতেই মুগ্ধ ছিল। তার যুক্তি যে কার্যকর হবে তাপস অফিসে এসেই টের পেতে শুরু করল। ট্রেনে আসতে আসতেই তাপস ভেবেছে বিষয়টা নিয়ে বড্ড ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে। সকালে অফিস আসার সময় বৃষ্টির কাছে গেল। বেরিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই মালাকে নিয়ে পড়েছে। সবাইকে এইভাবে ঝামেলায় না ফেলে রঞ্জনদার মতো ইন্টালিজেন্ট কারও সঙ্গে আলোচনা করা দরকার ছিল। দূরের লোক, যাতে কোনওদিন সিঙ্গুরের ধারে কাছেও কথাটা না পৌঁছয়। তা নয়... একে ওকে জড়িয়ে গোলমাল করে ফেলছে। বিপদের সময়ে যেখানে বুদ্ধি বেশি ধরা দরকার... আদতে, অকারণ বুদ্ধিনাশ হচ্ছে।

সমস্যা এই যে, এত বড়ো কথাটা রঞ্জনদার কাছে তোলা কম চাপের নয়। শুনেই যদি জোরালো সওয়াল করতে আরম্ভ করে। যদি অকাট্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দেয় যে, সে প্রেম না করেও প্রকারান্তরে অজান্তে প্রেম করেই ফেলেছিল। অনেকটা ছোটোবেলায় নিশিরাতে বিছানায় হিসি করে ফেলে সকালে ভিজে চাদর দেখে মানতে না চাওয়ার মতো। কিন্তু ভালোবাসা বলে কথা। বিশ্বব্যাপী তার হাঁকডাক। সে কী এমন করে অজান্তে হয়। অফিসে এসেই শুনেছে রঞ্জনদার সঙ্গে বীরেনবাবুর বিতর্ক। বীরেনবাবু বয়স্ক

লোক, কোন একটা কাগজে পাত্রপাত্রী বিজ্ঞাপনে কী দেখেছেন তাই নিয়ে চেঁচাচ্ছিলেন। বিয়েটা এখন একপ্রকার ফাজলামি হয়ে গেছে। ওঁদের সময় ভীষণ দায়িত্ববোধ ছিল।

বিজ্ঞাপনটা নিম্নরূপ।

পাত্র – এম এস সি। কে স চা। বর্গ ক্ষত্রিয়, আটাশ, পাঁচ নয়, গৌরবর্ণ।
পদ – বধূ (হোমমেকার)
বয়সসীমা – অনুর্দ্ধ পঁচিশ।
মাসিক ভাতা – পাত্রের আয়ের কুড়ি শতাংশ। তৎসহ থাকা, খাওয়া, অন্যান্য সুবিধা।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা – কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও কমসে কম তিন বছর লোকজন জানে এমনভাবে প্রেম করার অভিজ্ঞতা।
আশীর্বাদের দিন পুরোনো প্রেমিকের/ প্রেমিকদের নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট দাখিল আবশ্যক। সম্পূর্ণ বায়োডাটা ও ছবি সহ আবেদন করুন – পোস্ট বক্স নং...

বীরেনবাবুর বক্তব্য - ডেঁপোমি। রঞ্জনদার বক্তব্য ছেলেটা লুকোছাপা না করে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কের গোড়ার কথাটা সোজাসুজি বলে দিয়েছে। তাপসের অনেক কিছু বলার ছিল, তাই ঝগড়া থামিয়ে একটু ফাঁক খুঁজছিল সে।

কিন্তু তাপস ঘুণাক্ষরেও জানত না, ওদিকে তার ও বৃষ্টির চক্ষুকর্ণের আড়ালে কোন পথে এগিয়ে চলেছে তাদের গল্প। খটকার শুরুটা খুবই সামান্য। স্থানীয় মহামায়া স্কুলে বাংলার মাস্টার দুর্গাপ্রসাদবাবু। অবসর এগিয়ে আসছে। মনটা আজ এমনিতেই ভালো ছিল না। ক্লাসে ব্যাকরণ পড়াতে পড়াতে শব্দটা বললেন 'শীতকাল' খাতা দেখতে গিয়ে দেখলেন সেকেন্ড বেঞ্চের একটি ছেলে লিখেছে 'শীৎকার'। রেগে শাসন করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যদি রাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে হয়, এই ভেবে আটকে গেলেন। তার এই চাপা রাগ বিকেলে উসকে দিল মনু মিত্তির। রোজকার মতো শিব মন্দিরের দালানে রাজনীতি নিয়ে চর্বিতচর্বণ চলছিল। মনু মিত্তির বিষয় নিয়ে এলেন – 'জেনারেশনটা একেবারে উচ্ছন্নে যাচ্ছে'। বললেন, "জানো হে দুর্গা। ঐ যে তোমার পাশের বাড়ি। কী যেন নাম মেয়েটার। ভলিবল খেলে বেড়ায়।"
"বৃষ্টি?"
"হ্যাঁ কাল ঘোষের ওষুধের দোকানে বসে আছি। বড়ো ছোটো মানামানি নেই। আমার সামনে দোকানে এসে বলে কিনা মালা ডি আছে। কুমারী মেয়ে, বোঝো একবার... তার দরকার গর্ভনিরোধক ট্যাবলেট...। আজকাল বাপমায়েরা হাওয়ায় ভাসিয়ে দেবে ... আর ওই সব ..."

“বেপরোয়া হয়ে গেছে একধার থেকে। তার কিবা কুমারী কিবা বিবাহিত।” মনু মিত্তির একজনের সমর্থন পেল।

বৃষ্টি সবচেয়ে বেশি মেলামেশা করে ও করে এসেছে তাপসের সঙ্গে, তাই দুর্গাপ্রসাদবাবু মনে হল কথাগুলো যেন তাকেই উদ্দেশ্য করা হচ্ছে। কাল তাপসকে একা একা আনমনে বসে থাকতে দেখার পর ভাবগতিক তার ভালো লাগেনি। সব মিলিয়ে বিস্তর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি কখনও তাপসকে বকেননি, বারণ করেননি, শাসন করেননি। কোথা থেকে উনি শুনেছিলেন যে, প্রত্যেকের পরিবেশ অনুযায়ী ভালো-মন্দের সীমারেখাটা তৈরি হয়েই যায়। গুরুজনেরা শুধু লক্ষ রাখবে সীমা লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা। মানুষ যে যে কাজ করতে অপরাধবোধে ভোগে, সেগুলোই লুকিয়ে করার চেষ্টা করে। এইবার লুকিয়েও যদি তার মনে হয় যে আসলে সে চোখের সামনেই আছে তাহলে বড়ো খারাপের মধ্যে একটা বড়ো রকমের বিভাজন করে যেগুলো ভালো বলে মনে করবে সেগুলো সামনাসামনি করার সাহস জোগাড় করবে। আর খারাপগুলো একদম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এই জন্যই তিনি চিরকাল কেবল পিছু নিয়েছেন। সেই পর্যবেক্ষণের কঠোর সাধনায় এমন ঘরোয়া ফাঁকি রয়ে গেছে ঘরের পাশেই, এটা যেমন মেনে নিতে পারছিলেন না। তেমনই মনু মিত্তিরের কথা ও নিজের ভাবনাটাকেও উড়িয়ে দিতে পারছিলেন না।

৪

এই সময় তাপস কলকাতার বাসে। লোকে ভিড়ের মধ্যে ঠেসে চেপে তাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল বটে, কিন্তু মাথাটা তার গুলিয়ে ছিল। রঞ্জনদা বলেছে, মালা নয় প্রধান সন্দেহের লোক বৃষ্টি। তাপসের কোনও প্রতিবাদই গ্রাহ্য হয়নি। “কৈশোরের সাইলেন্ট লাভ। সাহিত্যে কত আছে। শরৎবাবুর গল্পে পড়িসনি। পার্বতী টু রাজলক্ষ্মী কে নয়? চেপেচুপে ধর, বুক ফেটে ভেতরের কথা বেরিয়ে আসবে।”

কথাগুলো গুরুমস্তিস্ক থেকে লঘু মস্তিষ্কে স্লোগান দিতে দিতে যাতায়াত করছিল। তাপস মনে করার চেষ্টা করছিল সেই ছোট্ট তাপস আর বেবি বৃষ্টি। একজন না এলে অন্যজন দুধ খেত না। তাপস আদরবশত পাঁজাকোলা করে কোলে তোলার চেষ্টা করলে বৃষ্টি অনুরাগে তাপসের জামাকাপড় ভিজিয়ে দিত। তাপসের ভাবতে ভাবতে হাসি পেয়ে গেল। সাহিত্যেও এসব আছে! হাওড়া স্টেশন থেকে তাপস একটা সাহিত্য পত্রিকা

কিনে নিল। আগে আগে এসে পড়ায় তারকেশ্বর লোকালে আজ বসার জায়গা পাওয়া গেছে। ট্রেন চলতে শুরু করল। একটার পর একটা স্টেশন আসছিল ট্রেনে যাত্রীদের ওঠানামা সজ্জা বদল। উত্তরপাড়া থেকে লীনা উঠল। তাপসকে দেখতে পেয়ে 'তাপসদা!' বলে এগিয়ে এল। লীনা শুচিস্মিতার বেস্ট ফ্রেন্ড। ভগবানের কাছে নাকি কামনা করেছিল দুজনের যেন একজায়গায় বিয়ে হয়। বিয়ের সময় তাপস একথা শুনে একটু অন্যরকম বুঝে ভয় পেয়ে গেছিল। তাপস জানত না, ভগবান হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট জানে। তাই তিনি ভক্তদের কিছুটা স্থানগত নৈকট্য দিয়ে সন্তুষ্ট করেছেন। শ্রীরামপুরে ওর শ্বশুরবাড়ি। বেজায় চটপটে, বলা ভালো, ফটফটে মেয়ে। কুশলবিনিময়সূচক একগাদা প্রশ্ন করল এক নিঃশ্বাসে। তাপস এক উত্তরে জানাল, "ভালো।" নানা রকম অভিযোগ করল, কেন ওর বাড়ি যাওয়া হয় না। তারপর শ্রীরামপুর এলে ঠেলাঠেলি করতে করতে নেমে গেল।

সিঙ্গুরে এসে তাপস দেখল ঘড়িতে সবে সাড়ে ছটা। বৃষ্টিদের বাড়ি একবার ঘুরে আসার একটা তাগিদ অনুভব করছিল। বৃষ্টি কতটা কী উদ্ধার করতে পারল, সেটা যেমন জানার ইচ্ছা ছিল। তেমনই নিজের একটা অনেক দিনের বিশ্বাস অন্যের কথায় ধাক্কা খাওয়াতে মন তাকে ওই দিকেই ঠেলছিল।

বৃষ্টি ঘরে ছিল না। টেবিলের ওপর একটা খাতা রয়েছে। অবস্থাটা তাপসের একটা দারুণ সুযোগ মনে হল। বহুদিন হয়ে গেল বৃষ্টির লেখা সামনাসামনি দেখিনি। হাতের লেখাটা ঠিক মনেও নেই। কী বুদ্ধি রঞ্জনদার! এতদিনের পরিচিত মেয়ে তাকে কি ওইভাবে বলা যায়। কী ভাববে। জন্মের মতো রিলেশনটা খতম হয়ে যাবে। মুখে কিছু বলার চেয়ে এমনভাবে নিশ্চিত হওয়া অনেক নিরাপদ। তাপস টেবিলের কাছে গিয়ে টেবিলের দিকটায় পিছন করে দরজার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে খাতাটার একটা পাতা ছিঁড়ে সন্তর্পণে পকেটে ঢোকাতে যায়...

এমন সময় "অ্যাঁ... আমার খাতা ছিঁড়ে দিল।" বৃষ্টির খুড়তুতো ভাইটা কাঁদতে লাগল। পুঁচকেটা ঘরের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ছিল তাপস দেখতে পায়নি।

"এই চুপ!" তাপস বাচ্চাটাকে থামাতে চাইছিল।

"আমার হোমওয়ার্কের খাতা। দাঁড়াও দিদিভাইকে বলছি।"

"নাও ঠেলা। শোন সোনা..." যথাসম্ভব লোভ দেখিয়ে, অনুরূপ একটা খাতা কিনে দেবার অঙ্গীকার করতে করতে বৃষ্টির ঘরে এসে হাজির হল। এসেই একটা ম্যাড়ম্যাড়ে লম্বা খাতা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এই নে।"

তাপস লজ্জায় মাথা তুলতে পারছিল না। অপরের কথায় নেচে এ কী করে বসল সে। এবার কী বলবে? তাপসের ভেতরটা ভারী হয়ে আসছিল। একজন কেউ এসে

গিয়ে এ অবস্থা থেকে তাকে রক্ষা করবে এমন আশা করার ক্ষমতাটাও আস্তে আস্তে লোপ পাচ্ছিল।

"কী রে, নে?"

"না, মানে, আমি ঠিক সে ভেবে।"

"কী ভেবে?"

"ভেবে মানে এমনি..."

"কী এমনি?"

"এমনি মানে তোকে আমি..."

"কী উলটো পালটা বকছিস! নে ধর।"

তাপসের হাত সরছিল না। বৃষ্টি কি তবে কিছু মনে করেনি? রঞ্জনদার কথাই কি ঠিক? কিন্তু কোন মুখে সে এখন খাতাটা নেবে? সত্যি সত্যি যদি রঞ্জনদার অনুমান মতো চোখ ভিজিয়ে ভেতরের কথা মুখে নিয়ে আসে। সে কঠিন পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেবে? 'আমি সরি বৃষ্টি। বুঝতে পারিনি।' বললে কি চলবে?

"কী ভাবছিস?" বৃষ্টি ঠোঁটে গর্বে হাসি ফুটিয়ে তোলে। "অনেক অনুসন্ধান করে জোগাড় করেছি। ওর এক জুনিয়ারকে দিয়েছিল। কোশ্চেন অ্যানসার খাতা।"

"কার জুনিয়ার?"

"মালাদির। আবার কার? চল হাতের লেখাটা মিলিয়ে দেখি চিঠির সঙ্গে।"

তাপস ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের করে দিল। তাপস আগের মুহূর্তটাকে, ভাবনাগুলোকে কচ্ছপের মতো খোলসের মধ্যে পুরে নিতে চাইছিল। হাতের লেখা মেলানোর কাজে মনোযোগ বসানো তার পক্ষে শক্ত ছিল।

"নিজে লেখেনি বুঝলি। কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে। হাতে পাওয়ার পরই মনে হয়েছিল কাল যা দেখিয়েছিলি তার মতো নয়।"

তাপস বৃষ্টির কথায় লেখাটায় একঝলক চোখ বুলিয়ে নিল। বৃষ্টি বলল, "একটা কথা বলব তোকে।"

"কী?"

"মালাদি মনে হয় এ কাজ করেনি। তুই তো ওর সাথে কখনও পার্কে গিয়ে গল্প করিসনি। প্রপোজও করিসনি। আরও বড়ো ব্যাপার হল লিখলই যখন, বিয়ের আগে লিখল না কেন। আমার মনে হয় তোর সঙ্গে কেউ ইয়ার্কি করছে। কেউ কেউ আছে না যাদের কিছুতেই কিছু এসে যায় না। তাদের কাছে নিজের প্রেমিক প্রেমিকা কী করেছে বা করে বেড়াচ্ছে সম্পর্কের মধ্যে এসবের কোনও মানেই থাকে না। তখন নিজেরাও লাইফে

এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার নিয়ে হাসাহাসি করে। কাছের লোকজনদের সাথেও এসব নিয়ে খেলতে চায়। তোর অফিসে এমন কে একজন আছে না? বউয়ের এক্স হাসব্যান্ড-এর সঙ্গে একটা ফ্ল্যাট শেয়ার করে।"

"রঞ্জনদা?"

তাপসের ভেতর থেকে শব্দটা বেরিয়ে এসে গোটা ঘরটাকে কেমন রহস্যময় করে দিল। এও কি সম্ভব? আবার অসম্ভবও তো নয়। এর ওর পিছনে লাগা ওর স্বভাবের বেশি পরিমাণেই আছে। কথায় কথায় নিজের মতটাই ঠিক, তা জাহির করে। এখন তাপসের সংসারে গোলমাল পাকিয়ে কিছু একটা থিওরি আওড়াবে। কিন্তু ও-ই যে করেছে কাজটা, সেটা তাপস নিশ্চিত হবে কী করে?

বৃষ্টি বোধ হয় তাপসকে বুঝতে পারছিল। সে সেই সূত্র ধরে বলল, "তুই কাজের ফাঁকে ওকে দিয়ে দু-চার লাইন বাংলা লিখিয়ে নিতে পারবি?"

একথা শুনে তাপস বৃষ্টির দিকে এক পলক ফেলেই দৃষ্টিটা লুকিয়ে নিল।

বাড়িতে ঢুকতেই যমুনা চুপিচুপি জানিয়ে দিয়ে গেল পিয়ন আসেনি। বাবা কয়েকটা কথা বলে গেল ইলেকট্রিক বিল দিতে যাওয়া নিয়ে। বাবার ব্যবহারটা তাপসের একটু অস্বাভাবিক লাগল। এ্যাদ্দিন বিল বাবাই জমা দিয়ে আসত। এবার বললেন, "দায়িত্ববোধটা সময়ের সঙ্গে বদলায়। বিয়েটা মাত্র তিনদিনব্যাপী হলেও সময়ের বদলটা অনেক লম্বা।" তাপস আসল কারণটা জানে না, তাই ভাবল তার দেখাটাই স্বাভাবিকত্ব হারিয়েছে। ঘরে গিয়ে তাপস শুচিস্মিতাকে সামনে পেয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। এ নজর নবীন। দেখাটাও পূর্বনির্ধারিত নয়।

পরদিন তাপসের অফিস যাওয়ার টেনশনের ওজন বেড়ে গেল। বাড়িতে চিঠি নিয়ে কী হয়ে যাবে, তা নিয়ে চিন্তা তো ছিলই। এবার থেকে অফিসে গিয়ে রঞ্জনদাকে সন্দেহ করার মানসিক ধকল নিতে হবে।

আজ বীরেনবাবু কী নিয়ে শোরগোল করছেন কে জানে। তাপস নিজের জায়গাটা দখল করতেই বললেন, "বাদলের ঘটনাটা শুনেছ?" বাদল তাপসের সেকশনের সহকর্মী। তাপস পালটা প্রশ্ন করল, "কদিন আসছে না কেন?"

"কী করে আসবে! গরম হাতার ঘা মাথায় খেল। চোখের সামনে জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল। আর অফিস আসার অবস্থা থাকে!"

"চোরে না ডাকাতে?"

"কোন যুগে আছ? চোরও নয়, ডাকাতও নয়, আপন সহধর্মিণী। বিয়ের আগে কার সাথে কী ছিল। প্রথমে এই নিয়ে খুঁটিনাটি, পরে চরমে উঠে পরশু রাঁধতে রাঁধতে গরম ডালের হাতা স্বামীর মাথায় মেরে পুরোনো প্রেমিকের সাথে হাওয়া।"

তাপস কেসটা শুনে ঘাবড়ে গেল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হাতা ও হাতির একসাথে হওয়া সে শুনে থাকলেও এদের আলাদা করে ব্যবহার হতে শোনেনি। ভাগ্যিস দ্বিতীয়টা ব্যবহার করেনি!

বীরেনবাবু মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "এবার বোঝ আজকালকার মেয়ে বিয়ে করার ফল।"

"কিন্তু বীরেনদা, কালকের মেয়ে কী করে বিয়ে করবে? তারা তো মাসিমা কাকিমা হয়ে গেছে।" রঞ্জনদার মন্তব্যে হাসির রোল উঠল।

"হাসাহাসি কোরো না। বেচারার বাজারের খাবার সহ্য হয় না। আজ আসার পথে দেখে এলাম বঁটি নিয়ে বসে বেগুনের খোসা ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।"

"দরকারের বিয়ে করলে এমনিই হবে। মিষ্টি করে কথা না বলতে পারিস অন্তত শরীরটা ফিটফাট রাখ। অমন মোটা পেট নিয়ে সামনে ঘুরঘুর করলে বৌ তো মডেল বা ফিল্মস্টারদের দেখে লটপট করবেই। সঙ্গে আছে কথায় কথায় দোষ ধরা। যেন নিজে কত নিখুঁত। এরপর কেউ একটু ইন্টারেস্ট, একটু সহানুভূতি দেখালে ঝুলে পড়বে এ আর বেশি কথা কী।"

বীরেনবাবু এবার রেগে গেলেন, "মানে তুমি বলতে চাও আদর্শ বলে কিছু নেই। সম্পর্ক মানে একটা খেলা? আমাদের সময় একসাথে কাটিয়েছে লোকে। যত সমস্যা তোমাদের আজকের জেনারেশনের।"

"তাদের অন্য উপায় ছিল না হয়তো। আজ পায়ের তলার মাটি শক্ত হয়েছে। মানুষ জীবনের দামও বুঝতে শিখেছে। আজ মন বুদ্ধি সদিচ্ছা একসঙ্গে না থাকলে সম্পর্ক টেকা মুশকিল।"

রিসেপশনিস্ট মনোরমা নন্দী এ যাবৎ নীরবে শুনছিল, হালে পানি পেয়ে আচমকা বলে উঠল, "এজন্যই বলে সত্যনারায়ণের সিন্নি আর বাড়ির গিন্নি কখনও পায়ে ফেলতে নেই। দুটোই সমান অমঙ্গলের।"

টিফিন আওয়ারে রঞ্জন তাপসকে দেখে মুচকি হেসে বলল, "কীরে তোর ল্যাংটাবেলার সখী কিছু স্বীকার করল? না করলে, বলি কী ওই নিয়ে মাথাব্যথা করে লাভ নেই। একটা চিঠি দুটো মানুষের আত্মিক বন্ধনের নিরিখে নিতান্তই নগণ্য। দেখবি এত দুশ্চিন্তা করছিস যা নিয়ে, তা হাতে পেয়ে তোর মিসেস হয়তো পাত্তাই দিল না।"

"সে তোমাদের কলকাতা শহর হলে এত ভাবতাম না। ষাট সত্তর কিলোমিটার দূরে আধা গ্রাম আধা শহর। কনজারভেটিভ ফ্যামিলি। আমার বাবাকে তো চেনো না। সব কাজে লক্ষ রাখে। কী থেকে কী হয়ে যাবে।"

কথাগুলো বলতে বলতে তাপস বৃষ্টির সূত্র খাটিয়ে রঞ্জনকে মনে মনে কয়েকবার মেপে নিল। অবশ্য হাতের লেখা পরীক্ষা নেওয়ার বুদ্ধি সে ব্যবহার করল না। কারণ এই নিয়ে বৃষ্টির বাড়িতে যে মানসিক ধকল হয়েছিল তা এখনও সামলে উঠতে পারেনি। তাপস নিজেকে বোঝাল, আজ বরং থাক।

৫

দৈনিক বাড়ি ফিরে তাপস চোখ কান নিয়ে ঝামেলার কোনও খবর মালুম করে ওঠার চেষ্টা করতে করতে নিজেকে তৈরি করে নেয়। তেমন সংবাদ না পেলে অল্প আরাম পায়। একরকম আমেজ আসে। কিছুটা রসদ জড়ো হয় প্রাণে। নিজের খুচরো চাহিদাগুলোকে আর শুচিস্মিতাকে আদর দিতে ইচ্ছে গজায়। বাইরের ঘরে সাইকেলটা স্ট্যান্ড দিয়ে কেরিয়ার থেকে অফিস ব্যাগটা হাতে নিচ্ছিল তাপস। আজ রাস্তায় একবার সাইকেলের চেন পড়েছিল। লাগাতে গিয়ে হাতে কালি লেগেছে। যমুনা দৌড়ে এসে বলল, "বড়োবাবু চিঠি পড়ে নিয়েছেন। অনেক করেও আটকাতে পারলাম না। কী করব, আমায় পিয়ন চিঠিটা দিল না যে।"

"ঠিক আছে। তুই যা।"

কিন্তু যমুনা যাওয়ার পর পরই তাপসের চোখমুখ অন্ধকার হয়ে গেল। এবার কী হবে? সে কোনও রকমে ঘরে এসে খাটের ওপর বসে পড়ল।

'গোপন কথাটি রবে না গোপনে...' এফ এমের গানের রেশ ধরে শুচিস্মিতা গুনগুন করছিল। তাপস ঘরে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেল। এত গান থাকতে এ গান কেন শুচিস্মিতার গলায়? বাবা কিছু বলে বসেনি তো। না বাবা তা করবে না। তবে কি নিজেই কিছু আঁচ করেছে। ব্যাগ থেকে ফাঁকা টিফিন বক্সটা আর পত্রিকাটা বের করে তাপস টেবিলে রাখল। শুচিস্মিতা তাপসের সাহিত্যে আগ্রহ দেখে হাসল, না অবাক হল বোঝা গেল না। সে পত্রিকাটা নিয়ে উলটো দিকে ফিরে শুলো। সাবান হাতে নিয়ে বারান্দা দিয়ে কুয়োতলার দিকে হাঁটতে হাঁটতে তাপসের মনে পড়ল সেই ক্লাস নাইনের ঘটনাটা। তখন একবার কাচতে গিয়ে মা প্যান্টের পকেট থেকে একটা বিড়ি পেয়েছিল। বাবা আসতেই 'তোমার ছেলে বিড়ি খেতে শিখেছে' বলে কী অশান্তিই না শুরু করেছিল।

বাবা বলেছিল, "আমি দোকান থেকে কিনে মাঠে কৃষাণদের দিতে পাঠিয়েছিলাম, তারই একটা রয়ে গেছে হয়তো।" বাবা মিথ্যে বলেছিল মাকে ঠান্ডা করতে। আসলে মিহিরের বিড়ি নিজের পকেটে জায়গা ছিল না, তাই রাখতে দিয়েছিল। একটা থেকে গিয়েছিল টের পাওয়া যায়নি। 'আমার ছেলে বিড়ি খেতে পারে না' বাবা একথাও বলেছিল মাকে। এতোটাই বিশ্বাস করত। আজ চিঠিটা পাওয়ার পর বাবা কি আর তেমনভাবে বিশ্বাস করবে যে আমার ছেলে পরকীয়া করতে পারে না। বাবার ঘরটা টপকে যেতে যেতে বাবার উত্তেজিত গলা শুনে তাপস আনমনা হয়ে থামে ধাক্কা খেল। নাকের হাড়টায় খুব জোরে লেগেছিল। যন্ত্রণায় হাত দিয়ে চেপে ধরায় হাতের কালিটা নাকে লাগল। তাপসকে কেমন দেখতে লাগছিল বলে বোঝানো যাবে না। তার মানসিক অবস্থার বাহ্যিক প্রতিরূপ বললে আবার তার মনের দুরবস্থাকে কমিয়ে বলা হবে। নাকটা দেখতে দেখতে ফুলে উঠল। তাপস হাতের মুখের জল মুছতে মুছতে ঘরে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। নিজের মূর্তিতে তোয়ালে ঘষে তাকে স্বাভাবিক করার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। এমন সময় বাইরে মালার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "মাসিমা!"

তাপস চমকে উঠল, মালা এসময় কী মনে করে!

"মেসোমশাই আজ দোকানে গিয়েছিলেন। মাসিমার ওষুধটা তখন মজুত ছিল না। এদিকেই আসছিলাম তাই দাদা বলল, যাচ্ছিস যখন দিয়ে আসিস।"

মালা এসেছে হোম সার্ভিস দিতে! নাকি পরিস্থিতিটা কেমন খতিয়ে দেখে যেতে। বৃষ্টি খাতা দেখিয়ে যতই বলুক হাতের লেখা মিলছে না, তাপসের সন্দেহের খাতা থেকে তার নাম এখনও কাটা যায়নি। সেই ক্লাস ইলেভেনে চাঁপাফুল দেবার ঘটনাটা ভোলার নয়। চিঠি পেয়ে প্রাথমিক সন্দেহ তার মালার ওপরেই হয়েছিল। তাপস তাই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা খতিয়ে দেখতে এগোল।

দুর্গাপ্রসাদবাবু ওষুধের শিশিটা নিয়ে মালাকে মৃদু কৃতজ্ঞতা জানালেন। বিয়েতে নিমন্ত্রিত মালাকে শুচিস্মিতা দেখেছিল। তাপসের সহপাঠিনী এটাও শুনেছিল। সে এগিয়ে এসে, 'এসেছ যখন একটু বসে যাও' বলে মালাকে ঘরে ডাকল। মালার সামনে তাপস সেই দিনগুলোতে ফিটফাটভাবে নিজেকে হাজির করেছে প্রতিবার। বলা ভালো, তাপসের সাজগোজের প্রথমপাঠ সুজয়বাবুর ফিজিক্স ব্যাচের মালার জন্যই শেখা। মালার সামনে কালিমাখা ফোলা নাক নিয়ে তাপস আচ্ছা অস্বাচ্ছন্দে ভুগতে লাগল। মালাকে ঘরে বসিয়ে, "একটু বসো, এক মিনিট আসছি।" এই বলে শুচিস্মিতা রান্না ঘরের দিকে এগোতে তাপস মালাকে ভদ্রতার সঙ্গ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে সামনাসামনি এল। "হ্যাঁ, তারপর বলো কী খবর।" এইটুকু বলেই নাকের চিন্তা মাথায় আসতে নাকে রুমাল চাপা দিল ঢাকা দিতে। মালা হড়হড় করে অনেক কিছু বলবে এমন উদ্যোগ নিচ্ছিল,

হঠাৎ তাপসকে নাকে রুমাল চাপা দিতে দেখে মিইয়ে গেল। কিছু আর বলতে পারল না। ড্রেসিং টেবিলে রাখা সেন্ট আর ডিওড্রেন্টের দিকে তাকিয়ে মুখটা থমথমে করে বসে রইল। আজ স্নান করা হয়নি, তাতেই কি? মালা মুখটা শরীরের কাছাকাছি এনে নিজেকে শোঁকার চেষ্টা করল দু-একবার। তাপস নাক থেকে রুমাল সরানোর নাম নিচ্ছে না দেখে মালা ভেতরে ভেতরে অপমান বোধ করল। এবং আরও অপমান না বাড়িয়ে, "আমি যাই বুঝলি? একটু কাজ আছে।" এইসব বলে তাপসকে আর কোনও সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল জলদি পায়ে। শুচিস্মিতা একটা ডিশ আর গ্লাস হাতে আসছিল। মালাকে বেরিয়ে যেতে দেখে। কী হল? চলে গেল যে? বলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পরিবর্তে তাপসের নির্বাক উত্তরে সন্তুষ্ট হতে না পেরে হতাশার যে লম্বা শ্বাসটা ছাড়ল তাপসের গা পর্যন্ত তার গরম ভাপ টোকা দিয়ে গেল। স্বরে রুক্ষতা নিয়ে শুচিস্মিতা জিজ্ঞাসা করল, "নাকে কালি লাগল কী করে?"

"সাইকেলের চেন পড়েছিল ঠিক করতে গিয়ে..."

"নাক দিয়ে ঠিক করছিলে?"

"হাতে কালি লেগেছিল, কখন নাকে হাত নিয়ে ফেলেছি।" তাপস আবার নাকে তোয়ালে ঘষার চেষ্টা করে।

"ওতে হবে না। তেল দিয়ে তুলতে হবে।" শুচিস্মিতা নারকেল তেলে আঁচলটা সামান্য ভিজিয়ে তাপসের কালি মুছে দিচ্ছিল। তাপস আঁচলে চাপা পড়ে চুপ করে উপভোগ করছিল। কী আরাম! তাপস একটু জিরিয়ে নিল। আবার কবে এমন অবসর আসে।

আরম্ভ কিছুদিন আগে হলেও তাপসের অনিদ্রার দাপট এবার পুরোদস্তুর শুরু হল। তাপসের ভাব ছিল, যা অনিবার্য, তার সূচনা হয়ে গেছে। এবার কতটা ধ্বংস করার পর এর যবনিকা পড়ে সেটাই দেখার। বাবার কাছে তো মুখ দেখানো দায় হয়েই গেল। মালার ওইভাবে চলে যাওয়া শুচিস্মিতা কেমনভাবে নিল কে জানে। বাবা এখনও অবধি কিছু বলেনি, কাল সকালে কি কিছু বলবে? বললে কী বলবে? সবার সামনে রাগে ফেটে পড়বে? নাকি আলাদা করে ডেকে তার হাতে কিছুটা চুনকালি ধরিয়ে দিয়ে বলবেন, "এটা নিজের হাতে আমার গালে লাগিয়ে দে। সম্মানহানির কিছুই তো আর বাকি রাখলি না।"

তাপস এরপর ভাবতে পারছিল না। শুধু গলাটা তার বুজে আসছিল। সে ঘুমন্ত শুচিস্মিতার কাঁধের কাছে তাপস মুখটা লুকিয়ে নিল।

সকালে বাবাকে এড়িয়ে অফিস পালাল তাপস। যমুনার ওপর ভরসা করে লাভ নেই। এবার থেকে নিজে পোস্টঅফিস হয়ে যাবে। এতে ডাক আসা অবধি অপেক্ষা করতে করতে অফিস দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু এছাড়া উপায়ই বা আর কী আছে। আজ সে চাপ নেই। পরপর দুদিন চিঠি অবশ্যই আসবে না।

"কী হে তাপস, যাবে নাকি আজ আমাদের সঙ্গে?" ঢোকামাত্র বীরেনবাবু প্রশ্ন করল।

"কোথায়?"

"এই 'পীড়িত পতি কল্যাণ' সমিতিতে। আজ বাদলকে নিয়ে যাব আমরা সেখানে।"

"না, আমার সময় হবে না।"

"একবার দেখে রাখতে পারতে। তোমারও তো নতুন বিয়ে। নাকে কী করে লাগল?"

"ধাক্কা লেগেছে।" তাপস মৃদু হেসে মাথা নীচু করল।

"বাদলের থেকে খোরপোষ আদায় করতে চাইছে। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছে। পুলিস কেস। 'ম্যারিটাল রেপ' টার্মটা শুনেছ?"

"না।"

"ধরো তোমার সাথে তোমার গিন্নির ভালোবাসা নেই। আর তুমি তাকে ফিসিক্যাল রিলেশনে ফোর্স করলে... ইউ নো... 'ম্যারিটাল রেপ'!" বীরেনবাবু ইনভার্টেড কমার মতো হাতের ভঙ্গী করলেন।

তাপস ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, '"কী করে বোঝা যাবে ভালোবাসা আছে না নেই?"

"থাকলে উইদাউট এনি ফোর্স... অ্যাকচুয়ালি আমাদের সময় এসব বিষয় নিয়ে হৈ হৈ হত না। এখন যখন হচ্ছে, আমার মতে লিগাল প্রিকশন নিয়ে রাখা বেটার। এই ধরো একটা অফিসের অ্যাটেন্ডেন্সের মতো একটা খাতা করে তারিখ অনুযায়ী... অনুমত্যানুসারে... নিচে একটা সই করিয়ে নিলে বউকে দিয়ে। ব্যস আইনি প্রমাণ হাতে রইল।"

তাপস আবারও মাথা নিচু করল, এক্ষেত্রে হাসিটা হারিয়ে।

"তাপস কী খবর? এমন মনমরা কেন?"

রঞ্জনকে দেখে তাপস হাসার চেষ্টা করে।

"কিছু প্রবলেম?"

"চিঠি বাবার হাতে পড়ে গেছে।" তাপস ফিসফিস করে বলে।

শুনে রঞ্জন সিরিয়াস হয়ে বলে, “দ্যাখ আমার মনে হয়, তোর সমস্যা বেশ গভীর। তোর শুনতে খারাপ লাগবে, বাট আমার আশঙ্কা এ তোর পুরোনো প্রেম-টেম নয়। উলটো দিকটাই বরং পসিবল। কেউ তোদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করছে অবিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়ে। আমার আশঙ্কা পরে সে আরও বড়ো স্টেপ নেবে। তোর ওয়াইফের পাস্ট হিস্ট্রি কিছু জানিস? বিয়ের আগে কারও সঙ্গে রিলেশন? দেখ যদি এটা মিলে যায়, তবে আজ না হয় কাল সে সামনে আসবেই।”

ট্রেনে জায়গা নিয়ে হিমসিম খেতে খেতে শ্যাওড়াফুলিতে এসে তাপস একবার ভাবার অবকাশ পেয়েছিল। রঞ্জনদার মতো লোকগুলো না শহরে থেকে থেকে সহজভাবে কিছুই ভাবতে পারে না। বৃষ্টি ঠিকই ধরেছে। ও ব্যাটাই ইয়ার্কি করছে। এখন গল্পটার নতুন মোড় দেওয়ার চেষ্টা, ধরা পড়ার ভয়ে। কাল এ নিয়ে সে বলবেই। তার কত বড়ো ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। অত বড়ো লোক, সেটা বোঝার বুদ্ধি নেই। তাপস মনে মনে গজগজ করছিল। তিন স্টেশন দূর থেকে শুচিস্মিতা অবশ্য তাপসের এ বিশ্বাসের খবর পেল না। পেলে সে খুশির ভাগ কাউকে দিত না।

স্টেশন থেকে সাইকেল নিয়ে রাস্তায় আসতে বৃষ্টির সঙ্গে দেখা হল।

“কী রে? কেমন অবস্থা এখন?”

“খুব খারাপ। বাবা পড়ে নিয়েছে।”

“শুধু জেঠু নয়। বৌদিও বোধ হয় টের পেয়েছে। আজ বিকেলে দেখলাম থানার দিক থেকে আসছে।”

তাপস কাঁদোকাঁদো মুখে বৃষ্টিকে বলল, “সন্ন্যাসী হওয়া ছাড়া আমার আর কোনও পথ নেই। এভাবে পারা যায় বল? দেখ তো কত অসহায় আমি। এ ভাঙন ঠেকানোর কোনও উপায় বার করার হিম্মতও নেই। আমার ওপর শোধ নিয়ে কার কী লাভ হচ্ছে কে জানে। কী করেছি আমি?”

“হয়তো অবহেলা।”

“মানে?”

বৃষ্টি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সন্তর্পণে পরের কথাগুলো যেন লুকিয়ে নিল। কিছু কি বলতে চাইছিল সে? এই বৃষ্টিকে বেশ অচেনা লাগল তাপসের।

তাপস বাড়ির দরজায় এসে একটু থামল। ঝুলে পড়া মাধবীলতাগুলোকে রাস্তার দিক থেকে আলতো করে পাঁচিলের দিক থেকে সরিয়ে দিতে থাকল।

ভিতর থেকে মায়ের গলা পাওয়া যাচ্ছে, "একবার খোঁজ নিয়ে দেখলে না মেয়েটা কেন কাজে এল না কিছু না বলে কয়ে।"

"কালই আমার বোঝা উচিত ছিল, শরীর ঠিক নেই ওর। তোমাকে বলতেও ভুলে গেছিলাম।"

"কেন, কী করেছে কালকে?" তাপসের মা তাপসের বাবার কাছে জানতে চায়।

"আর বোলো না সে কাণ্ড। যেখানেই যাই ঝাঁটা নিয়ে..."

"কেন?"

"আর কেন! ঐ যে গো স্টেট ব্যাঙ্কের মিউচ্যুয়াল ফান্ডের শেয়ার কিনেছিলাম না। তার ডিভিডেন্টটা রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠিয়েছে। ঘরে এসে দেখতে যাব। বলে, ঘর ঝাঁট দেব। বিছানায় গিয়ে বসলাম বলে বিছানা ঝাড়ব।"

"বিছানা ঝাড়বে কেন? ওটা তো ওর কাজ নয়।"

বাইরে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে গেল। স্বস্তিতে তাপসের কান খাড়া করে তাপস বাবা-মার কথোপকথন শুনতে লাগল।

"তবেই বোঝো। বললাম, ঠিক আছে বিছানাটা তাড়াতাড়ি ঝেড়ে নে। আমি বিছানায় বসি। তুই তারপর মেঝেটা ঝাঁট দিবি। শুনে ঝাঁঝালো গলায় বলল, বিছানাও ঝাড়ব, ঘরও ঝাঁট দেব। এই বলে একহাতে ফুলঝাড়ু আর একহাতে নারকেল ঝাঁটা নিয়ে একবার বিছানায় দুম করে মারে একবার মেঝে ঝাঁট দেয়। দুয়ারে বেরিয়ে এলাম বিরক্ত হয়ে। ঝাঁটা হাতে সেখানেও এসে বলে, দুয়ার ঝাঁট দেব। রেগে বললাম, ঘরটা হয়ে গেল? বলে, ঢুকবেন না মুছব। শুনবে! দুয়ারে যেদিকে যাই পায়ের গোড়ায় এসে ঝাঁট দিতে শুরু করে। ক টাকা পাব দেখার জন্য মনটা উতলা হয়েছিল। তাই সিঁড়িতে গিয়ে বসে খামটা খুলতে যাচ্ছি ঝাঁট দিতে দিতে সিঁড়িতে চলে এল। দেখলাম আকাশ মেঘলা করেছে ছাদে পাঞ্জাবি দুটো মেলে দিয়েছিলাম। খামটা পকেটে ভরে ছাদে চলে গেলাম। দেখতে দেখতে ঝাঁটা হাতে ছাদেও চলে এল। বর্ষাকাল অখাদ্য কুখাদ্য খায়। ভাবলাম মাথার ব্যামো হয়নি তো! কেমন ভয় ভয় লাগল। খড়াং খড়াং করে ঝাঁট দিতে দিতে এগিয়ে আসছিল। তখন মনে হচ্ছিল উঠোনের কাঁঠালগাছটার ডাল ধরে ঝুলে পড়ি। তাও হয়তো বলবে পাতাগুলোয় ধুলো জমেছে পরিষ্কার করব। শেষে বলে গায়ের ফতুয়াটা খুলে দিন, কাচব।"

"তোমার জন্য এমন হয়েছে। একটু গড়বড় হল তো ছুটে বেড়ানো স্বভাব। বারো-চোদ্দো বছরের মেয়ে, একটা ধমক দিলেই থেমে যেত।"

"তাই তো দিলাম।"

“ঠিক আছে কাল আসুক। দেখছি খতিয়ে। এমনিতেই কাজের লোক পাওয়া দায়। মেয়েটা ভালোই ছিল। অবশ্য আজ পিয়নের সাথেও দেখলাম ঝামেলা করছে। তাই তোমাকে ডেকে দিলাম।”

এবার তাপস নড়েচড়ে দাঁড়াল। সর্বনাশ। যমুনাকে চাপাচাপি করলে বলে দেবে। কাণ্ডটা ভুলে যেতে কদিন সময় নিক। তাপস দ্রুত সাইকেলটা নিয়ে যমুনার আরও কদিন কাজে আসা আটকাতে ছুটল।

যমুনাকে আরও কুড়ি টাকা দিয়ে কাজে না আসার বন্দোবস্ত সেরে, প্রাণশক্তি পুনরুদ্ধার করে ঘরে ফিরে এসে তাপস দেখল শুচিস্মিতা খুশিতে মজে রয়েছে। তাপস দেখে মজা পেল। আজকের দিনটা খুব ভালো। এমনি এমনি সবাই মিলে গোলমালে ফেলে দিয়েছিল। সব সময় খারাপটা ভাবা ঠিক না। কীসের চিঠি আর কী ভেবে নিয়ে কাল থেকে টেনশন করে মরল। তেমনই হয়েছে রঞ্জনদাটাও, ওর সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলাই উচিত না।

টেবিলে একটা কাপডিশ বসানো রয়েছে। তাপসের চা। বৃষ্টি আর যমুনার সঙ্গে বকতে বকতে দেরি করে ফেলেছে সে। শুচিস্মিতা আজ একটু বেশিই আনন্দে আছে বলে মনে হচ্ছে। বিস্কুট দিতেও ভুলে গেছে। তাপস টেবিল থেকে কাপটা তুলে নিতে গেল। আরে এ তো ফাঁকা, একটু তলানি পড়ে রেয়েছে!

“ও তুমি এসে গেছ। আর পাঁচ মিনিট আগে এলে দেখা হয়ে যেত। এই মাত্র চলে গেল।”

“কে?”

“শুভ্র। আমার বহুদিনের বন্ধু।”

“কোনওদিন বলোনি তো।”

“ওসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে কখনও আমাদের মধ্যে? আজ প্রসঙ্গ উঠল যখন শোনো। শুভ্র আমার ইংরাজি মাস্টারমশাইয়ের ছেলে। স্যার আমাদের পাড়াতেই থাকেন। আর শুভ্র আমাদের সঙ্গেই পড়েছে। স্কুলেও কলেজেও। এখন তোমাদের সিঙ্গুর থানায় এসেছে কিছুদিন হল। আমিও জানতাম না। আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। চাপাচাপি করায় এই বিকেলের দিকে এল।”

“বিয়ের সময় দেখেছি? মনে পড়ছে না তো।”

“না বিয়েতে আসেনি। ট্রেনিং চলছিল শুনেছিলাম।”

“ও।”

“আমি, লীনা আর শুভ্র একটা গ্রুপের মতো ছিলাম। কম ডানপিটে ছিলাম! আমাদের দুষ্টুবুদ্ধির কথা আমাদের গুসকরা পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে আজও শুনতে পাবে। সেদিক থেকে বৃষ্টির মুখে যা শুনেছি, তুমি সে তুলনায় টিপিক্যাল গুড বয় ছিলে।”

“বৃষ্টির সঙ্গে কবে এসব কথা হল?”

“তুমি অফিস যাও, কী করে জানবে। এ নিয়ে দু-তিন দিন অনেক আলোচনা হয়েছে। তোমার বন্ধু বান্ধব, বটতলার ঠেক, মালার কথা।”

তাপস এবার সিধে হয়ে বসে পড়ল। “মালা এসবের মধ্যে কোত্থেকে এল?”

“বা কালকেই তো এল। আচমকা চলে গেল কেন বলো তো? কিছু বলেছিলে?”

“কী বলব? কেউ কেন চলে যায় অন্য লোকের পক্ষে জানা সম্ভব?”

শুচিস্মিতা মুচকি হেসে চোখ ঠেরে বলে, “অ্যাফেয়ার ছিল না তো?”

তাপস আঁতকে ওঠে। “তোমরা মেয়েরা কী যে পাও এসব বলে।”

“কী জ্বালা! এমন পাপবোধে পড়ে যাও কেন? আমি তো তখনও তোমার জীবনে ছিলাম না। বিয়ের আগে পর্যন্ত অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করা লোকেদের ভালোলাগা বর্জিত জীবন কাটে জানতাম না তো।”

রাতে বিছানায় শুভ্র এই, শুভ্র ওই, শুভ্র এটা বলত, শুভ্র ওটা ভালোবাসত, শুনতে শুনতে তাপস বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবুও অফিস যেতে যেতে তাপস ভাবছিল, শুভ্র কেউ নয়। কাজটা বৃষ্টিরই। ‘অবহেলা’। ইয়েস। এটাই কারণ। শোধ নিচ্ছে। রঞ্জনদা ঠিকই বলেছিল। আজকালের মধ্যে সন্দেহটা কনফার্ম করে ভবিষ্যতে আর চিঠি দেওয়া থেকে বিরত করতে হবে।

অফিসে ঢুকে আবহাওয়া বদলে গেল।

“সরকারি কেরানীদের একটা ঐতিহ্যই আছে, কোনও গ্ল্যামার নেই। বুঝলে হে তাপস। ওষুধ বিক্রি করলেও নাম হয় মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভ, টেলিফোনে কাজ করলে হয় টেলিকম অফিসার। সত্যজিৎ বাবু ‘পরশপাথরে’ বলেছিলেন বঙ্গের কেরানীকুল। আমরা সেই। আমরা নাকি অফিসে ফাঁকি দিই, সেই অভ্যাসবশে বাড়িতেও ফাঁকি দিই। বাদলকে নিয়ে গিয়ে একথাই শুনতে হল কাল।”

বীরেনবাবুকে পিছন ছাড়িয়ে রঞ্জনকে দেখে তাপস চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে রঞ্জনের কাছে গিয়ে বসল। “রঞ্জনদা, সে এসে গেছে।”

“কে?”

“সেই। যার সামনে আসার কথা বলেছিলে।”

"কোথা থেকে এল?"

"কলেজের বন্ধু।"

"বটে? কদিন চোখে চোখে রাখ। তারপর পুলিশে দেব বলে ভয় দেখা।"

"সে নিজেই পুলিশ।"

রঞ্জনের কপালে ভাঁজ পড়ল। তাপস দেখেই আভাস পেল এবার বক্তৃতার মতো করে কিছু বলবে। রঞ্জন বলল, "দেখ, তোর কিছু করার নেই। যে যাবার তাকে কি আটকে রাখা যায় রে বোকা। কিছুদিন সে তোর কাছে ছিল সেই নিয়েই আনন্দ কর।"

"কী বলছ? পঞ্চাশদিন পূর্ণ হয়নি আমাদের বিয়ের।"

"হয়ে যাবে। ডিভোর্স পর্যন্ত গড়াতে গড়াতে হয়ে যাবে। সুবর্ণজয়ন্তী দিবস বলে বিদায়ের আগে বড়ো করে ভোজ খাইয়ে দিস।"

"আমি ইয়ার্কি করছি বলে তোমার মনে হচ্ছে রঞ্জনদা?"

"কী করতে চাস। সন্দেহ করে অশ্লীল কথা বলবি তাকে জড়িয়ে? যতবার বলবি নিজের অকর্মণ্যতাই জাহির করবি জোর গলায়। অপরকে ছোটো বলে গালাগাল দিয়ে কিছুই হয় না, আদতে নিজের পরাজয়টাই মেনে নেওয়া হয়। এটার গোড়ার কথা হল, আমি তার থেকে নিকৃষ্ট। আমাকে আর তাকে যদি পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বলা হয় বেছে নাও, তবে আমাকে না বেছে তাকেই বাছবে। এই নিশ্চিত পরাজয় ফেস করার সাহস নেই, তাই চেঁচাচ্ছি। তার চেয়ে পারিস তো বিদায়ের ক্ষণটুকু মহান করে রাখ। ওকে বুঝিয়ে দে, যে পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছে সেটা রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে কোনও অংশে কম ছিল না। ভালোবাসতে হবে, তবেই সম্ভব হবে এই সব। মন থেকে ছাড়া এ কাজ জোর করে পারবি না।"

"ভালোবাসি তো।"

"এ্যায়! এই কথাটাই বুঝিয়ে দিতে হবে। ওর ছোটো ছোটো পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে, ছোটো ছোটো ক্যাসুয়াল মুহূর্তগুলোকে স্মৃতি বানিয়ে ফেলে। আদা জল খেয়ে আজ থেকেই লেগে পড়।"

এই কথা শুনে তাপসের বদনখানা ঔজ্জ্বল্যে ভরে গেল আস্তে আস্তে। মুখে বলল, "এও কি সম্ভব?"

"কেন নয়? জানিস তো তোর বৌদি ডিভোর্সি। জলপাইগুড়িতে তোর বৌদি আমাদের পৈতৃকবাড়িতে থাকতে শুরু করার পর ভাবলাম ফ্ল্যাটটার অন্য ঘরটা ভাড়া দিই। বিজ্ঞাপন দিতে যে প্রথম এল সে ওর এক্স-হাসব্যান্ড। থাকতে রাজি হয়নি। আমি চেপেচুপে রাখলাম। মনে হল দেখি, লোকটা কী এমন ভালোবাসায় অক্ষম। দেখলাম সে তোর বৌদিকে মোটেই কম ভালোবাসত না। কিন্তু মারাত্মক কমিউনিকেশন প্রবলেম।

সুখ কাকে বলে আমরা কেউ জানি না তাপস। কিন্তু সুখের জন্য অভিযানটাই বোধ করি সবচেয়ে সুখের।”

এসব গল্প শুনে তাপসের মাথা ঘুরে গেল। সে যেন প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। তার জন্য সব দিক দিয়ে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে হবে। তাপস অফিসফেরত মার্কেট হয়ে শাড়ি, গোলাপের তোড়া আরও কীসব প্রবল উৎসাহে কিনে ফেলেছে। সাইকেলে আসতে আসতে খেয়াল হল উপলক্ষ কী বলবে। আজকের দিনে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম? শুচিস্মিতা যা মেয়ে যদি বলে, “তুমি তো দেখতে যাওনি। তোমার বাবা গিয়েছিল।” তাহলে বলবে, প্রথমবার ফটোতে দেখেছিলাম সেই উপলক্ষে। হাঁটু গেড়ে বসে ফুলটা দিলে ফিল্মি স্টাইল হয়ে যাবে। নকল করা ঠিক না। এই রে ভুল হয়ে গেল। খাবার জিনিস কিছু নেওয়া হল না। তাপস বাড়িতে দরজায় পৌঁছে জামা ঠিক করে নেয়। বেল্টটা একবার খুলে আবার পরে। ভাবে, দৌড়ে ঘরে যাই। তারপর চমকে দিই। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখল ঘর ফাঁকা। বারবার পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে হাওয়া ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে।

তাপস চেঁচিয়ে উঠল, “মা! ও কোথায়?”

“শুভ্রবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছে। বলে গেছে, মাস্টারমশাই এসেছে, কাল চলে যাবে একবার দেখা করে আসি।”

তাপস ব্যাগটা দমাস করে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কুয়োতলার দিকে চলে গেল। জলের স্পর্শ তাপসের রাগ জুড়াতে না পারলেও জ্ঞান খানিকটা ফিরে এল। মনে হল, মায়ের সামনে আচরণটা ভালো করল না। ঘরে আসার পথে তাই বাবা-মার ঘরে একটু আড়ি পাতল তাপস।

মা বলছিল, “বৌ ছেলের মিল খুব একটা তো দেখছি না। নিজেরা দেখে বিয়ে দিলাম। কিছু ভুল হয়ে গেল না তো।”

“নিজের ছেলেটিকে সাধুপুরুষ ভেবো না। আজ সুখেনের মেয়ে বৃষ্টি বহু ভণিতা করে বলে কিনা, ‘জ্যাঠামশাই। তাপসকে আপনি ভুল বুঝবেন না। একটা ঘটনা দিয়েই মানুষকে বিচার করা ঠিক নয়।’ কেন ভুল বুঝব রে? কী ঘটনা? পালটা প্রশ্ন করতেই আমতা আমতা করে কী সব বলল মাথামুন্ডু, তারপর মানে মানে কেটে পড়ল। আগেই আমার সন্দেহ লেগেছিল। মিত্তির একদিন বলছিল। বিয়ে দেওয়ার আগে যদি বলত এসে গিন্নী, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতাম না। অন্যায় তো করছে না। এখন আর কচি খোকাটি নেই তোমার ছেলে যে ‘ভয়ে বলতে পারিনি বাবা’ বলে পার পাবে। দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত হাজার ভুল শুধরে দেব। এখনও তৈরি হইনি বললে সময় দেব। সাহায্য করব। কিন্তু সব মিটে যাওয়ার পর ফাঁকি বরদাস্ত করব না। এখন যদি একটা প্রমাণ পাই সেদিনই দূর

দূর করে তাড়িয়ে দেব। দুর্গা লাহার হাতে ও বাড়ির লোকেরা সুদূর গুসকরা থেকে এমনি মেয়ে দেয়নি। তোমার বোনের সম্মান এর সঙ্গে জড়িত। নিজের ছেলে তাড়িয়ে আইন মেনে বৌমার ভালো ঘরে আবার বিয়ে দেব। দরকারে এতটাই আধুনিক আমি। স্কুলে এত বছর ছেলেদের যে নীতিশিক্ষা দিচ্ছি তা বইয়ে পড়া কথার কথা নয়। লক্ষ করা অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। ছেলে ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছে ধরে নিয়ে। এবার শেষ একবার আমি ঘেঁটে দেখব রহস্যটা কী। গোলমাল চলছে কীসের!"

তাপস মাথার চুল খামচে ধরল। উত্তেজনা বাড়লে সে এমনটাই করে। তারপর চুলগুলো সামনে থেকে পিছনদিকে টেনে ছেড়ে দেয়। বৃষ্টিটার এসব পাকামো না করলেই কী নয়। শুধু খবরটা দেওয়া হয়নি বাবা অন্য চিঠি পেয়েছে। ব্যস, জট পাকিয়ে বসেছে। কী হবে? এখন বাবা যখন লেগেছে উদ্ধার করেই ছাড়বে।

তাপস হতাশায় ঘরে গিয়ে মায়ের রেখে যাওয়া খাবারটা খেয়ে শুয়ে পড়ল। অসময়ের ঘুমের মধ্যে ঠিক তাপসের মতো করে স্বপ্ন এল। সারা ঘর মোমবাতি সাজিয়ে তাপস অপেক্ষা করছে। শুচিস্মিতা বাসন্তী শাড়ি পড়ে ঘরে এল। শুচিস্মিতার ঠোঁটে হাসির বিন্দু খেলা করছে। শুচিস্মিতা আস্তে আস্তে মোমবাতির আগুনের সামনে ঠোঁট আনল। লজ্জা আগুন মিলেমিশে পলাশের রঙ লাগল তাতে। হাঁটু মুড়ে গোলাপের তোড়া উপহার দিয়ে তাপস ফুঁ দিতে ইশারা করে। আর কানে কানে বলল, "হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।" কিন্তু শুচিস্মিতা ফুঁ দিতেই বাতি নিভে সব অন্ধকার। তাপস অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। শুচিস্মিতাকে ছুঁতে পারে না। এই তো ছিল। হঠাৎ অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল সে?

তাপস হাতড়াতে গিয়ে বিছানার চাদর ধরে টানছিল। এমনসময় মায়ের গলা শুনে জেগে উঠল।

"এই দেখ ছাঁট আসছে ঘরে। আর দামড়া ছেলে অসময়ে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।"

"কটা বাজে?" আলস্য নিয়ে তাপস হাতে ভর দিয়ে বসার চেষ্টা করে।

"সাড়ে আটটা। হ্যাঁরে বৌমা এখনও ফিরল না। বৃষ্টি যা শুরু হল সহজে থামবে বলে মনে হচ্ছে না।"

তাপস বারান্দায় বেরিয়ে এল। শুচিস্মিতার ফেরার অপেক্ষায় পায়চারি করতে থাকল। ঘন ঘন জল খেতে থাকল। ঘড়িতে ঢং ঢং দশটা ঘণ্টা বাজতে হাঁপিয়ে উঠল। শুচিস্মিতা কি বরাবরের জন্য চলে গেল নাকি? ততক্ষণে বীরেনবাবু, বাদল, ম্যারিটাল রেপ, খোরপোষ, তাপসের মাথার ঘুলঘুলিতে বাসা বাঁধতে শুরু করেছে।

"একবার ছাতাটা নিয়ে এগিয়ে দেখ না কোথাও আটকে পড়ল কিনা।"

মায়ের কথায় তাপস ছাতা নিয়ে রাস্তায় বেরোল। যে বৃষ্টিকে অঝোর কান্না বলা যায়, অনেকটা তেমন করে বর্ষা নেমেছিল। পাড়ার মোড় পর্যন্ত এসে তাপস দেখল শুভ্র নিজে রেনকোট পড়ে শুচিস্মিতাকে ছাতা ধরে নিয়ে আসছে।

"আরে তুমি নিতে যাচ্ছিলে নাকি?" শুচিস্মিতা তাপসের ছত্রছায়ায় চলে এল। "এটা আমার বর। তুই আজ প্রথম দেখছিস না? এটা শুভ্র। তোমাকে ওর কথা আগেই বলেছি।"

তাপস শুভ্রকে হালকা আলোয় গভীর পর্যবেক্ষণ করে। লম্বা, ফর্সা – নামের সঙ্গে মানানসই ব্যক্তিত্ব। ছেঁড়া বিদ্যুৎ মাঝে একবার একটু বেশি প্রকট করে তাকে দেখিয়ে দিল।

তাপস হেসে বলল, "আলাপ করার উপযুক্ত পরিবেশ বটে।"

প্রত্যুত্তরে শুভ্রও হালকা হাসল।

"আসিস কিন্তু সময় পেলে। অজুহাত খাড়া করিস না।" শুচিস্মিতা পরপর দুটো মেঘ ডাকার ফাঁকে খিলখিল করে নিমন্ত্রণটা ভরে দিল।

শুভ্র লৌকিকতা ও সম্মতি জানিয়ে চলে গেল জলকাদা ঠেলে। তাপস থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল ফুটো আকাশ-ছাদের নীচে। শুচিস্মিতা তাকে টেনে নিয়ে গেল বাড়ির দিকে।

৬

শুচিস্মিতা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে, তাপসের অফিস ব্যাগে গোলাপরা একা জেগে থাকা তাপস মনে মনে গর্জে ওঠে – "তোমার শুভ্রই ভালো। যাও, ছেড়ে দিলাম। কবেই আটকেছি। যখন তুমি থাকবে না আমি ফিরে যাব আমার বর্মপরা ভালোলাগায়, ফিল্মি প্রেম কাহিনিতে। সেখানে তোমায় নায়িকা করব না। ইন ফ্যাক্ট নায়িকাই থাকবে না।"
তাপস গোলাপগুলো ব্যাগ থেকে হিঁচড়ে বার করে। ঘুমন্ত শুচিস্মিতাকে নিঃশব্দে বলে, "কাল জানলার বাইরে পড়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন কোরো।"

নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাপস শুচিস্মিতার ওপর ঝুঁকে পড়ে শ্বাস অনুভব করে। এখন সে যেন কোনও নাটকের ব্যর্থ প্রেমিক। সম্মুখে ঘুমন্ত নায়িকা। প্রায়ান্ধকার মঞ্চ। এই গোলাপ, ওই ঠোঁট, একটা চুম্বন, মুহূর্তটাকে স্মৃতি বানাতে পারত। স্মৃতি এটাও। উপহারের ফুল জানলা দিয়ে ফেলে দেওয়ার স্মৃতি কী স্মৃতি নয়? এই সব জমজমাট ডায়লগ ভাবতে ভাবতে তাপস গভীর বিষাদে ডুবে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে তাপসের

নড়াচড়ায় শুচিস্মিতা জেগে গেল। তাপস গোলাপগুলো পিছনে লুকোতে গিয়ে আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিল খাট থেকে। শুচিস্মিতা হাতটা ধরে ফেলল।

হঠাৎ করে বেশি নাটকীয় দৃশ্যে মজে গিয়ে যে এমন কাণ্ড ঘটে বসবে কে জানত। কী বলবে তাপস বুঝতে পারছিল না। এই রাতদুপুরে গোলাপ নিয়ে সে কী করছে? সবাই বদ্ধ পাগল ভাববে।

গিফট বলবে? কীসের গিফট? আজ বিবাহবার্ষিকী, অন্নপ্রাশন কী যেন? তাপস কিছু বলতে পারে না। দেখে শুচিস্মিতা হাসছে। শিশুর মতো হাসছে। সন্ধ্যায় দেখা স্বপ্নের মতো হাসছে।

"ঠিক বারোটা। হোয়াট এ সারপ্রাইজ। কী করে জানলে? আমি তো কখনও বলিনি।"

তাপস হাসে। না বুঝে। বোকার মতো।

শুচিস্মিতা গোলাপগুলো গালে বোলাতে বোলাতে উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়ে বলল, "আমার কোনও জন্মদিনে এমনটা হয়নি।"

এমন সকাল কালেভদ্রে দিনলিপিতে লেখা হয়। কিংবা আজ দেখাটাই আর পাঁচটা সকালের থেকে অন্যরকম। অনেকদিন পর আবার রজনীগন্ধার কয়েকটা নতুন শিস মাথা তুলেছে। শুচিস্মিতা ফুল তুলছিল গাছ থেকে। তাপস ঘুম থেকে উঠে বারান্দা থেকে কিছুক্ষণ সেই রূপ দেখে আশা না মেটায় কাছে গেল। গাছ থেকে কয়েকটা ফুল সাজিতে চালান করল।

"হাত ধোয়া?"

"হুঁ।"

"ঝুট। এইমাত্র দেখে এলাম ঘুমোচ্ছ।"

"এখন একদম রেডি, ফিটফাট। বলো তো তোমায় বেড়াতে নিয়ে যেতে পারি। ম্যাজিক।"

"ম্যাজিক তুমি জানো বটে, কাল রাতে যা সারপ্রাইজ দিলে।"

তাপস ব্যাপারটা চেপে গেল, মনে মনে বলল, "সারপ্রাইজড কি আমিই কম হয়েছিলাম।" মুখে বলল, "আজ কীভাবে জন্মদিন কাটাতে চাও বলো। ও তোমার জন্য একটা শাড়ি আছে। সামান্য মধ্যবিত্ত উপহার।"

"উপহার মূল্যে নয়, আন্তরিকতায়। যেমন অফিস আছে, আজ যাও। পরে ওসব দেখা যাবে।" শুচিস্মিতা তাপসের প্ল্যান নস্যাৎ করে ঠাকুরঘরের দিকে পা বাড়াল।

কলতলায় দাঁড়িয়ে মা উদ্বিগ্ন স্বরে বলছিল, "একবার দেখো না মেয়েটা এতদিন কেন কাজে আসছে না। রোগে-টোগে পড়ল কিনা।"

“দেখে কোনও লাভ নেই। সে এখন সারা সিঙ্গুর পরিষ্কার করে তবেই এ বাড়িতে ঢুকবে। বরং একটা নতুন ঝাঁটা দাও দিয়ে আসি।”

যমুনাকে নিয়ে বাবা-মার আলোচনায় মজা পেয়ে তাপস প্ল্যান করে নেয়। প্রথমে যমুনার মুখ বন্ধ, সেখান থেকে পোস্টঅফিসে চিঠির খোঁজ, তারপর অফিস। রঞ্জনদাকে বলতে হবে, ‘ইউ আর গ্রেট’।

না, রঞ্জনদা আজ অফিসে আসেনি। তাপসের পেটের কথা পেটেই রয়ে গেছে। এদিকে টেলিফোন কানেকশন দিয়ে গেছে। কবে থেকে অ্যাপ্লিকেশন করা ছিল। শুভ্রটা ফোনে বকবক করার চান্সটা পাবে এবার থেকে। তাপস মনে মনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়, যাই করো অ্যাডভানটেজ আমার দিকেই। চিঠি দিয়ে অবিশ্বাস জন্ম দেবে। অত সোজা! শুচিস্মিতা কোনওদিন চিঠির কথা জানতেও পারবে না। জানতে দেওয়া হবেই না। নিজে পোস্ট অফিস হয়ে যাচ্ছে সে আজকাল। বাবার হাত থেকে চিঠি বাঁচানোর এই একটাই উপায় রয়ে গেছে। এখন বৃষ্টিকে এ নিয়ে মাথাঘামানো বন্ধ করাতে হবে। ভালো করতে গিয়ে যত গণ্ডগোল ওই করছে। ইচ্ছা করে করছে। এটা ভাবা উচিত না। একবার হাতের লেখা দেখে নিলেই মিটে যেত। সে হবার নয়। সবই তার কপাল দোষ।

৭

“বৃষ্টিকে টমবয় টাইপের মনে হলেও ও খুব বেশি রকম নারী।”

“হঠাৎ?” শুচিস্মিতা এসব বিষয় তুলতে তাপসের সন্দেহ হল।

“বাবা ওর জন্য একটা সম্মন্ধ এনেছে। ওর বাবারও পাত্র পছন্দ। ও বিয়েতে রাজি নয় এখন। চোখ ছলছল করছিল।”

“তাই? জানতাম না তো।”

“তোমার বান্ধবী তুমিই খোঁজ রাখো না। আমার একটু অন্যরকম মনে হল। আচ্ছা তুমি জানো কিছু। ও কাউকে ভালোবাসে টাসে কিনা? তোমাকে অন্তত বলা উচিত।”

“আমি জানি না।”

“বেশ বন্ধু তুমি। চল ওকে ডেকে দুজনে চেপে ধরি। ছেলেটা কে জেনে নিই। এই সময় ওকে আমাদেরই হেল্প করা উচিত।”

“হুঁ।” তাপস আনমনে সম্মতি দেয়।

“বোসো, তবে ডেকে আনি ওকে।”

শুচিস্মিতা বৃষ্টিকে ডাকতে গেল। তাপস পত্রিকা খুলে একটা গল্প পড়তে যাচ্ছিল। কোথাও একটা খটকা লাগল। মনে হল, আরে এ কী করলাম। বৃষ্টিকে চেপে ধরলে রঞ্জনদা যা বলেছিল ‘কৈশোরের নীরব প্রেম’ প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে কী হবে। হে ভগবান!

তাপস প্রলয়ের প্রহর গুনছিল নিজের বুদ্ধির ওপর ধিক্কার দিতে দিতে। শুচিস্মিতার পিছন পিছন বৃষ্টি এল। এসেই গোঁজ হয়ে বসল।

শুচিস্মিতা সহমর্মিতা দেখায়, “তোমার আপত্তিটা কোথায় আমাদের বলো। বাবার এক্স স্টুডেন্ট, ভালো চাকরি করে। দরকারে তুমি তার সঙ্গে কথা বলো, দেখো, তারপর পছন্দ করো। আজকেই তো বিয়ে করতে হচ্ছে না।”

বৃষ্টি চুপ করে ছিল। হয় তার মনের কথাটা বলার এটা উপযুক্ত জায়গা নয়, অথবা সে বলতে চায় না।

“তোমার কি কাউকে ভালো লাগে? এসব কথা বাবা মাকে বলা যায় না, বন্ধুদের তো বলা যায়। আমি না হয় নতুন লোক। তাপসকে বলো ও হেল্প করবে। দেখো চুপ করে থেকে কেঁদেকেটে কোনও লাভ নেই। নিজের অধিকারের জন্য তোমায় লড়তে হবে।”

“লড়ছি তো।”

তাপস থমকে যায়। তার মানে!

“একাই লড়তে চাও। ভালো। তাহলে সকালে এসে বললে কেন আমি আর পারছি না।” শুচিস্মিতা বলতে থাকে নরম স্বরে।

“সেটা অন্য কারণে। বলা যাবে না।”

“তুমি যা চাও। তবে দরকার হলেই বোলো। আমায় সঙ্গে পাবে।”

“তুমি খুব ভালো বৌদি। তোমায় অন্য সময় সব বলব।”

“না, এটা করিস না।” তাপস মৌন আকুতি করল বৃষ্টির উদ্দেশ্যে। বৃষ্টি স্থানত্যাগের পর তা দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে গেল।

টেনশনে মানুষের খিদে কমে যায়। অনিদ্রার প্রকোপ বাড়ে। আরও কত কী হয়। ডাক্তারি পরামর্শ হল এই সময় মর্নিং ওয়াক করতে হবে। দুই নাসারন্ধ্রে সমপরিমান শ্বাসবায়ু নিতে হবে। তবে মন শান্ত হবে।

সমপরিমাণে বায়ু নেওয়া হচ্ছে কিনা কী করে বোঝা যাবে? নাকের ফুটোয় তো আর মিটার লাগানো নেই। তাপস পত্রিকার পরামর্শে ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারল না। সে গল্পটা পড়তে শুরু করল। গল্পে এক হতাশ যুবক আত্মহত্যা করবে কিনা ঠিক করে উঠতে পারছে না। কারণ তার অনেক পিছুটান, অনেক মায়া। তাপস পড়তে গিয়ে ভাবছিল, আসলে সবাই কনফিউজড। সঠিক করে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া কী যে কঠিন কাজ! বেশ একটা রোম্যান্টিক মোড় নিয়েছিল সবকিছু। আবার বৃষ্টিকে নিয়ে বৈঠক করে জট পাকতে শুরু করল। তাপস একবার শুচিস্মিতাকে দেখল। তাহলে কি সেও সমান সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে? কে জানে। অন্তত পরিস্থিতি যেভাবে এগোচ্ছে, তাপস আর ভাবতে পারছে না। তাপস আলো নিভিয়ে বৈঠকখানার দিকে পা বাড়াল। গল্পের শেষটায় ছেলেটা মরতে পারবে কিনা জানা দরকার। শুচিস্মিতা তাপসের ভাবগতিক দেখে মুচকি হেসে চোখ বন্ধ করল। পাশ ফিরে বলল, "বেশি রাত কোরো না। কাল রবিবার নয় কিন্তু।"

তাপস বারান্দা ধরে চলতে চলতে বাবা-মার ঘরে অপরাধী মন নিয়ে কান পাতল, কিছু সন্তোষজনক বার্তা শুনতে।

বাবা উত্তেজিত স্বরে বলছিল, "আমি নিশ্চিত কিছু হয়েছে। দেখো গিন্নী দেখো, একে বলে ভদ্রঘরের মেয়ে। ডেকে এনে আলোচনা করে মেটাতে চাইছে। আর তোমার ছেলে কী ঠগবাজি করছে, একটিবারও ধরতে পারছি না। কাজের লোককে টাকা দিয়ে এসেছে কাজে না আসার জন্য। মিত্তির দেখেছে পোস্টঅফিসের সামনে বেলা অবধি ঘোরাঘুরি করে। এসবের মানে কী? কুসন্তান। বুঝলে, কুসন্তান! প্রমাণ হাতে পেতে দাও। দূর দূর করে... একটা মেয়ের জীবন তো আর নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।"

তাপস কিছুক্ষণ জমে রইল। শুচিস্মিতা যা করবে ভেবেছিল, তা বাবা শুরু করেছে। বাবার ভুল ভাঙাতে হবে। ভালোবাসায় জেতা গেলে স্নেহতেও জেতা যায়। সে আরও সহজ। চিঠি আর আসবে না। বেশ কিছুদিন আসেনি। যেই করে থাকুক কাজটা। জেনে গেছে এতে কোনও লাভ হয়নি। তাপসের ভিতর ভিতর গর্ব হল। সে সফল হয়েছে সব আটকাতে। আত্মবিশ্বাস থাকলে কী না হয়। সে আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। কাল একবার লীনার বাড়ি যেতে হবে। শুচিস্মিতার পছন্দ অপছন্দ শখ-আশাগুলোকে জেনে আসতে হবে। গল্প পড়ে শেষ করার ইচ্ছা বারান্দায় ফেলে তাপস বিছানায় ফিরে গেল।

৮

পরদিন অফিস যাওয়ার নাম করে শ্রীরামপুর গেল তাপস। লীনা তাপসকে দেখে ঘাবড়ে গেল, না আনন্দ পেল, তাপস বুঝে উঠতে পারেনি। মেয়েটার সবকিছু এতো উঁচু আওয়াজের। চমকে যাওয়া, ভড়কে যাওয়া বা উচ্ছাসের বহিঃপ্রকাশ একই ঢঙের। তাপস প্রাথমিক ধাক্কা সামলে জানিয়েছিল, সে শুচিস্মিতা সম্পর্কে কিছু বিশেষ কথা জানতে এসেছে। সেটা শুচিস্মিতার নিজস্ব ভালোলাগা মন্দলাগা সংক্রান্ত। একথা শুনে লীনা 'হাউ রোম্যান্টিক' বলে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন তাপস সিনেমার পর্দা থেকে ওর সামনে নেমে এসেছে। তাপসের চরিত্র অনুযায়ী এই আচরণ তাকে অস্বস্তিতে ফেলার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজকাল তাপস নিজেকে আত্মবিশ্বাসী মনে করে, তাই দিয়ে এ যাত্রায় সে উতরে গেল। স্বাভাবিক ব্যবহার আর অদম্য ইচ্ছা দিয়ে কাজ হাসিল করল। লীনার থেকে এটা ওটা টুকে খাতা ভরিয়ে বাকি সময় পার্কে কাটিয়ে বিকেলে তাপস সিঙ্গুর পৌঁছল। একটাই খটকা গেছে আজ। শ্রীরামপুর কোর্টের কাছে বাস থেকে নেমে বাস ভাড়া দিতে গিয়ে শুনেছে, "আপনারটা হয়ে গেছে।" কী করে হল কে জানে। সে তো ভাড়া দেয়নি।

শুচিস্মিতা, লীনা, শুভ্রকে নিয়ে তিনজনের বদমাশ গ্রুপ ছিল একটা। এই ব্যাপারটা তাপসের বেশ লাগছিল। দুষ্টুমি না করলে আর কীসের ছোটোবেলা। কীসের স্কুল কলেজ! তাপসের এ সুযোগ হয়নি, সে বরাবরের ভালো ছেলে। তবে কাউকে রাগানো হচ্ছে দেখলে সেও সমান মজা উপভোগ করত। তবে নিজে থেকে কারও পিছনে লাগতে সে এগিয়ে যেত না।

তাপসের এসব কথা মনে এলেও হাসি পায়। সেই বয়সন্ধি থেকে যৌবন পর্যন্ত কনফিউশন আর পালিয়ে বাঁচার জীবন হলেও তার মধ্যে মজা বা রোমান্সের স্বাদ সে একেবারে পায়নি এমন তো নয়। সিঙ্গুর স্টেশনে তাপস দূর থেকে ডাউন প্ল্যাটফর্মে শুভ্রকে দেখেছে তিনজন প্রবীণ মানুষকে নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষা করতে। ওরা নিশ্চই মাস্টারমশাই ও অন্যরা হবে, বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। এতক্ষণ ট্রেন চলে যাওয়ার কথা। তাপসের মনে হল একবার শুভ্রর কোয়ার্টার থেকে ঘুরে এলে হয়। যদি বাইক নিয়ে ফিরে পড়ে। তাহলে ওর কাছ থেকে পুরুষের চোখে শুচিস্মিতা কেমন জানা যাবে। ছি! ছি! কীসব ভেবেছে সে। নিছক ক্লাসের বন্ধু-বান্ধবী সব। তাদের নিয়ে রাতের ঘুম কামাই করেছে। শুভ্র কেন চিঠি লিখতে যাবে? রঞ্জনদার যেমন কাজকর্ম নেই, রহস্য গল্প ফেঁদে বসলেই হল। তাপসের মনে হল চিঠির কথা পুরোপুরি ভুলে যাওয়াটাই শ্রেয়। ওটা একটা দুঃস্বপ্ন। সে নিজে তো জানে, সে কোনওদিন কিছু করে উঠতে পারেনি। মালা, বৃষ্টি যেই হোক না কেন আজও সে কিছুই করবে না। কিছু কিছু রহস্য নীরবে চাপা থাকাই ভালো।

পুলিশ কোয়ার্টারে গিয়ে তাপস এদিক ওদিক দেখল। ঐ তো শুভ্রজ্যোতি দাস। দরজার বাইরে নেমপ্লেট রয়েছে।

তাপস শুভ্রর ঘরের দিকে গেল। কিন্তু সিঁড়ির সামনেটায় এসে সব গোলমাল হয়ে গেল তাপসের। এটা তো শুচিস্মিতার জুতো! সবাই তো চলে গেল, সে স্টেশনে দেখে এসেছে। এখন নিশ্চয়ই শুভ্র একা আছে। তাপস ঘৃণায় ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে চালিয়ে বাড়ির সামনে আসে। মাস্টারমশাইয়ের জন্য রোজ প্রাণ আকুল হচ্ছে! বিশ্বাস করতে হবে! সম্পর্ক সুস্থ রাখার সব দায় একা আমার। আর আমাকে যেমন খুশি ঠকানো যায়। তাপসের যেন সবটাই ফালতু। সে বিড়বিড় করে বলে, "সম্পর্ক একপেশে হয় না। মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেই কাজ শেষ। বাকি সময় এইসব! ছিঃ!"

তাপস দরজায় এসে মা-বাবার গল্পের আওয়াজ পায়। ভাবে, দেখি তবে আজ ছেলের উচ্ছন্নে যাবার কী গল্প হচ্ছে।

"এই বয়সে চোট সারবে। মতিচ্ছন্ন হয়েছে তোমার বুড়ো বয়সে।"

"উঃ! হাঁটুটায় লাগাও। দেখতে হবে না কী করে বেড়াচ্ছে! আমি সিওর ঘর ভাড়া খুঁজতে গিয়েছিল শ্রীরামপুরে। পালিয়ে গিয়ে উঠবে, আমার মুখে কালি লাগিয়ে। আমি পুরোটাই পিছু নিতাম গর্তে পা না পড়লে।"

তাপস পাশ কাটিয়ে বারান্দা পেরিয়ে ঘরে চলে আসে। ভিতর ভিতর কঁকিয়ে উঠে ঘরে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার ইচ্ছা করছিল বাবাকে চিৎকার করে বলে, "তুমি কিছু না জেনেই ভাবছ আমি কালি দেব! আমার পিছন পিছন ফলো করছ। আর তোমার আদরের বউমা। সে কী করে বেড়াচ্ছে, তার খোঁজ নাও। তার পিছু নিয়েছ কখনও। তার জীবনের মূল্য আছে, যা খুশি করার স্বাধীনতা আছে, আমার নেই।"

তাপস গুমরে উঠছিল। দিনের পর দিন বিনা দোষে সে কষ্ট পাচ্ছে। আর সেটা ঘরের কাউকে বলারও উপায় নেই। ঠিক আছে, সে নিজেই যা বোঝার বুঝে নেবে। রঞ্জনদার কথা মানবে না। বিদায়ের মুহূর্ত উদযাপন করতে যাবে সে কোন দুঃখে। ইটের বদলে সেও পাটকেল ছুঁড়বে। বৃষ্টি, মালার সঙ্গে মাখামাখি করবে। অফিসের মনোরমা নন্দীকে নিয়ে হাসাহাসি করবে, ক্যান্টিনে যাবে। তারপর সেই গল্প শুচিস্মিতাকে শোনাবে। আভাস দেবে। এটা কি করে দেখাতে পারবে? পারতেই হবে। তাপস নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করল।

যমুনা ঠুক ঠুক করে দরজায় আওয়াজ করে ডাকতে তাপস উঠে দাঁড়াল, "তোর আবার কী হল?"

"বৌদি চিঠির কথা জেনে গেছে।" সবই জানে হয়তো আগে থেকে। ন্যাকামো। তাপস গুমরে ওঠে।

"কী বলছিল?"

"বলছিল চিঠি এনে আমায় দিবি। আমি রাজি হইনি।"

তাপসের একবিন্দু সন্তুষ্টি এল। বিশ্বস্ততা কাকে বলে এই বাচ্চা মেয়েটার থেকে শেখা উচিত এদের। "তা কী বললি?"

"বললাম, বেইমানি করতে পারব না। আমি আগে তাপসদার থেকে পয়সা নিয়েছি।"

"বাঃ। বাঃ। তাহলে তো আর কথাই নেই।"

তাপস আবার বিছানায় পড়ে চেঁচিয়ে বলল, "দূর হ এখান থেকে! সব সমান।"

কিছুক্ষণ পরে শুচিস্মিতা ফিরে এল। বাবা, মা সবার সাথেই ঘুরতে ফিরতে দেখা হল। তাপস সবাইকে এড়িয়ে চলল। রাত থেকে সকাল। তাপস একটাও কথা বলেনি। এই ব্যবহারের বাবা একরকম মানে করছে, শুচিস্মিতা আরেকরকম। তাপস আপাতত নিজে পরকীয়ায় মত্ত হওয়ার আইডিয়া ছেড়ে শপথ করেছে যে, চিঠি শুচিস্মিতার হাতে যেতে দেবে না। সে যখন দোষ করেনি তখন কেন বদনামের ভাগী হয়ে পালাবে। সে মাথা উঁচু করে থাকবে। ভয় তো তাদের পাওয়ার কথা, যারা এইসব ছলচাতুরি করছে।

সেই মতো তাপস বারান্দায় এসে চোখ বুলিয়ে নিল। একটা নতুন রজনীগন্ধার শিস মাথা তুলে সুবাস ছড়াতে প্রস্তুত হচ্ছে। তাপস সেদিকে লক্ষ না করে দেখল বাবা কী করছে, কিংবা শুচিস্মিতা। আজ সকাল থেকেই শুচিস্মিতা অন্যমনস্ক। চঞ্চল। তাপস মিটিমিটি তাকাল। মনে মনে বলল, ভেবেছ চিঠিটা হাতে নিয়ে শুরু করবে ভাঙনের। সে সুযোগ কখনই পাবে না। তার আগে আমি পোস্টঅফিস চলে যাব। হাতে নিয়ে নেব। ব্যাকফুটে তুমি, পোস্টঅফিস যাওয়ার কোনও অজুহাত নেই। শুচিস্মিতার মানসিক অশান্তি তাপস তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল।

এইভাবে সে সব ঠেকিয়ে রেখে দেবে। চিঠি নিয়ে সব প্ল্যান, সব রহস্য চাপা পড়ে যাবে একসময় সময়ের ধুলোয়। তখন অন্য কিছু বড়ো কাণ্ড করার পরিকল্পনা করতে হবে শুভ্রকে। বেলা গড়িয়ে সময় হতেই তাপস পোস্ট অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিল।

"একটু আসছি পোস্টঅফিস থেকে। এনএসসিটা ম্যাচিওর হয়ে গেছে এ মাসে।" হঠাৎ করে এইসব বলে দুর্গাপ্রসাদবাবু রওনা দিলেন।

এমনটা যে ঘটতে পারে তাপস আন্দাজ করেনি। সে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে বাবার পিছু নিল। কোনও উপায় সে ভাবতে পারছিল না। কী হবে এখন? কী করে আটকানো যাবে যদি চিঠি আসে? তাপস দৌড়চ্ছিল। রাস্তায় প্রথমেই মালা সামনে পড়ল। বর্ষায় সাপের ভয়ে দোকানের সামনে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়াচ্ছিল সে। তাপস হনহন করে আসছে দেখে সে গন্ধ নিয়ে পূর্বের অপমানের শোধ নিতে হাতের সাদা কাপড়টা দিয়ে মুখ ঢাকল। তাপস ভ্রু তুলে একবার দেখল। ভাবল, মালা আবার মুখ লুকোনোর মতো কী অন্যায় করল? আশ্চর্য কাণ্ড সব!

রাস্তায় বৃষ্টিও এল। সে সাইকেলের কেরিয়ারে বল আটকে, স্পোর্টিং ক্লাব থেকে ফিরছিল। পোস্টঅফিসের সামনে তাপসকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল।

একরাশ বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল, "কী হয়েছে? এমন হন্তদন্ত হয়ে চললি কোথায়?"

তাপসের এই মুহূর্তে খড়কুটোর ওপর ভরসা করার ছিল, বৃষ্টি তো সেখানে ছেলেবেলার দোস্ত। সে বলল, "বাবাকে যে করে হোক আটকাতে পারবি?"

বৃষ্টি পরের ঘটনার অনেক কিছুই জানে না। সে শুধু জানে তাপসের বাবা তার বিয়ের জন্য উঠে পড়ে ঘটকালি শুরু করেছেন।

এখন তাপস বলছে, বাবাকে আটকা। সে আদেশ তার শিরোধার্য। বৃষ্টি দুর্গাপ্রসাদবাবুর সামনে সাইকেলটা নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে যাওয়ার ভান করল। দুর্গাপ্রসাদবাবু সেদিকে ফিরে তাকানোর আগেই শুভ্র দৌড়ে এসে তাকে ধরল। পোস্ট অফিসের আশেপাশে শুভ্রটাও ঘোরাঘুরি করছিল বোধ হয়।

কী মুশকিল! তাপস আর কী করবে। ওদিকে আসল বিপদ বাবা, কাউন্টারে পা দুলিয়ে দুলিয়ে সই করছে। ওই তো বেরোচ্ছে হাতে চিঠি সেই খাম। আজকেই আসতে হল। তাপসের কান্না পেয়ে গেল। শুভ্র, বৃষ্টি সবাইকে পিছনে ফেলে ফুরিয়ে যাওয়া আশাটুকু নিয়ে বাবার পিছন পিছন চলতে থাকল। চলতে চলতে কখন যে উঠোনে চলে এল সে। শুচিস্মিতা এই মাত্র বারান্দায় ছিল, কোথায় পালাল কে জানে। এ সবের জন্য তাপস কোনওদিন ক্ষমা করবে না ওকে।

ওই তো বাবা দুয়ারে দাঁড়িয়ে খাম খুলছে। চশমার ভিতর দিয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে পড়ছে।

"কুলাঙ্গার! এই চলছে এতদিন ধরে।"

তাপস বাড়ির ভিতর দিকে এগিয়ে যায়।

“সামনে এগিও না আর। রাস্তার দিকে যাও। বৌমাকে আমরা দেখব। আইনি ব্যবস্থা যা নেবার নেব। ও মুখ আর দেখিও না। যাকে নিয়ে ভালো থাকবে থাক। যাও দূর হও!”

চোখ থেকে টপ করে জলটা হাতে পড়ায় তাপসের সম্বিত ফিরল। এসব কী ভাবছে সে। কোথাও তো কেউ নেই। সে উঠোনে একা দাঁড়িয়ে। বাড়ি জুড়ে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। লোকজন সব গেল কোথায়? তাপস কে কোথায় আছে মালুম করতে গিয়ে দেখে দুয়ারে প্লাস্টিকের চেয়ারের ওপর রাখা চিঠিটা হাওয়ায় ওড়ার চেষ্টা করছে। তাপস কাঁপা কাঁপা হাতে ধরে নিল সেটা।

প্রিয় লীনা,

টেলিফোনে এসব কথা বলতে গেলে লোকে শুনে ফেলবে তাই আলাদা করে এই চিঠিটা দিলাম। তোকে বলে বোঝাতে পারব না আমার জীবনে এখন কীসব চলছে। একটা ছোট্ট খেলা যে এত সন্তুষ্টি এনে দিতে পারে আমি আশা করতেও পারিনি। ভয়ে ভয়ে হাজার শঙ্কায় যা শুরু করেছিলাম, আজ তাই সমৃদ্ধ সুখানুভূতি হয়ে ছুঁয়ে আছে আমাকে। স্যার বলত, তোমরা যারা প্রেম কর তারা ভাব প্রেমের লক্ষ্য বিয়ে। ফলে বিয়ের সাথে প্রেমের দৌড়ও শেষ হয়। যার জন্য পাঁচ ঘণ্টা পার্কে একসময় ওয়েট করেছ বিয়ের পর সে পাঁচ মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখলে বিরক্ত হও। একই মানুষ একটা ঘটনার আগে পরে এত আলাদা হয় কী করে?

মনে আছে সেই কলেজ সেকেন্ড ইয়ার। প্ল্যান করলাম হাবিবচাচার সাংসারিক ঝামেলা মেটাব। চাচাকে বহুকষ্টে রাজি করিয়ে মিষ্টি কথা বলতে যখন পাঠালাম প্রত্যুত্তরে চাচি বলল আদিখ্যেতা। কত দুঃখ পেয়েছিলাম। কত ভেবেছিলাম অভাবটা কোথায়। দেখেছিলাম অভাব সিচুয়েশনের। তুই, আমি, শুভ্র তিনজনেই আমরা সমান হতভাগা, প্রেম কারও লাইফেই এল না। অনেক আশঙ্কা থেকে বিয়ে করেছিলাম কতবার ভেবেছি, সব বুঝি সমাপ্ত হল এবার। অ্যাডজাস্টমেন্ট একটাই শব্দ একটাই প্রতিধ্বনি। বিয়ের কদিন পর বুঝলাম মানুষটা আনাড়ি নয়। তুই তো পিছিয়ে গেলি, আমিই রিস্ক নিয়ে শুরু করলাম। সিচুয়েশন তৈরিতে। লীনা, আমি সফল। ও সাড়া দিয়েছে। ও আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে নিজেকে বড়ো প্রেমিক প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। শুনবি, সেদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি আমার এক্সট্রা রোম্যান্টিক স্বামী গোলাপ হাতে বসে আছে পাশে। বললাম, আজ আমার জন্মদিন। গোটা সিচুয়েশনটা বদলে গেল। মনে হল শিল্পী না হয়েও অদ্ভুত সুন্দর কিছু সৃষ্টি করলাম।

জানিস আমার থেকে নিয়ে শ্রীরামপুর তোর কাছ পর্যন্ত চিঠি পৌঁছে দিতে দিতে শুভ্র বেশ মজা পেয়ে গেছে। বলছিল, বিয়ের পর এরকম কাণ্ড করলে হয়। ওর জন্য কেমন প্ল্যান হবে ভেবে রাখিস। স্যার এসেছিল। কথা হল আগামী অগ্রহায়ণের মধ্যে ওর বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। সঙ্গে যেটা পাঠালাম সেটাই আমার স্বামীর উদ্দেশ্যে আমার শেষ চিঠি। তোকে আর চিঠি পোস্ট করতে হবে না। তার আর প্রয়োজনও হবে না। এই খোঁজ ওর রয়েই যাবে। যত খুঁজবে সেই অচেনা প্রেমিকার কল্পনা আমার ওপর আরোপ করে ততই ভালোবাসার চেষ্টা করবে আমাকে। কোনওদিন জানতেও পারবে না ওর অদৃশ্য প্রেমিকাকে। একদিন হাতের লেখা দেখে হয়তো সন্দেহ করবে, তারপর বিশ্বাস করতে পারবে না। ততদিনে আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে যাব। ভালো থাকিস।

মিতা

তাপস কিছুক্ষণ স্ট্যাচু হয়ে থাকে। ঘর থেকে বাবার গলা ভেসে আসছিল।

"ছি ছি গিন্নী বুড়ো বয়সে ছোটোদের ব্যাপারে নাক গলাতে গেলাম। কী লজ্জার কথা।"

"তখনই বলেছিলাম। গড়বড় কিছু তুমি করবেই। জীবনে কোন কাজটা তুমি ভালো করেছ?"

"করিনি বোলো না। ঘটককে ঘুষ দিয়ে তোমার সাথে বিয়ের সম্মন্ধটা কে আনিয়েছিল। তুমি তো লজ্জায় বেঁকে বসেছিলে বাড়িতে বলতে পারবে না।"

"চুপ করো, কেউ শুনবে। এ সব কথা কি গলা ফাটিয়ে বলবার।"

তাপস যা দেখছিল যা শুনছিল সবই তার বানানো লাভস্টোরির চেয়ে বেশি মজার মনে হচ্ছিল। অন্যরকম কিছু তো সেও চেয়েছিল। তার রূপরেখা প্রস্তুত করতে পারেনি।

তাপস ঘরে গেল। বালিশে মুখ লুকিয়ে শুয়ে আছে শুচিস্মিতা। তাপস পাশে বসলে বালিশ থেকে মুখটা এনে তাপসের বুকের মধ্যে লুকোল।

তাপস আজ আর গুটিয়ে গেল না। সে সারা গায়ে একটা শিরশিরে অনুভূতি টের পেল। শুচিস্মিতার মাথায় হাত রেখে বলল, "আমি এক্সট্রা রোম্যান্টিক, না? তবে এসব কী?" তাপস চিঠিটা নাড়িয়ে আওয়াজ করতে লাগল। তাতে শুচিস্মিতা তাপসের শরীরের সঙ্গে আরও মিশে গেল। "যদি বাবার হাতে পড়ত প্রথমেই?" তাপস শুচিস্মিতাকে আদর করে।

শুচিস্মিতা আস্তে আস্তে বলল, “পড়ত না। আমি লক্ষ রেখে নিয়ে নিতাম। তুমিই যমুনাকে লাগিয়ে গোল পাকালে।”

“এবার তাহলে পড়ল কী করে?”

“সেও তোমারই জন্য। কাল সকালের দিকে দড়াম করে লীনার বাড়ি হাজির হলে। লীনা তখন চিঠি ঠিক করছিল। তোমায় আচমকা দেখে টেনশনে ভুল করে তোমার জন্য লেখা চিঠিটা নিজের কাছে রেখে ওর জন্য লেখা চিঠিটা পোস্ট করে ফেলেছে। কাল ও ফোন করে গোলমালটা বলার পর থেকে কত ছুটোছুটি করেছি জানো। শুভ্রর কাছে দৌড়ে গেছি, ও পোস্টঅফিস থেকে যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারে। যদি পিয়নের থেকে আমাদের বাড়ির সামনে নিয়ে আমাকে এনে দিতে পারে। তুমি আজ ওটা কিছুতেই পেতে না। বাবা ওখানে গিয়ে না পড়লে। সব কেঁচে গেল।”

“ইস! প্রেমিকার আর অজ্ঞাত থাকা হল না!”

“অজ্ঞাত থাকতে চাইনি বলেই তো... ও হ্যাঁ, বৃষ্টিকে একটু সামলে নিও। বাবা ওকে সন্দেহ করছে বুঝে ও খুব দুঃখ পেয়েছে। আমায় ও সব বলেছে। এমনি বিয়েতে ওর আপত্তি নেই। যে কারণে বিয়ে দিতে চাইছিল লোকে সেটা অপমানের।”

শুচিস্মিতার কথার উত্তরে তাপস হাসি মিশিয়ে বলল, “ভগবান যদি করেন, তার আর দরকার হবে না। তোমাদেরও আর শুভ্রর জন্য নতুন আইডিয়া, নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে না। এই প্রকৃতিতে কিছু কিছু সিচুয়েশন আপনা আপনিই তৈরি হয়ে যায়। মানুষের হাত লাগানোর দরকার পড়ে না। মানুষ সেখানে উপলক্ষ মাত্র।”

শুচিস্মিতা এ কথার মানে বুঝে বা না বুঝে নীরব রইল। হয়তো বা কথার পর্ব পার হয়ে গিয়েছিল বলেই। তাপস ঠোঁটটা গাল বেয়ে শুচিস্মিতার ঠোঁটের কাছে নিয়ে এল। কতদিন ধরে সে এই আদরটাকে একান্তে যত্ন করে জমিয়ে রেখেছিল।

ওদিকে বাগানের সেই রজনীগন্ধার শিসটা তখন জানলার বাইরে থেকে প্রকাণ্ড উৎসাহে উঁকি দিচ্ছিল। কোত্থেকে একটা দমকা হাওয়া কান টেনে তাকে আড়ালে সরিয়ে নিল।

❑ ❑ ❑ ❑

শুরুয়াৎ

অভীক দত্ত

১।

আজকাল আমার বাংলোয় মাসিকে প্রায়ই দেখতে পাই। মাসি মারা গেছে তিন মাস হল। গলায় ক্যান্সার হয়েছিল। সারাদিন পান চিবাত আর টিভিতে বাংলা সিরিয়ালগুলি দেখত। রান্নাবান্নাতেও পানের গন্ধ পাওয়া যেত। সেটা নিয়ে ঝামেলা করায় আবার কান্নাকাটিও শুরু করত। বিরক্তি লাগলেও কিছু বলতাম না। এ বাজারে দেড় হাজার টাকায় সর্বক্ষণ থাকার আর রান্না করার লোক পাওয়া যায় না। তাছাড়া মাসি রান্নাও ভালো করত। প্রায়ই বলত গলায় ব্যথা। ডাক্তার দেখাত। ওষুধ খেত আবার ঠিক হয়ে যেত।

তারপর আবার গলায় ব্যথা। শেষমেষ ধরা যখন পড়ল, তখন শেষ স্টেজ। মারা গেল। মাসির তিন কুলে কেউ নেই। আমার মা বাবা বাড়ি থেকে আসতে পারেননি। ওঁদের বয়স হয়েছে। তাই সব কাজই আমাকে একাই করতে হল। মারা যাবার কিছুদিন ঠিকঠাকই ছিল। অফিস থেকে ফিরে এসে গা হাত পা ধুয়ে টিভি দেখে বেরিয়ে যেতাম একটা বন্ধুদের মেসে খেতে। ফিরে এসে ঘুম। একেবারেই সরল রুটিন।

মাসিকে যেদিন প্রথম দেখলাম সেদিন শুক্রবার। বন্ধুদের মেস থেকে খেয়ে দরজা খুলে দেখি সামনের ঘরে একটা সাদা শাড়ি আবছা মতো এসে বিলিয়ে গেল লাইট জ্বালাতে। তখন অত চাপ নিইনি।

আমার রাতে বাথরুম যেতে একবার ঘুম ভাঙেই। তখন বাথরুমের দিকে যেতেও সেই সাদা শাড়িটা এসে মিলিয়ে গেল। খটকা লাগাতে তখনই বললাম "কে?" কোনও উত্তর না আসায় চুপচাপ বাথরুম সেরে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। দু তিনদিন এরকম দেখার পর বুঝে গেলাম অতটা ভয়ের কিছু নেই। মাসি এখানেই থাকবে ঠিক করেছে।

মাসির সাথে আমার প্রচন্ড ঝগড়া হত। আবার গল্পও হত। মাসির কাছেই শোনা মাসির বর যখন মারা যায়, তখন মাসির কাছে এক টাকাও নেই। বারাসাত হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ নিয়ে যাবার জন্য মাসিকে লোকজনের কাছে ভিক্ষা করতে হয়েছিল।

ছেলে মেয়ে নেই। বরের দিকে কেউ দেখেনি। নিজের দিকেরও কেউ ছিল না। কিছুদিন একটা বিয়েবাড়ির রান্না করে এমন একটা দলে ছিল। তারপর কয়েকজনের বাড়ি কাজ করত। মাসির ব্যবহার খুব খারাপ বলে কোনও জায়গাতেই টিকতে পারত না। তারপর আমার এখানে ব্যবস্থা হয়। বাবা মা দুজনেই চাকরি করেন আমার। তাই ওঁদের পক্ষেও এখানে এসে থাকা সম্ভব না। মূলত রান্নাবান্নার জন্যই মাসিকে রাখা। দরকারটা দু পক্ষেই ছিল বলে ঝগড়ার পরেও মাসি টিকে গেল। মাসি মারা যাবার পর কাউকে পাওয়া যায়নি। আপাতত একাই থাকতে হয় আমাকে। মাসির এই হঠাৎ করে আসাটা আমি ঠিক কীভাবে নেব বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে ভয় পেলাম না।

একবার ভাবলাম হিয়াকে বলি। তারপর অনেক ভেবে চিন্তে আর বললাম না। ওকে তো এখানে থাকতে হবে কদিন পর। এখন বললে ভয় পেতেই পারে। না জানাটা আশীর্বাদ। কে যেন বলেছিল।

২।

হিয়াদের বাড়ি এলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। ওরা কী সুন্দর একান্নবর্তী পরিবার। আমাদের বাড়িটা শরিকি। বাবারা তিন ভাই বোন প্রতিষ্ঠিত হলেও বাড়ি কেউ ছাড়বে না। লেগেই আছে ঝামেলা। হিয়ার সাথে বিয়ে হবার পরে বাড়িতে থাকা বোধ হয় আর হবে না আমার। একটা ঘরে বাবা মা শোয়। আমার বারান্দাটা আছে। বউকে নিয়ে তো আর বারান্দায় শোয়া যায় না। বাবা অবশ্য বলেছে, আমরা যখন আসব কাকাই একটা ঘর ছেড়ে দেবে। কিন্তু আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। মাঝে মাঝে মনে হয় একবারে এখানেই নিয়ে আসব হিয়াকে। বিয়েটা আমার অফিসের দেওয়া বাংলোতেই হোক বরং। কী দরকার শুধু শুধু ঝামেলা বাড়ির লোকদের সাথে করার।

হিয়ার মা খুব আদর যত্ন করেন ওঁদের বাড়ি গেলে। আমি এসেছিলাম সারপ্রাইজ দিতে। হঠাৎ করে পৌঁছে চমকে দেব হিয়াকে। এসে নিজেই চমকে গেলাম। হিয়া নেই। কলেজ গেছে। আমার মন আরও খারাপ হয়ে গেল। ওর ফোনটা সুইচড অফ বলছে। তার মানে এখন ক্লাসে। আমি চুপচাপ বসে কাগজ পড়তে শুরু করলাম। ওদের বাড়ি এলে ওর দুই কাকুর ঘরে যাই প্রতিবার। এবার ইচ্ছা করছিল না। কাগজ পড়তে পড়তে একবার মনে হল এখানেও মাসি এসেছে। তারপর মনে পড়ল মাসি ঐ বাংলো ছেড়ে নড়ার পাবলিক না।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর হিয়ার ছোটো কাকিমা গরম গরম লুচি আলুর দম দিয়ে গেলেন। খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে আমার কখনওই খুব একটা 'না' থাকে না। এখানেও আমি 'না' করলাম না। চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলের মতো খাওয়া শুরু করলাম। খেতে খেতেই শুনলাম ওদের নীচের ঘরে একটা পেয়িংগেস্ট এসছে। ছেলেটা কলকাতাতেই চাকরি করে। এখনও বিয়ে হয়নি।

কথাটা শুনে খুব একটা ভালো লাগল না। খেতেও বেশি ইচ্ছা করছিল না। খাবারের থালাটা নামিয়ে রাখলাম। ওর মা-কাকিমারা রে রে করে তেড়ে এলেন। আমি বলে দিলাম রাস্তায় খেয়ে এসছি। পেটভর্তি।

৩।

সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিসে আমার আপত্তি আছে। কারও ব্যবহার করা জিনিস যদি আমাকে কেউ ব্যবহার করতে হয়, তখন আমার গা ঘিন ঘিন করে। হিয়া প্রথমে আমাকে বলেছিল ওর কোনও বয়ফ্রেন্ড ছিল না। একদিন অটো করে ওর বাড়িতে যাবার পথে ওর ব্যাগের মধ্যে দেখি H+I করা। দেখে যেটা বুঝতে পারছিলাম, লেখাটা সাম্প্রতিক কালের নয়। বেশ কয়েকদিন আগের। ওকে চেপে ধরতেই আসল সত্যিটা বেরিয়ে এসেছিল। ওর এর আগে একটা রিলেশন ছিল। ক্লাস এইট থেকে। ছেলেটার নাম ইন্দ্র। ছেলেটা পড়াশুনায় খুব একটা ভালো ছিল না। প্রায় চার পাঁচ বছর রিলেশনটা টিকে থাকার পর ওদের ব্রেক-আপ হয়। এই এত কথা ও আমাকে বলতে চায়নি। আমি একেবারে বলেই দিয়েছিলাম আমি সত্যিটা জানতে চাই। নাহলে এই রিলেশনটা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। অনেক সময় নিয়ে এই অতীতটা বলেছিল আমাকে।

শোনার পর থেকে আমার মধ্যে অনেক সমস্যা তৈরি হয়েছিল। একটা সময় ভেবেছিলাম এই সম্পর্কটা রাখব না। কিন্তু ভেঙে দেবার কথাও ভাবতে পারছিলাম না। হিয়াই আমার জীবনের প্রথম প্রেম। শেষ প্রেমও। আমি বেশ বিশ্বস্ত প্রেমিক। রাস্তা দিয়ে গেলে অন্য মেয়ের দিকে তাকাই না। কলেজ অবধি আমি খুব পড়াশুনা করেছি। তখন মেয়ে দেখার সময় পাইনি। হিয়া আমার জীবনে আসার পরে আমি একেবারে 'ওয়ান মাস্টার ডগ' টাইপ হয়ে যাই। ওর বয়ফ্রেন্ড ছিল জানার পরে বারবার নিজেকে প্রতারিত মনে হচ্ছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলেছিলাম।

একটা সময় মনে হয়েছিল, সম্পর্কে না জড়ালেই বোধ হয় ভালো হত। একটা মানুষ সারা জীবন গলায় কাঁটা নিয়ে ভালো সম্পর্কের অভিনয় করে যাবে, এটা হয় না।

আমি জানি, আমার কথাবার্তা প্রাগৈতিহাসিক। একটা পুরোনো সম্পর্ক থাকতেই পারে আমার হবু বউয়ের, কিন্তু যখন ভাবি কোন এক আলগা মুহূর্তে হিয়ার বুকে হাত দিয়েছিল ঐ ইন্দ্র কিংবা ওরা ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুমু খেয়েছিল, তখন ভীষণ অসহ্য মনে হয় আমার। মনে হয় সবাইকে খুন করে ফেলি।

৪।

উৎসা কলেজে আমাদের সাথে পড়ত। এখন আমাদের এক কলিগকে বিয়ে করেছে। এখানে আসার পর থেকে খুব কম লোকের সাথে আলাপ হয়েছিল। সম্বিত উৎসাকে বিয়ে করে আনার পরে এখন প্রায়ই ওদের বাড়ি নেমন্তন্ন থাকে। সম্বিতের সাথে আমার খুব একটা দোস্তি ছিল না, তবে ইদানীং ওদের নব দম্পতিকে সঙ্গ দিতে প্রায়ই ডাক পড়ে। বোঝা যায়, ওদের সম্পর্কের সিমেন্টটা এখনও ভালো করে জমেনি, যার জন্য একটা তৃতীয় শক্তির দরকার হয়ে পড়ছে বারবার। ওদের দেখেশুনে বিয়ে, বিয়ের পরে দুজনেই আরও বেশি করে লাজুক হয়ে পড়েছে। সম্পর্কের আড় ভাঙতে সময় লেগে যায় সাধারণত অনেক অ্যারেঞ্জড ম্যারেজেই, এদের মধ্যে সেই সমস্যাই দেখা দিয়েছে। সম্বিত স্বভাব-লাজুক। উৎসা চিরকালই গাঁতু টাইপ ছিল, সর্বক্ষণ পড়ে যাচ্ছে। যথেষ্ট সন্দেহ আছে সারা জীবনে একবারও ব্লু ফিল্ম দেখেছে নাকি। সুতরাং এখন সমস্যা দেখা না দেবার কোনও কারণ নেই।

এরকমই একদিন ওদের বাড়িতে কথা না খুঁজে পেয়ে আমি মাসির ব্যাপারটা ওদের বলে ফেলি। সম্বিত খুব সিরিয়াসলি না নিলেও বেশি প্রতিবাদ করল না। উৎসা দেখলাম ভয় পেয়েছে খানিকটা। আমাকে মুখ চুন করে বলল, "তাহলে তো তোর বাংলোয় যাওয়া যাবে না। আমার ভীষণ ভূতে ভয়।"

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম "ভয়ের কি আছে, খালি শাড়িটাই তো দেখতে পাই। অ্যাপিয়ারিং অ্যান্ড ডিসঅ্যাপিয়ারিং। ফিজিক্যাল ফর্মে তো আর আসছে না সে।"
উৎসা বলল, "না, না, কী দরকার বাপু?"

সম্বিত হঠাৎ করে উৎসাহ পেয়ে বলল, "একটা কাজ করি, একটা রাত আমরা তোর বাংলোয় থাকি। একটা অ্যাডভেঞ্চার তো হবে।"

উৎসার ভয় থাকা সত্ত্বেও সম্বিত হঠাৎ এই প্রোপোজালটা দিল কেন বুঝলাম না। উৎসা সম্বিতের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। তারপর হাত নেড়ে বলল, "না বাবা। আমি থাকব না, তুমি একা থাকো গিয়ে। ও তো নিজেই একটা ভূত। অত বড়ো বাংলোয়

একা একা থাকে। তুমি ওর সঙ্গী হবে, মাঝরাতে আর ভূত লাগবে না ওই তোমার ঘাড় মটকাবে।” বলে উৎসা মুখ ব্যাঁকাল।

সম্বিতের মুখটা হঠাৎ দেখলাম আলো হয়ে উঠল। আমি কিছুটা বুঝলাম। তবে পুরোটা বুঝলাম না। কোন কোন ব্যাপার পুরো না বোঝাই ভালো।

৫।

প্রীতমদার মাথায় ছিট আছে। আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ি, শুধু আমি কেন, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন ওর যত দরকার আমার সাথে। মাঝরাতে ফোন করে জ্বালিয়ে খাবে। আমি ক্লান্ত থাকলে মাঝে মাঝে ফোন ধরি না। তখন বার বার রিং করতে থাকে। মহা বিরক্তিকর একটা মেটিরিয়াল।

আর অফিস পলিটিক্স নিয়ে বকে যাবে একা একা, আমাকে শুনে যেতে হবে। সেদিন আমি কলকাতা থেকে ফিরেছি। বাংলোয় এসে গরম জলে স্নান করে খেয়ে দেয়ে এসে সবে ঘুমিয়েছি আর ফোনটা বাজা শুরু করে দিল। তিতিবিরক্ত হয়ে ফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে প্রীতমদা বকবক শুরু করে দিল, “বুঝলি, আর ডি আজকে বহুৎ খচে ছিল। বস ঐ বিলটা আটকে দিয়েছে।”

আমি এমন ভাব করলাম যেন কিছু শুনতে পাচ্ছি না। কিছুক্ষণ ‘হ্যালো হ্যালো’ বলে ফোনটা কেটে দিলাম। আর তার পরেই একটা অজানা নাম্বার থেকে ফোন, আমি ধরতেই ওপাশ থেকে একজন মহিলার আওয়াজ ভেসে এল, “আপনি কি একটু আগে প্রীতম দাসকে ফোন করেছিলেন?”

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ‘হ্যাঁ’ বলতেই আবার শব্দের বাণ ভেসে এল, “কেন করেছিলেন? আপনার কোনও কাজ নেই? রাত সাড়ে এগারোটায় কেউ ফোন করে কাউকে? এরপর আপনি রাত এগারোটার পরে ওর ফোন করবেন না, যদি করেন তবে আপনার নামে আমি থানায় জানাতে বাধ্য হব।”

আমি চাপটাপ খেয়ে ‘আচ্ছা’ বলে ফোনটা রেখে ভাবতে বসলাম, এ আবার কী! নিশ্চয়ই প্রীতমদার বউ, কিন্তু ফোন তো আমি করি না, ঐ করে।

দেখি আবার প্রীতমদা ফোন করছে, ধরলাম। “আচ্ছা, তোকে কি এখন তোর বৌদি ফোন করেছিল?”

আমি ‘হ্যাঁ’ বলতেই বুঝলাম প্রীতমদা এবার লজ্জায় পড়েছে, আর বলতে বলতে বিপ বিপ শব্দে দেখি আমার মোবাইলে আবার বউদির কল ওয়েটিংয়ে দেখাচ্ছে।

এবার ভয়-টয় পেয়ে ফোনটা কেটে দুজনকেই ব্লক করে দিলাম, আর রিস্ক নেওয়া যাবে না। প্রীতমদার বউ যে সন্দেহবাতিক, সেটা তো জানতাম না। সন্দেহবাতিক হওয়া মারাত্মক জিনিস। কী দরকার অন্যের ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে নেওয়ার।

কিছুক্ষণ থম মেরে বসে থেকে ভাবলাম ব্যাপারটা হিয়ার সাথে আলোচনা করাই যায়। মজা পাবে। ফোন করলাম ওকে। বিজিটোন আসতে থাকল।

৬।

ফাইল ওয়ার্ক আমার বিরক্তিকর লাগে। আরও বিরক্তিকর লাগে ধর সাহেবের চেম্বারে গিয়ে ফাইল ওয়ার্ক করতে। ধর সাহেব অত্যন্ত গম্ভীর একজন লোক। কথাবার্তা বলেন কম। তবে খুব এফিসিয়েন্ট। কাজের ব্যাপারে সিনসিয়ার। অতিরিক্ত সিরিয়াস বলে কেউ যেতে চায় না ওনার কাছে। কিন্তু আমি নিরুপায়, আমাকে যেতেই হবে। একটা বড়ো টেন্ডারের ফাইলের ভার আমার ওপরে পড়েছে। তারই ফাইল পেন্ডিং পড়ে ছিল ওনার কাছে। তারই তদ্বির করতে যেতে হল। ভদ্রলোক অন্যদিন বেজার মুখে বসে থাকেন। আজকে দেখলাম মুডটা আরও খারাপ। আমি একবার ভাবলাম এড়িয়ে যাই, তারপরে মনে হল কাজের কথাটা না বলে বরং এখন জিজ্ঞেস করা যাক সমস্যাটা কী। এগিয়ে গিয়ে হেসে বসলাম। সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললাম "এনি প্রবলেম ধর সাহেব?"

ধর সাহেব আমার থেকে অনেকটা বড়ো। পঞ্চাশের ওপর বয়স। কাঁচা পাকা চুল। প্রায় পাঁচ ফুট এগারো, শরীরে মেদ আছে সামান্য। আমার থেকে একটা সিগারেট নিয়ে বললেন, "আর বলবেন না, মেয়েকে নিয়ে পড়েছি মহা সমস্যায়।"

ধর সাহেবের সাথে তাঁর পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে আমার কোনওদিন কোনও কথা হয়নি। আজ হঠাৎ করে মেয়ের প্রসঙ্গ তুললেন বলে একটু অবাক হলাম। উনি নিজেই বলতে থাকলেন, "এক ছেলেকে পছন্দ হয়েছে তার। ছেলেটা বেকার, তার ওপর একেবারে ল্যাদখোর বুঝলেন।"

আমি ওনার এই কথায় হকচকিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক বেশ ডিপ্রেসড সেটা বুঝলাম। বললাম "আপনার মেয়ে আছে জানতাম না, এখন কি পড়াশুনা করছে, না চাকরি করছে?"

ধর সাহেব বিরক্তির সাথে বললেন "একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াচ্ছে, সরকারি স্কুল বলে মাইনে পত্তরও ভালো পায়, আর কী, ছেলেটার তো পোয়া বারো, দিল আমার মেয়েকে ঝুলিয়ে।"

ওনার মুখ দেখে খারাপ লাগছি। বুঝতে পারছিলাম বেশ চিন্তায় পড়ে গেছেন। আমি বললাম, "ছেলেটার সাথে দেখা হয়েছে?"

উনি সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন "হ্যাঁ, কালকেই হল। মেয়েরা যে এসব ছেলের মধ্যে কী পায় কে জানে। এখানকার লোকাল এক নেতার চামচা। সারাক্ষণ ওর বাড়িতেই বসে থাকে। কেমন উদ্ধত কথাবার্তা। যেন বাংলা সিনেমা দেখছি। তুমি বড়োলোক হতে পার, আমি গরীব হতে পারি, কিন্তু তোমার মেয়েকে কোনও অংশে কম ভালোবাসি না এই টাইপ অ্যাটিচুড। আর আমার মেয়েকে নিয়েই তো রাগটা বেশি আমার। পরের ছেলে তো যেরকম সেরকম হবেই। একটা রুচি থাকবে না তোর! শিক্ষাদীক্ষা পাওয়া মেয়ে কীভাবে এরকম ছেলের পাল্লায় পড়ে কে জানে।"

আমি বললাম "কিন্তু কী করবেন, এই সম্পর্ক তো মেনে নেওয়া ছাড়াও কোনও উপায় নেই আপনার।"

ধর সাহেব করুণ মুখে আমার দিকে তাকালেন, "আমার গত তিন বছর ধরে সুগার, প্রেশার, হাঁটুর জয়েন্টের সমস্যা। এত এত ওষুধ খাই। অযথা উত্তেজিত হওয়া বারণ। মেয়েটা একবারও এই কথাগুলি ভাববে না বলুন? আমি তো জানি আমাকে মানতেই হবে, কিন্তু এভাবে যুদ্ধ করে কিছু হয় আপনি বলুন?"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে চুপচাপ বসে রইলাম। ভদ্রলোক কোনওদিন আমার সাথে এত কথা বলেন না। আজ ওনার বিমর্ষ মুখটা আমাকে বেশ ধাক্কা দিল।

চাঁদের যেমন এক দিকটা আলো থাকে বলে, অন্য অন্ধকার দিকটা আমাদের চোখে পড়ে না বা ওই অংশটা নিয়ে আমরা চিন্তাও করি না। ধর সাহেবের ক্ষেত্রেও যেন ব্যাপারটা একেবারেই সেরকম। একজন আপাত চুপচাপ গম্ভীর মানুষ ভেতরে ভেতরে এত কষ্ট নিয়ে থাকেন, আর তারপরে যখন সেটার বিস্ফোরণ হয় তখন তা হয়তো এরকম আকারই নয়। আমরা চিরকাল 'কাজ কাজ' করা কাজপাগল লোকটার একটা মূর্তি দেখে এসেছি, এখন আমি হঠাৎ করে আজকে ধর সাহেবের এই মূর্তিটা দেখে তাই একটু অবাকই হলাম। ভদ্রলোকের মনের কথাগুলি কাউকে হয়তো সত্যিই বলার ছিল, আমাকে বলতে পেরে একটু হালকাও হলেন কি? সেটা অবশ্য ওনার মুখ দেখে বুঝতে পারলাম না।

৭।

হাইল্যান্ড পার্কের মলটা বেশ বড়ো। হাঁটতে ভালো লাগে। আমি আর হিয়া এসে ফুড কোর্টে বসলাম। ও খায় কম, কথা বলে বেশি। আমি খাই বেশি, কথা বলি কম। আমি খেতে ভালোবাসিটা ঠিক না, আসলে আমি ভালো খাবার খেতে ভালোবাসি। আমার চাকরির জায়গা ধ্যাদ্ধেরে গোবিন্দপুরে এত কিছু পাওয়া যায় না। এখানে পাওয়া যায়। আমি তিন-চার রকম খাবার খাই। হিয়া একটা জুস নিয়ে বসে থাকে।

ওর আজকে ইচ্ছা ছিল একটা সিনেমা দেখবে। আমার ইচ্ছা করছিল না। তবু এতদিন পর পর দেখা যখন তখন ওর ইচ্ছার মর্যাদা দেওয়াটাই উচিত বলে টিকিট কেটেছি, আর আধঘণ্টা পরে শো শুরু। তার আগে ফুড কোর্টে অপেক্ষা। হাইল্যান্ড পার্ক ওদের বাড়ি থেকে দূরে বলে হিয়া এখানে আসে। সল্টলেক ওদের বাড়ির কাছে। ওর পরিচিতরা আমার সাথে দেখলে নাকি ও সমস্যায় পড়তে পারে, সেই জন্য ওর বাড়ি থেকে একটু দূরে আমরা ঘুরি। এমনি ওদের বাড়ি গেলে ও সেখানে খুব বেশি কাছে আসে না। ওর বাবা মার সাথে কথাই বেশি বলা হয়। বাইরে বেরোলে বরং ওর সাথে বেশি কথা হয়।

একবার নাকি ওর কোন কলেজের বন্ধু ওর সাথে আমাকে দেখে নিয়েছিল তারপরে কলেজে খুব আওয়াজ খেয়েছে। সেসবের মুখোমুখি চায় না বলেই ও বাড়ি থেকে দূরে দেখা করে আমার সাথে।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "ইন্দ্রর সাথে এখানে আসতে?" প্রশ্নটা শুনে ওর মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপর একটু ঝাঁঝালো গলাতেই বলল, "ঐ প্রসঙ্গটা না আনলেই খুশি হব, এতদিন পরে দেখা আমরা তো নিজেদের সম্পর্কেই আলোচনাটা করতে পারি।"

ওর কথায় আমি একটু লজ্জা পেলাম। ঠিকই বলেছে। ওর মুডটা অফ হয়ে গেল। আমার নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। আর কথা পেলাম না। এই কথাটাই এখন বলতে হল। আমি এর আগেও এরকম করেছি। একটা সিনেমাহলে ও যখন আমাকে কর্নার সিটে চুমু খাচ্ছিল আমি বলে বসি, "ইন্দ্রর সাথে কখনও সিনেমা হলে গেছ?" তারপর ও ওখান থেকে উঠে চলে যায়।

আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল সেদিন। আজকে ভাবছিলাম সে রাতের ফোন বিজি পাবার কথাটা তুলব, কিন্তু ভুল কথা বলে দিলাম আগেই। আমি তাড়াতাড়ি কথাটা ঘোরাতে গেলাম, "মা আসতে পারে পরের সপ্তাহে তোমাদের বাড়িতে।"

কথাটা শুনে ও কোনও উত্তর দিল না। ছল ছল চোখে তিন তলার ওপর থেকে কাঁচের বাইরের রাস্তায় গাড়ি চলাচল দেখতে লাগল।

৮।

বুধন ধাড়ার কাজ নেই কোনও। নাইট ডিউটিগুলিতে বসে বসে ভূতের গল্প শোনাবে। আমি যত ওর থেকে পালাতে চাই ও ওর সেই ছমছমে গলা নিয়ে বলে যাবে এখানে কোন কনভেয়ার বেল্টের মধ্যে কার গলা জড়িয়ে গেছিল, কোন লোকোর তলায় কে গলা দিয়েছিল। শুনতে শুনতে আমার ঘুম পায়, যত বলি আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, তত শুনিয়ে যাবে।

নাইট ডিউটিতে আজকাল চাপ একটু কম থাকে। আমার রাতে ঘুম আসে না। সারারাত চা খাই। এক ঘণ্টা পর পর আর বুধন এই সব গল্প বলে যায়। "সাহেব এই অমাবস্যায় তেনারা ঘুরে বেড়াইবেক একদম সশরীরে। এ কথা আমি জানি, কাউকে বলি না। তিন বছর চার বছর আগে মারা গেইচে, তারা ঘুরে বেরাইবেক। আপনি চিনতে পাইরবেন। ভাবতি লাগবেন কোথায় দেখেচেন, তারপর যখন মনে পড়বে তখন দেখবেন সব ফাঁকা।" আমি হাই তুললাম। এক সময় বুধনকে মাসির কথা বলে দিলাম। ও চোখ বড়ো করে বলল, "সাথে লোহা রাখুন সাহেব। উনি কিন্তু সেদিন দেখা দেবেন। আপনি গয়ায় যান নাই?"

আমি বললাম "এখানে একা একা থাকি, যদি সাথি পাই ভালো তো। একা থাকতে হয় না।"

বুধন কপালে হাত ঠেকাল নমস্কারের ভঙ্গীতে, "এ কথা বলবেন না, স্যার। তামাশার ব্যাপার নয়।"

আমি বুধনের কথায় আমল দিলাম না, কিন্তু ক্যালেন্ডারে একবার অমাবস্যা কবে সেটা দেখে নিলাম। মনে পড়ল ঐ দিন হিয়ার বাবা মা আসছে এখানে আমার বাংলো দেখতে। মাসি যদি সশরীরে ওদের সেবা করে, তাহলে তো ভালোই হয়। আমার অনেক কাজ বেঁচে যাবে। বুধন বড়ো বড়ো চোখ করে বলল, "আমি নিজে দেইখেছি স্যার। তাপস সাঁতরা। বাজারে প্রচুর দেনা হইয়ে গেচল। শেষ মেষ মরল প্ল্যান্টের টিরেন লাইনে গলা দিয়ে। আমি আগের বছরের অমাবস্যায় পরিষ্কার দেখলাম রেলগেটে। পাঁচ সেকেন্ড মতো দেখলাম। তারপর নাই।"

আমি আবার বড়ো বড়ো হাই তুলতে লাগলাম। কাজ না থাকলে অফিসে কেমন ভাটবাজি হয় সেটা দেখা গেল। অবশ্য শুধু বুধন নয়। অনেকেই নাকি এখানে ভূত দেখেছে। এমন বিশ্বাসের সাথে তারা বলবে যে, মনে হবে না গুল মারছে। কোনও কোনও জায়গায় থাকলে মনে হয় এই মানসিকতাটা চলে আসে। কলকাতার ঝাঁ চকচকে শপিং মলগুলিতে হিয়ার সাথে যখন ঘুরি, তখন ভূত শব্দটাই কোনওদিন শুনেছি বলে মনে হয় না। এখানে এই কম লোকবসতির এলাকায় হয়, এখানে জঙ্গল আছে, পাহাড় আছে, নদী আছে, অথচ মানুষ খুব কম। আমাদের কারখানার লোক আর সামান্য কিছু স্থানীয় লোক। এখানে ভূত দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই যা বুঝেছি। ছায়া হয়ে ঘোরাফেরা করবে, এর বেশি আর কী করবে? কথা বলতে পারলে অবশ্য ভালো হত। আমার সময়টা কেটে যেত।

৯।

উৎসা রান্না করে ভালো। নাইট করে এসে ঘুমোচ্ছিলাম বাড়িতে। সম্বিত ফোন করেছিল সকালে। ঘুমের মধ্যেই ওর নেমন্তন্নটা নিয়েছিলাম। উৎসা বিরিয়ানি রাঁধবে রাত্তিরে। সন্ধ্যের পরে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছু মিষ্টি কিনলাম। রোজ রোজ খালি হাতে যাই, ব্যাপারটা ভালো দেখায় না।

উৎসা যখন রান্না করছিল সম্বিত এক পেগ জনি ওয়াকার খাওয়াল। শখ করে কিনেছে। ভালোই লাগছিল। আমি খুব কম ড্রিঙ্ক করি। কম দামি জিনিসে হ্যাংওভার হয়, সেসব খেলে আমার অসুবিধা হয়। মাথা ভারি হয়ে থাকা আমার পোষায় না। সম্বিতের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল মাঝে মাঝে এরকম শখ করে এক আধটা বোতল কিনে রাখাই যায়। ইচ্ছা হলে এক দেড় পেগ খেলাম। মদ খাওয়াটা হিয়া পছন্দ করে না। আসলে আমাদের সমাজে মদ খাওয়া নিয়ে অদ্ভুত টাইপের কিছু ধারণা আছে। মাতাল হয়ে যায়, চরিত্র ঠিক থাকে না এই সব। যত্তসব!

এর থেকে আমার অনেক বেশি ঘেন্না লাগে ঐ পানমশলা খেয়ে পিক ফেলা আর থুতু ফেলে রাস্তায় নোংরা করা লোকজনকে।

বিরিয়ানি কত রকমের হয় আমি জানি না, জানার দরকারও নেই তবে উৎসার বিরিয়ানিটা ফাটাফাটি হয়েছিল। আমি যদিও সেটা হিয়াকে বলব না, কারণ মেয়েরা আর সবকিছু সহ্য করতে পারে, আরেকটা মেয়েকে সহ্য করতে পারে না। কিছুতেই মেনে

নিতে পারে না আরেকজনের প্রশংসা। ইন ফ্যাক্ট আমি এত ঘন ঘন এদের এখানে খাওয়া দাওয়া করতে আসি সেটাও হিয়ার পছন্দ না। আজকাল তো ওকে বেমালুম ঢপ মেরে দি। 'প্ল্যান্টে নেমন্তন্ন ছিল' কিংবা 'রাজীব খাওয়াল' ইত্যাদি।

খাওয়ার পরে জনি ওয়াকারের গুণেই হয়তো, ওদের নেমন্তন্ন করে বসলাম আমার বাংলোয়। হিয়ার বাবা মা যেদিন আসবেন সেদিনই। কারণ রোজ রোজ ওদের অন্ন ধ্বংস করছি, এই ব্যাপারটা আমার ঠিক ভালো লাগছিল না। তখন অফিসের একজন রান্না করবে, সুতরাং অসুবিধেও হবে না। আর হিয়ার বাবা মা কথা বলারও লোক পাবে। আমি বরাবরই কম কথা বলি। ওদের ভালো লাগার কথা নয়। উৎসা খুশিই হল। বলল, "যাক তোর হবু শ্বশুর শাশুড়ি আসলে অন্তত তোর মাসি একটু লুকিয়ে থাকবে, তখন আর আমাদের দিকে বেশি নজর দেবে না, বল?"

আমি হেসে ফেললাম ওর কথা শুনে। তারপর বুধন ধাড়ার সেই গল্পটা শোনালাম। উৎসা মুখ শুকিয়ে বলল, "আর দিন পেলি না নেমন্তন্ন করার।"

১০।

স্টেশনে আমার জন্য সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিল। এমন একটা সারপ্রাইজ যেটা আমি কল্পনাতেও আনিনি। ওর বাবা মার সাথে হিয়াও চলে এসেছে। অথচ বলেছিল, আমি বিয়ের সময় ছাড়া তোমার ওখানে যাব না। আমি সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করলাম, শুনে খানিকটা থমকে বলল, "তাহলে চলে যাব?"

আমি ওর বাবা মার সামনে আবার সিন ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে বুঝে একটু অস্বস্তিতে পড়ে অন্যভাবে ম্যানেজ করার চেষ্টা করলাম, "আমি আসলে খুব খুশি হয়েছি তুমি এসেছ বলে।"

এই কথায় ওর মুখে হাসি ফিরে এল।

স্টেশন থেকে আমার বাংলো যেতে বেশ খানিকক্ষণ লাগে। পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে বেশ সুন্দর জায়গাতেই আমার বাংলোটা। অফিসের একটা লোককে জোগাড় করেছিলাম ভালো রান্না বান্না করেন, উনি দেশী মুরগীর ঝোল আর ভাত রেঁধেছিলেন। সবকিছু মিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে ওদের ভালো লেগেছে। হিয়ারা বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের, আমার বাংলোর ব্যবস্থাপনা ওদের খুশি করবার পক্ষে যথেষ্ট। হিয়া আসবে সেটা আগে বুঝিনি। সম্বিত আর উৎসাকে নেমন্তন্ন করে দিয়েছি। ভেবেছিলাম

হিয়া রেগে যাবে কিন্তু বলাতে দেখলাম খুশিই হল। বলল, "ভালোই হল পরিচয় হয়ে যাবে তোমার কলিগের সাথে।" সাধে কী বলে মেয়েদের মন বড়ো বিচিত্র চিজ!

দুপুরে ওর বাবা মা ঘুমালে আমি আর হিয়া হাঁটতে বেরলাম। হাঁটতে হাঁটতে নদীর তীরে গিয়ে বসলাম। হিয়া বলল, "কী অদ্ভুত সুন্দর না? তুমি এখানে আসো?"

আমি মাথা নাড়লাম, "সময় কোথায়?"

"এটাই হয়। কাছে থাকলে আর কাছে যাওয়ার সময় পাওয়া যায় না।"

হিয়ার কথাটা ভালো লাগল আমার। কাছে থাকলে কাছে যাওয়ার সময় পাওয়া যায় না। আমি বললাম, "আমি আর তুমি আসব রোজ বিকেলে?"

হিয়া হাসল, "আসব মানে? আসতে হবেই। সারাদিন ঘরে বসে বোর হব আর বিকেলেও ঘরে থাকব এটা হয় নাকি? তুমি দেখো, এখানে এলে সব চিন্তা-টিন্তা দূর হয়ে যায়। ঠিক যেরকম সমুদ্রের তীরে বসলে হয়।"

"চিন্তা আছে? মানে তোমার চিন্তা কীসের?" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। হিয়া অদ্ভুত চোখে তাকাল আমার দিকে। "আমার কেন জানি না মনে হয় এই বিয়েতে তুমি খুশি না। ইন্দ্রর ব্যাপারটা প্রথমে তোমাকে বলিনি। পরে বললাম। মনে হয় একরকম জোর করেই তুমি এই বিয়েটা করছ। সব ঠিক হয়ে গেছে, তারপর সবকিছু জানার পরে মন থেকে তুমি এই সম্পর্কে থাকতে চাইছ না।"

আমার মধ্যে হঠাৎ করে একটা অপরাধবোধ জন্ম নিল। ঠিকই তো, হিয়া আসলে যেটা বলছে, সেটা ভুল কোথায়। এই বিষটা গত কদিন ধরে আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি জানি ভবিষ্যতেও খাবে। কিন্তু একই সাথে এটাও সত্যি যে, হিয়া ছাড়া আমি আজকাল কোনও কিছু চিন্তা করি না। এই সম্পর্কটা ভাঙা যাবে না। কিছুতেই না। বললাম, "দেখো, ইন্দ্রর ব্যাপারটা জানার পরে আমি বেশ ডিস্টার্বড হয়েছিলাম। কিন্তু এখন মনে হয়, আমি ওভাররিয়্যাক্ট করেছিলাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি হিয়া। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় প্রথম প্রেমটা অন্য জিনিস। আমি তোমার প্রথম প্রেম হতে পারলাম না বলে কষ্ট হয়।"

হিয়ার মুখটা ছোটো হয়ে গেল। আমি ডান হাত দিয়ে ওকে কাছে টানলাম। হিয়া আমাকে ছাড়িয়ে দিল। বলল, "এই বিয়েটা তুমি কোরো না। যত সমস্যাই হোক, আমি মানিয়ে নেব।"

আমি আবার ওকে জড়িয়ে ধরলাম, "এই সব কথা বোলো না, আমি আজকাল তোমাকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না।"

হিয়া বলল, "তাহলে একটা প্রমিস করো।"

আমি বললাম, "কী?"

"ভবিষ্যতে তুমি ইন্দ্রকে নিয়ে কোনও রকম কথা তুলবে না।"

আমি বললাম, "প্রমিস। এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, কীসের দিব্যি কাটতে হবে বলো।"

হিয়া হাসল, "কোনও দিব্যি না, তুমি প্রমিস করো তাহলেই হবে।"

১১।

"তোমার ঐ খানটায় একটা বেশ বড়ো সাপ দেখলাম। কেউটে নাকি?"

আমি দেখেছি সাপ দেখলেই সবাই কেউটে গোখরোই ভাবে। হিয়াকে নিয়ে ফিরছিলাম। হিয়ার বাবা বাইরের বাগানটায় বসে চা খাচ্ছিলেন। ওর মা রান্নাঘরের দখল নিয়ে নিয়েছেন। অফিসের লোকটিকে ছুটি করে দিয়েছেন। রাত্রের রান্না হিয়া আর ওর মা রাঁধবে। আমার খারাপ লাগার কোনও কারণ নেই। বরং ভালোই লাগছিল। ওনারা এখানে গেস্টের মতো থাকলে সমস্যাটা বেশি হবার কথা।

হিয়ার বাবার কথায় হিয়া আতঙ্কিত হয়ে বলল, "এখানে সাপ আছে নাকি?" আমি আশ্বস্ত করলাম, "না, না, ঐটা বিষধর না, দাঁড়াশ। ঐ জঙ্গালের দিকটায় থাকে, শীতকালে বাগানে শীত ঘুম দেয়।"

হিয়ার বাবা মাথা নাড়লেন "না হে। দাঁড়াশ থাকলে আরেকটা বিষধরও থাকবে, পার্টনার ছাড়া তো ওরা থাকে না।"

আমি নির্লিপ্ত হয়ে বললাম, "হ্যাঁ, তা আছে। তবে এদিকে বেশি আসে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে আর মানুষের যাতায়াত বেশি থাকলে সাপ থাকে না। আর সাপে এত ভয় পাবার কিছু নেই। বাগানের মালি জয়দেব ওসব খুব ভালো হ্যান্ডেল করতে পারে। ব্লিচিং ছড়ানো হয় নিয়মিতভাবে।"

হিয়া পাংশুটে মুখে বলল, "সাপে আসলে আমার ভয় নেই। ঘেন্না আছে। কেমন একটা ঠান্ডা শীতল ব্যাপার। এক ছোবলে ছবি।"

হিয়ার বাবা বললেন, "তবে জায়গাটা দুর্দান্ত আই মাস্ট কনফেস। আমি তো ভাবছি মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকব।"

আমি হাসলাম "ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। আমারও একা থাকতে বিরক্তি ধরে যায় মাঝে মাঝে।"

হিয়া বলল, "একজন লোক পেলে ভালো হত। বাংলো ছেড়ে কোথাও গেলে চুরি-টুরির ভয় আছে তো?"

আমি বললাম, “হ্যাঁ, তা তো আছেই। কিছুদিন আগে আমাদের এক সিনিয়ার ম্যানেজারের বাড়ি চুরি হল। ওরা বাজারে গেছিলেন, এসে দেখলেন সব নিয়ে গেছে।”

হিয়ার বাবা বললেন, “সেক্ষেত্রে ভ্যালুয়েবলস কিছু রেখো না এখানে।”

আমি হাসলাম, “নেইও। থাকার মধ্যে টিভি, এসি আর ফ্রিজ। ওসব ওরা নেয় না। মূলত টাকা আর গয়না টার্গেট করে। আমি এ টি এম ব্যবহার করি। বহুকাল হয়ে গেল ব্যাঙ্কে যাই না।”

হিয়ার মা বেরিয়ে এলেন, আমাকে ডাকলেন হাত বাড়িয়ে। যেতে নীচু গলায় বললেন, “এখানে কি কেউ যাতায়াত করে? রান্নাঘরের জানলা দিয়ে কী যেন গেল দেখলাম।”

আমার মাসির কথা মনে পড়ে গেল। তারপর মনে হল বিকেলবেলা মাসির ভূতের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই এখানে যাতায়াত করবে। মাঝে মাঝে ওপাশের ঝুপড়ির কিছু বাচ্চা আছে গাছের পেয়ারা পাড়তে আসে। ওরাই হবে। হাসলাম, “আসলে কিছু দুষ্টু বাচ্চা আছে ঝুপড়ির। ওরাই হবে।”

হিয়ার মা আশ্বস্ত হলেন। বললেন, “কিছু জিনিস আনার আছে। কাজু বাদাম, কিসমিস, টমেটো। এগুলো লাগবে। কেউ আছে আনার মতো, না আমরাই হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে নিয়ে আসব?”

আমি বললাম, “না না, আপনি লিস্ট করে দিন। আমি আনিয়ে নিচ্ছি।” এখানে বাজার একটু দূরে, গাড়ি করে আনতে হয়। সম্বিতের বাংলো আমার বাংলোর কাছেই, ওকে টেক্সট করে দিলে ও অফিস থেকে ফেরার সময় নিয়ে আসতে পারবে। আমি অফিস থেকে কদিন ছুটি নিয়েছি। এরকম করি মাঝে মাঝে। ছুটি নিয়ে এখানেই থাকি। সব সময় অফিস আর কাজ ভালো লাগে না। বাড়ি গেলেও সবসময় কিচির মিচির লেগেই আছে, তাই বাড়িটাও অ্যাভয়েড করি। কখনও কখনও কাছাকাছি ঘুরে আসি কোনও জায়গা থেকে। একা একাই যাই।

১২।

সন্ধ্যে সাতটার সময় উৎসা আর সম্বিত এসে গেল। হিয়ার বাবা ছিলেন না। ইভনিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন।

উৎসা এসে রান্নাঘরে চলে গেল হিয়া আর ওর মাকে সাহায্য করার জন্য। সম্বিত বসেই একটা খবর দিল। খবরটা বাজে, না ভালো বুঝতে পারলাম না। ধর

সাহেবের মেয়ে পালিয়েছে। সকাল বেলা বেরিয়েছিল স্কুলে পড়াতে। তারপর আর কী, সবকিছু ঠিকঠাক করা ছিল। বিকেলবেলা ফোন করে বলেছে, ও ঐ ছেলেটাকে বিয়ে করেছে। ওর বাবা এই বিয়ে মেনে নিলে ফিরবে। নইলে ফিরবে না। সম্বিত বলল, "ভালো হয়েছে। খিটখিটে বুড়ো একটা। এক একটা ফাইল সাতদিন করে আটকে রেখে দেয়। মেয়ে প্রেম করছে তা সেটাকে আটকানোর কী আছে?"

আমার ধরসাহেবের সেদিনের সেই বিমর্ষ মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বললাম, "না রে। লোকটা সেদিন আমার কাছে দুঃখ করছিল। মেয়েটা শুধু প্রেম প্রেম করেই গেল। বাপের প্রতি কি কোনও কর্তব্য নেই?"

সম্বিত মাথা নাড়ল, "সেটা তো আমরা এখন বুঝি। কলেজে যখন পড়তাম, তখন কি কোনওদিন বাবা মাকে বুঝতে চাইতাম নাকি? ছেলেমেয়েরা তো সেরকম হবেই। বাপ মায়ের নজরদারিটাও তো দরকার। এই লোকটা অফিসে সন্ধ্যে ছটা অবধি কাজ করে। মেয়ে কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে কী করে বুঝবে।"

আমি বললাম, "সমস্যা তো সেটাই। ফ্যামিলি লাইফ আর অফিস লাইফ ব্যালান্স করতে করতেই তো আমাদের প্যান্ট হলুদ হয়ে যাবে। ধর সাহেবকে দোষ দিয়ে লাভ কী? এ জিনিস যে আমাদের সাথে ঘটবে না, তার কোনও গ্যারান্টি আছে? তা ছাড়া ধর সাহেব খিটখিটে হলেও লোকটা আসলে খারাপ না। ফাইল পত্তরে কোনও সমস্যা হল ডেকে মিটিয়ে নেন।"

সম্বিত বলল "কী করবি? একবার ফোন করা কি ঠিক হবে?"

আমি মাথা নাড়লাম, "পাগল? পরে অফিসে কথা বলে নেব। এখন ফোন করে কেউ?"

সম্বিত বলল, "ছেলেটাকে আমি দেখেছি, খুব একটা সুবিধের নয়। লাস্ট পুজোয় চাঁদা চাইতে এসেছিল। কেমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। আপনারা অফিসাররা মোটা টাকা না দিলে কলোনির পুজো কেমন করে হবে? মনে হচ্ছিল দি একখানা কষিয়ে। মেয়েরা যে এই টাইপের ছেলের মধ্যে কী দেখে কে জানে।"

আমার হঠাৎ করে ইন্দ্রর কথা মনে পড়ে গেল। ইন্দ্র শুনেছি এরকমই একজন। সত্যিই, মেয়েরা এদের মধ্যে কী দেখে, কে জানে।

আর অবধারিতভাবে একটা প্রশ্ন মাথায় চলে এল, হিয়া ভার্জিন তো?

১৩।

আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। উৎসাকে বারণ করিনি হিয়াকে মাসির ব্যাপারে বলতে। এবং এর ফলে যেটা চাইনি সেটাই হল। হিয়া জেনে গেল। হিয়ার মা-ও। হিয়ার মা আলাদা করে ডেকে নিয়ে একটু ইতস্তত করে আমাকে বলেও ফেললেন, "এই বাংলোটা তুমি চেঞ্জ করে নিতে পারবে না?"

আমার নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল। মুখে হাসি এনে বললাম, "আসলে উৎসাকে ভয় দেখানোর জন্য আমি এসব বলেছিলাম। ঐ ভূত-টুত বলে কিছু আছে নাকি?"

হিয়ার মা এই কথা শুনে মনে হল না খুব একটা আশ্বস্ত হয়েছেন। বললেন, "আমার কিন্তু বিকেলে ঐ হঠাৎ করে জানলার পাশ দিয়ে কিছু সরে যাওয়াটা দেখে বেশ ভয় লেগেছিল।"

আমি উড়িয়ে দিলাম, "না, না, ভূত অত সোজা জিনিস নাকি? একদম টেনশন করবেন না।"

হিয়া অবশ্য দেখলাম খুব একটা চাপ নিল না। বলল, "আমার তো খুব এক্সাইটেড লাগছে। কলকাতা থেকে এত দূরে এত সুন্দর একটা জায়গায় একটা হন্টেড হাউসে থাকব। কী রোমান্টিক না?"

উৎসা মুখ ব্যাঁকাল, "রোমান্টিক না ছাই। থাকো না কদিন। দেখবে কেমন বোর লাগে। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় পালিয়ে যাই।"

হিয়া বলল "আমার কলকাতা একদম ভালো লাগে না। ভালোই হল। আর তোমার মাসির ভূত এলে তো ভালোই। যখন তুমি থাকবে না, তখন মাসির সাথে আড্ডা মারা যাবে।"

আমি হেসে ফেললাম। যাক, হিয়াকে নিয়ে যে চিন্তাটা ছিল, সেটা গেল। ভূতের ব্যাপারে ও আমার মতোই স্পোর্টিং।

হিয়ার মা কিন্তু হাসলেন না। বুঝতে পারছি এই ব্যাপারটায় উনি খুব একটা প্রসন্ন হননি। হিয়ার বাবা হেঁটে ফিরলেন। ভূতের কথাটা শুনে উনিও দেখলাম হেসে উড়িয়ে দিলেন। "তোমরা পারও বটে। ঐসব ভূত-টুত বলে কিছু আছে নাকি? ২০১৪ সালে বসে এই সব কথা বোল না। সবাই হাসবে।"

হিয়ার মা বললেন, "অশুভ কোনও কিছু থাকা কি ভালো?"

হিয়ার বাবা বললেন, “ভূত মানেই অশুভ, কে বলল সেটা? ধরো বাড়িতে কেউ নেই, চোর এল। ভূত চোরকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিল। সেটা আর অশুভ হল কোথায়? বরং সেটা তো ভালো হল। শুভ হল।”

সম্বিত বলল, “না, না, এই সব আজগুবি ব্যাপার আসলে। সমস্তটাই অর্জুনের উর্বর মস্তিস্কের কল্পনা। উৎসাকে ভয় পাওয়াবার জন্য এটা করেছে।”

উৎসা বলল, “ভয় পাওয়ানোর জন্য হলে ভালো। কিন্তু তা না হলে ব্যাপারটা মোটেই ভালো না। মেয়েটা এখানে একা একা থাকবে। সপ্তাহে অর্জুনের দুটো নাইট শিফট। তখন কী হবে?”

আমার এবার উৎসার ওপর রাগ হল। কী দরকার তোর এখন এত বেশি বকার? এত ওয়েলউইশার থাকলে তো মহা সমস্যা!

তবে হিয়ার বাবা এবারেও ম্যানেজ করে নিলেন। বললেন, “এত সব কথা চিন্তা করে লাভ নেই। সেগুলি বিয়ের পরে ভাবা যাবে। এটা একটা ওয়ান্ডারফুল প্লেস। কীরে হিয়া তোর কী মত?”

হিয়া হেসে বলল “আমার অ্যাটলিস্ট এক ফোঁটাও ভয় লাগছে না।”

হিয়ার মা মুখ কালো করে থাকলেন।

আমি কথা ঘোরাতে বললাম, “আমার কিন্তু বেজায় খিদে পেয়েছে, খেয়ে নিলে হত না?”

হিয়া আর হিয়ার মা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

১৪।

রান্না বেশ ভালোই হয়েছিল। অনেকটা মাংস খেয়ে ফেললাম। হিয়া রান্নাটা করে বেশ খুশি বোঝা যাচ্ছিল। উৎসা আর সম্বিত বেশ প্রশংসা করল রান্নার। খেতে খেতে উৎসা রেসিপি জানতে চাইল, আর হিয়া সোৎসাহে সেটা বলতে লাগল। এই একটা জিনিস আমি দেখেছি মেয়েদের। রান্না করবে নাকি তার ঠিক নেই, রেসিপি বলতে হবেই আর সেটা নিয়েই বেশ অনেকটা সময় পার করে দিতে পারে এরা। তবে একথা ঠিক, এই বন্ধুবান্ধবহীন জায়গায় কথা বলার মতো কাউকে পাওয়াটাও দুষ্কর। সে কারণে উৎসাকে দোষও দিতে পারি না আমি। এমনিতে সারাদিন একা একা থাকে, আর সম্বিতও কথা বেশি বলে না। এতদিন পর কলকাতার কাউকে পেয়ে যেন ওর লকগেট খুলে গেছিল।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ওরা চলে যাওয়ার পর হিয়া আর ওর মা খেতে বসল। ওরা বেশ নিজেদের মতো করে মানিয়ে নিয়েছে দেখে ভালো লাগছিল। কালকের দিনটাও ওরা থাকবে। তার পরের দিন চলে যাবে। এটা একপ্রকার সার্ভে টাইপ ব্যাপার আর কী। বিয়ের পর যেখানে থাকবে, সেটা এক ঝলক দেখে আসা। আমার অবশ্য এখানেই সারাজীবন চাকরি করব, এরকম কোনও নিশ্চয়তা নেই। চাকরি চেঞ্জও করতে পারি। তবে সেটা অদূর ভবিষ্যতে না এ ব্যাপারে নিশ্চিত। এখানে আমার বাবা মা খুব কম আসে। বাড়ি ছেড়ে আসাটা খুব সমস্যা। ছুটি ছাটার সমস্যা আছে। তাছাড়া রাজ্যের কাজ পড়ে থাকে বাড়িতে। মা অবশ্য এটা পুষিয়ে দেবে সারাদিন ফোন করে করে জ্বালিয়ে। 'খেলি? না খেলি না?' মাঝে মাঝে পাগল পাগল লাগে। এখনও মাঝে মাঝেই ফোন করছে হিয়ার বাবা মা কী বলছে এই বাংলো ইত্যাদি দেখে সেটা জানার জন্য। এক কথা বলেও শান্তি নেই। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করতেই থাকবে।

হিয়ার বাবা বারান্দায় গেলেন সিগারেট খেতে। ভদ্রলোক চেন স্মোকার মনে হয়। মাঝে মাঝেই সিগারেট আর লাইটার বের করছেন। হিয়ার মা খেতে খেতে বললেন, "উৎসার কাছে শুনলাম তোমাদের কোন কলিগের মেয়ে নাকি পালিয়ে বিয়ে করেছে?" আমি হাসলাম। ছোটো জায়গা। কোনও ঘটনা ঘটলে সবাই সেটা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আর উৎসা তো যা বুঝছি বিবিসি এক্কেবারে। বললাম, "হ্যাঁ, আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোকের।"

হিয়া বলল, "তারপর কী হল?"

আমি বললাম, "জানি না, আমিও তো সম্বিতের থেকেই শুনলাম।"

হিয়ার মা বললেন, "এই পালিয়ে বিয়ে করাটা দশ বারো বছর আগেও খুব বেশি হত। এখন খুব একটা শুনতে পাওয়া যায় না।"

আমি বললাম, "এখানে শোনা যায়, এদিকে তো হামেশাই ঘটছে। পালিয়ে বিয়ে মানে তো আসলে এক হাতে তালি বাজে না। কিছু ছেলেপিলের তো কোনও কাজ নেই, সারাদিন মেয়েদের পিছনেই পড়ে আছে, একটা সময়ের পরে মেয়েরাও মেনে নেয়।"

কথাটা বলে আড়চোখে হিয়ার দিকে দেখলাম, বুঝতে চেষ্টা করলাম ও কিছু বুঝল নাকি। হিয়া বুঝল না। বলল, "হ্যাঁ, কাজ-টাজ করবে না, সারাদিন মেয়েদের স্কুল কলেজের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। টিজ করবে। এদের মেরে তাড়ানো উচিত।"

আমি আরেকটু এগোলাম "কিন্তু দেখবে, এই ছেলেদের প্রতিই মেয়েরা বেশি অ্যাট্রাক্টেড হয়। কী পায় এদের মধ্যে কী জানি।"

হিয়া এবার বুঝল। মুখটা গম্ভীর হল ওর। কিন্তু ওর মা আছেন বলে কিছু বলল না।

হিয়ার মা বললেন, "ওটা কম বয়সের মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। বয়ঃসন্ধির সময়ে। আসলে তখন সবকিছুই ভালো লাগতে শুরু করে। তোমার ঐ কলিগের মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক তো?"

আমি দেখছিলাম হিয়ার মা বলছিলেন আর হিয়া সংকুচিত হয়ে যাচ্ছিল। বললাম, "হ্যাঁ, ২৩-২৪ বছর বয়স হবে। প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়।"

"ওহ, চাকরি করে। তাহলে তো নিজের পায়ে দাঁড়ানো মেয়ে। তাহলে তো আর কিছু করার নেই। ছেলেটা দেখেশুনেই ছিপ ফেলেছিল আর কী।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। আমি দেখেছি, লোকাল পার্টি করে, পুজো টুজোয় অ্যাক্টিভলি থাকে। লোকজন চেনে। সাপোর্ট পাবে ছেলেটা। বেকার ছেলে। মন থেকে মেনে না নিলেও ধর সাহেবকে মেনে নিতে হবে। না মেনে যাবেন কোথায়?"

হিয়ার মা বললেন, "এই রকম মেয়েদের বাবাদের অবস্থাটা বোঝ। হিয়ার পেছনে একবার এরকম একটা ছেলে খুব লেগেছিল আদা জল খেয়ে। হিয়ার বাবা একদিন দিয়েছিল কড়কে। তারপর সেই যে পালাল আর আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখতে পাইনি।"

হিয়া ওর মায়ের এই কথায় খুব রেগে গেল, "আহ মা, যত উলটোপালটা কথা, চুপ কর তো।" খাবার বাকি রেখেই উঠে গেল টেবিল থেকে। হিয়ার মা ওর মেয়ের এই ওভার রিঅ্যাকশানে বেশ চাপ খেয়ে গেলেন। বললেন "দেখো তো কী অবস্থা। আরে এটা নিয়ে এত রেগে যাবার কী হল?"

আমি ভাবছিলাম ওর মা কি জানতেন না হিয়ার ব্যাপারটা? নাকি বেশি ভালো সাজতে চাইছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম "ঐ ছেলেটার নাম কী ছিল?"

হিয়ার মা কাঁধ ঝাঁকালেন "কী জানি, ঐ সব রাস্তার ছেলের নাম জেনে কী লাভ। ল্যান্ড লাইনে ফোন করে বিরক্ত করত, বাড়ির সামনে পায়চারি করত। ওর বাবা দেখে একদিন দিয়েছিল রাম ঝাড়। তারপর সেই যে পালাল। বাজে টাইপের ছেলে ছিল আর কী। আচ্ছা বাদ দাও, তুমি দেখো না মেয়েটা আবার রাগ করল কেন?"

আমি ছুটলাম হিয়ার পেছনে।

১৫।

বাজার করতে আমার ভালো লাগে না। এই বাজারে মাছ খুব ভালো আসে না, দামও বেশি, তবে হিয়ারা কাল চলে যাবে। কোনও ছোটো মাছ পাওয়া যায় নাকি, সেটা দেখতেই বেরিয়েছিলাম। নদীর মাছ সব শহরে চলে যায়, লোকাল মাছ যা পড়ে থাকে, তা চড়া দামে বিক্রি হয়। লোকাল মাছের স্বাদ আলাদা। বেরোলাম সেই ভাগ্য পরীক্ষা করতেই। যদি হিয়ার কপাল ভালো থাকে, তাহলে এখানকার কাজলি মাছ পেয়ে গেলে তো দারুণ ব্যাপার। ম্যাডামের মুড ঠিক নেই। কাজলি মাছ মুড ঠিক করে দেবার জন্য যথেষ্ট।

বাজারে যেতে ক্লাবের সামনেটায় বেশ বড়োসড়ো একটা বচসা হচ্ছে দেখে সেটাকে এড়িয়ে যেতে গিয়ে দেখি একটা চেনা গলা। ধর সাহেব। কৌতূহলী হয়ে এগোতে শোনা গেল বেশ চ্যাঁচামেচি চলছে দু পক্ষে। ছেলে বেশি দূর যায়নি, মেয়ে নিয়ে এলাকায় রাত্তিরেই ঢুকে গেছে। ধর সাহেব বেশ গলা উঁচু করেই বলছেন, ওনার মেয়ে পালিয়েছে ঠিক করেছে, কিন্তু ওর মায়ের গয়নাগুলিও পাওয়া যাচ্ছে না। যদি নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে যেন ফেরত দিয়ে দেয়।

ওনার মেয়েও আছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে। মুখটা দেখে যা বুঝলাম বাবার এই চেঁচামেচি তার একটুও পছন্দ নয়। ছেলেটি বেশি কিছু বলছে না, কিন্তু যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হচ্ছে, যে কোনও মুহূর্তে সদ্যপ্রাপ্ত শ্বশুরের গায়ে হাত চালিয়ে দিতে পারে। সব লোকই ধর সাহেবের বিপক্ষে বলতে গেলে। অফিসের নির্বিরোধী লোকটার এরকম চেহারা দেখিনি আগে।

ছেলেটা দেখলাম চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে "বয়স তো কম হল না, দুদিন পরে শ্মশান যাবেন। গয়না নিয়ে কি ধুয়ে জল খাবেন?"

ধর সাহেব বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এই কথা শুনে, বললেন "দেশে তো একটা আইন কানুন কিছু আছে নাকি? একি দিনে ডাকাতি হচ্ছে? ঐ গয়নাগুলি আমার মেয়ের না, আমার স্ত্রীর। ওনার মৃত্যুর উপর সেগুলি আইনত আমার। আমি না দিলে তা ওর হয় কী করে? আমি কিচ্ছু দেব না ওকে।"

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ছেলেটা এবার নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল "তুমি চুপ করে আছ কেন? কিছু বলো? কিছুই তো বলছ না? ঐ গয়নাগুলি তোমরা মা তোমাকে গিফট করেছিল না? বলো সেগুলি?"

ছেলেটার বলার ভঙ্গী আর হাবভাব দেখে আমার অত্যন্ত বিরক্ত লাগছিল। মনে হচ্ছিল ধরে দু ঘা দিতে পারলে ভালো হত। অত্যন্ত উদ্ধত আচরণ। একটা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসার পরের দিন যে গয়না নিয়ে ঝগড়া করতে পারে, সে সব করতে পারে। ছেলেটার সঙ্গীসাথিগুলিও দেখলাম সব পানমশলাটাইপ। কারও চুল ক্যাটকেটে সোনালি রঙ করা, কারও হাতে ব্যান্ড, টিপিক্যাল গুন্ডা টাইপ একেকটা। একজন ধর সাহেবকে বলল, "আরে কাকা, মেনে নাও না, অনেক তো হল। কাল তো সুহাগরাতও হয়ে গেছে। সিল কেটে গেছে। আর কী হবে চিন্তা করে।" ছেলেটা একটা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করল।

মেয়েটি এখনও কিছু বলল না। ধর সাহেব ভিড়ের মধ্যে এদিক ওদিক অসহায়ের মতো দেখছিলেন, আমাকে দেখে বললেন, "ভাই অর্জুন, তুমি কিছু বলো। তুমি তো সবকিছু জানো।"

ধর সাহেবের কথা শুনে সবাই আমার দিকে তাকাল। ছেলেটা আমায় আগাপাশতলা মাপতে লাগল। বলল, "ইনি আবার কে? আপনার মেয়ের জন্য এই জামাই ধরে এনেছিলেন নাকি?"

ছেলেটার কথা শুনে আমার মাথায় আগুন চড়ে গেল, বেশ রাগী গলাতেই বললাম "অসভ্য আনকালচারড ছেলে। দাদা ধরে আর পার্টি করে বড়ো বাতেলা মারছ? ধর সাহেব আপনি চলুন। এই বাস্টার্ডদের সাথে কোনও ফালতু কথা না বলে এফ আই আর করুন গয়না চুরির।"

ধর সাহেবকে একপ্রকার হাতে ধরেই টেনে ঐ দঙ্গল থেকে বের করে আমার বাইকে বসালাম। ছেলেটা ক্রমাগত দাপিয়ে যাচ্ছে, "নিয়ে আয় যাকে পারবি নিয়ে আয়, একটা বিন্দুও ফেরত দেব না, ইয়ার্কি হচ্ছে। এখানেই থাকতে হবে তোদের, কিছু হলে সেঁকে দেব একেবারে। আমরা লোকাল ছেলে বুঝেছিস?"

আমি বেশ গতিতেই ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম। খানিকটা গেলে ধর সাহেবকে বললাম "থানায় যাব?"

ধরসাহেব বললেন, "নাহ থাক। বাড়িই চলো। নিজের সন্তান মুখ কালো করিয়েছে, আর কী হবে।" ভদ্রলোক এতক্ষণ খুব উত্তেজিত ছিলেন, ঘেমে গেছেন, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, আমি রিস্ক নিলাম না, কোম্পানি হাসপাতালের সামনে নিয়ে গেলাম গাড়িটা। উনি অবাক হয়ে বললেন, "এখানে কেন?"

আমি বললাম, "আপনি একবার প্রেশারটা চেক করিয়ে নিন, এতক্ষণ খুব উত্তেজিত ছিলেন।"

উনি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার কথা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "ছাড়ো তো, আমার কোয়ার্টারে নিয়ে চলো। আমার কিচ্ছু হয়নি।"

কথাটা বলতে বলতেই ভদ্রলোক বুকটা চেপে ওইখানেই বসে পড়লেন।

১৬।

ধর সাহেবের পরিবারে যে উনি আর ওনার মেয়ে ছাড়া কেউ ছিলেন না সেটা আজকেই জানতে পারলাম আমি। ওনার মুখেই। আর তারপর হাসপাতালের আউটডোর অবধিও পৌঁছতে পারলাম না তাকে নিয়ে। ডাক্তার দেখে বললেন, ম্যাসিভ স্ট্রোক। সময় দেয়নি এক ফোঁটাও। হাসপাতালে একা বসে বসে ভাবছিলাম কী করব। ওনার মেয়েকে খবর দিতে হবে। বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে অফিসের বসদের ফোন করে বিস্তারিত জানিয়ে দিলাম। হিয়াকেও বলে দিলাম রান্নাঘরে যা আছে, তাই দিয়ে রান্না করে নিতে। হিয়া কাল আমার সাথে কথা বলেনি। আমি ফোন করায় প্রথমে ধরেনি। দ্বিতীয়বার ধরে বেশ ঝাঁঝালো গলাতেই বলল, "কী হল?"

আমি সবটা বলায় রাগের জায়গায় ওর গলায় উদ্বেগ দেখা দিল, "তোমার কোনও ভয় নেই তো?"

আমি ওকে আশ্বস্ত করে ফোন রাখলাম। কিছুক্ষনের মধ্যেই ধর সাহেবের মেয়ে জামাই চলে এল। মেয়ে এসে কান্নাকাটি শুরু করল। ছেলেটা তেমনই উদ্ধতভাবেই হাসপাতালে ঘুরতে লাগল। ন্যূনতম লজ্জাবোধটুকুও নেই ছেলেটির মধ্যে। আর আরও হাস্যকর ব্যাপার হল, ধর সাহেবের মৃত্যুর পর এখন সবকিছুই এই পাবে।

অফিসের অনেকেই এসে পৌঁছলেন। প্রীতমদা এসে বললেন, "তোমার কী কপাল অর্জুন, শেষে তোমার হাতেই বুড়ো মরল।"

সামনাসামনি এরকম মৃত্যু আমি এরকম দেখেছিলাম এর আগে আমার ঠাকুরদার। আর দেখলাম ধর সাহেবের। আমারও বেশ চাপ লাগছিল। আমাদের ডি জি এম সাহেব এসে পড়েছিলেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি হাসপাতাল ছাড়লাম। বাইরে এসে দেখি কে বা কারা আমার বাইকের সিটে ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে কেটে রেখে দিয়েছে। ঐ ছেলেটার কতগুলি বন্ধু কাছেই হাসাহাসি করছিল। পরিষ্কারই বুঝলাম, এটা কাদের কাজ। কিছু বললাম না। ক্লান্ত লাগছিল।

একটা বড়ো গাড়ি করে প্ল্যান্টের শ্রমিক নেতা তথা এম এল এ এলেন। আমাকে চেনেন খুব ভালো করে। ঐ চ্যাংড়া ছেলেগুলো এর খোঁয়াড়েই থাকে সারাদিন। আমায় দেখে দাঁড়ালেন। বললেন, "খুব বেঁচে গেলেন চ্যাটার্জি সাহেব। লোকটা মরে গিয়ে

আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। নইলে শ্রমিকদের সাথে বাজে কথা বলার দায়ে আপনার নামে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হতাম।”

আমি কোনও কথা বললাম না। বলতে পারতাম সারাদিন মেয়েদের কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটা কোন শ্রমিকের কাজ? আর কে কাকে বাজে কথা বলল? একজন বয়স্ক মানুষকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবাই উলটোপালটা কথা বলল, দোষ হল আমার? কিন্তু আর ভালো লাগছিল না।

গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে বাজার গেলাম না আর। নিজের বাংলোয় ফিরে এলাম।

১৭।

ফিরতে ফিরতে একটা বেজে গেল। কীসব নিয়ম আছে, শ্মশান থেকে ঘরে ঢোকার সময় আগুন টাগুন ছুঁয়ে ঢুকতে হয়, আর আমি তো একেবারে মরার সাথেই ছিলাম। হিয়ার কাছে যা শুনেছি ওর মা বেশ খুঁতখুঁতে এসব ব্যাপারে, তড়িঘড়ি বাইরের কলেই স্নান করে নিলাম। অ্যালার্জির ধাঁচ আছে আমার। ঠান্ডা লেগে যাবে নির্ঘাত, কিন্তু কিছু করার ছিল না, স্নান না করলে আমার নিজেরও একটা ঘেন্নাবোধ থেকেই যেত। ওইভাবে হঠাৎ করে একটা জলজ্যান্ত জীবন্ত লোক আমার চোখের সামনে একটা জড় পদার্থে পরিণত হয়ে গেলেন। এতদিন ফাইল নিয়ে যেতাম ওনার কাছে, কাজের বাইরে একটা কোনও ফালতু কথা আলোচনা করতেন না। তার বাড়িতে কে আছে, ফ্যামিলিতে কে আছে এই দুদিন আগেও কিছুই জানতাম না, অথচ আজকে কীভাবে তাঁর যাওয়াটা দেখলাম একেবারে চোখের সামনে। আচ্ছা, এই মৃত্যুকে কি অপঘাতে মৃত্যু বলে? না বোধ হয়। বাসে ট্রামে কাটা পড়লে, খুন হলে কিংবা আত্মহত্যা করলে সেটাকে অপঘাতে মৃত্যু বলা হয়। কিন্তু এটা তো আসলে খুনই। ওভাবে একটা হাই প্রেশারের রুগিকে উত্তেজিত থেকে আরও উত্তেজিত করে দেওয়া তো খুনের চেষ্টার সমতুল্য হওয়া উচিত। ওনার তো এক মেয়েই ছিল, আশা আকাঙ্খা সবকিছুই ঐ মেয়ে। ঐ মেয়ে নিজের বাবার কথা ভাববে না একবার? সারা দুপুর আমার মাথার মধ্যে এইসব পাক খেতে লাগল। শুয়ে শুয়ে ঘুম আসল না আর।

হিয়া আর ওর বাবা মা আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে আমাকে বেশি বিরক্ত করেনি। বিকেল নাগাদ হিয়া আমার ঘরে নক করল। আমি দরজা খুলে দেখি ও বেশ টেন্সড। “তুমি ঠিক আছ তো?”

আমি হাসার চেষ্টা করলাম, “কেন বলোতো?”

হিয়া আমার খাটের ওপর এসে বসল, “যা গেল সারাটা দিন। ঈশ, এভাবে সামনা সামনি কাউকে মারা যেতে দেখাটা কী ভয়ংকর, তাই না?”

আমি বেশ শব্দ করে একটা হাঁচি দিলাম। হিয়া আঁতকে উঠল, “আরে ঠান্ডা লাগালে নাকি?”

আমার হাঁচি শুরু হলে পর পর হতে থাকে। বেশ কয়েকবার হাঁচার পরে শান্ত হলাম। হিয়া আমার অ্যালার্জির সমস্যাটার কথা জানত। বলল, “অলডে আছে তো? একটা খেয়ে নাও।”

আমি ড্রয়ার হাতড়ে একটা অলডে বের করে খেলাম। অলডে আমি নিজে থেকেই খাই। কোনও ডাক্তার আমাকে দেননি। আমার অ্যালার্জি হলে দেখেছি এই ওষুধটা বেশ কাজ দেয়। নিজেই ডাক্তারি করি। অলডে খেয়ে বোতলটা রাখতে গিয়ে দেখি দেওয়াল থেকে একটা সাদা ছায়া সরে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। মাসি। চিরকাল আড়ি পাতা অভ্যাস। মরার পরেও সে স্বভাব যায়নি। বললাম, “চলো একটু নদীর তীরে ঘুরে আসা যাক।”

হিয়া বলল, “এখন যাবে? তোমার যে লেভেলে ঠান্ডা লেগেছে, এখন রেস্ট নিলে হত না? আজ তো তোমার নাইট আছে?”

আমি হাত নাড়লাম, “কাটাও, নাইট যাব না, চলো একটু ঘুরে আসি। কাল তোমরা চলে যাবে, আমার ভালো লাগবে।”

এখন অক্টোবরের শেষ, পুজোর পরে এই সব জায়গায় একটু একটু ঠান্ডা পড়তে শুরু করে, একটা মাফলার নিয়ে নিলাম সাথে।

১৮)

“কালকে যখন তুমি আবার ইন্দ্রকে নিয়ে আলোচনা তুললে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। কাল রাতে আমি ভেবেছিলাম আজ সকালেই বাড়ি চলে যাব।”

হিয়ার কথায় আমার কেমন লজ্জা লাগছিল। বললাম, “প্লিজ ঐ কথাটা বলে এখন আর আমাকে বিড়ম্বনায় ফেলো না। আমি ঐ নামটা আনতে চাচ্ছি না, নিজে থেকেই চলে আসছে, তবে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে পারব এই ব্যাপারটা থেকে মুক্ত হতে। আমরা যত বেশি নিজেদের নিয়ে আলোচনা করব তত বাকি সব ব্যাপারগুলি গৌণ হয়ে যাবে, তাই না?”

আমরা একটু পড়ন্ত বিকেলেই নদীর তীরে এসেছি। গোধূলির আলোয় নদীটা অপূর্ব লাগছিল। হিয়া সেদিকে তাকিয়েই বলল, "কিন্তু তুমি পারছ না, তোমার সবকিছুর মধ্যে ঐ প্রসঙ্গটা চলে আসছে। দেখো তোমাকে আমি বলছি। আজকেই বলছি। আর বলব না। আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়তাম ইন্দ্র স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত সাইকেল নিয়ে। একবার আমাকে লক্ষ করে কাগজের মধ্যে লাভ লেটারও ছুঁড়েছিল। এইটে ওঠার সময় কী মনে হয়েছিল ও আমাদের বাড়িতে ফোন করত, আমি ওর সাথে অনেকক্ষণ ফোনে কথা বলতাম। ব্যস। এই পর্যন্তই। কয়েকদিন পরে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে বারবার যাতায়াত করত। একবার আমি এগিয়ে ছিলাম। বাবা মা পিছনে ছিল, ইন্দ্র বাবা মাকে দেখেনি। আমাকে ফলো করে এসে আমার সাথে কথা বলতে এসেছিল, আমার বাবা এসে ওকে প্রচন্ড ঝাড় দেয়, কালকে মা যেটা বলেছিল। তারপর বাড়ি ফিরে আমাকেও। অবশ্য আমাকে ঝাড়েনি। আমাকে বুঝিয়েছিল যে এই ধরনের ছেলেরা আসলে মেয়েদের শরীর ছাড়া কিছু বোঝে না। আদতে কিছুই হয় না। যেটা হয়, সেটা হল কিছুদিন পরে শরীরের খিদেটা মিটে গেলে সেই সম্পর্কে আর কিছু পড়ে থাকে না। হতে পারে ভালোবাসা থাকে অনেক সম্পর্কেই, কিন্তু সেটা খুব রেয়ার। এই মোহ শেষ হলে সব শেষ। অভাবে সম্পর্ক নষ্ট হয় না, কিন্তু অভাবের সাথে স্বভাব না থাকলে সেই সম্পর্কের আর কোনও মূল্য থাকে না। ঐ ইন্দ্র আমাকে যেমন ফোন করত, তেমন অন্য মেয়েদেরও ফোন করত। এই কথাটাও আমি পরে জানতে পারি। বাবা কোনওদিন আমার সাথে এত ফ্রাঙ্কলি কথা বলেনি। কিন্তু সেদিন বলেছিল। বিশ্বাস করো, তারপর থেকে আমি ইন্দ্রকে একেবারেই পাত্তা দিইনি। আর হ্যাঁ, তুমি সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলে আমি ইন্দ্রর সাথে কোনওদিন সিনেমা গেছিলাম কিনা। এর উত্তর হল 'না'। ইন্দ্রর সাথে আমি শুধু সিনেমা কেন, কোথাও যাইনি।"

আমি বললাম "আই অ্যাম সরি। আমি জানি এই কথাগুলি তোমার না বললেও হত। সম্পর্ক তো থাকতেই পারে, তাই না। আসলে আমার যে কী হয় সেটা আমি নিজেই জানি না ভালো করে। কথাগুলি বলার পর আমারও যে খুব ভালো লাগে তা না।"

হিয়া বলল, "দেখো, বলতে চাইলে বলবে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, এই ব্যাপারগুলি নিয়ে তুমি যত চিন্তা করবে, তত ক্ষতবিক্ষত হবে। আমার কিছু করার নেই। তোমার কিছু করার নেই। আর হ্যাঁ, তোমার যদি এখনও মনে হয় আমি তোমায় ঠকিয়েছি, তুমি পরিষ্কার বলো। এখনও আমাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে শুধু। ভেঙে দেওয়াটা কোনও ব্যাপার না। কিন্তু বিয়ের আগেই যদি ভাঙার পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে তুমি বলো কী করবে। আমাদের লাভ ম্যারেজ ঠিকই, কিন্তু কোন দাসখত লিখে দেবার ব্যাপার নেই কোনও। তুমি এখনও বলতে পারো।"

আমি হিয়াকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেলাম। হিয়া আমাকে ছাড়িয়ে নিল না। তারপর বললাম, "এই দেখো, আজকে থেকে আমি একদম চুপ করে গেলাম, আর কোনও কথা বলব না এই নিয়ে। কালকে বলেছিলাম। আজকে একদম সিল করে দিলাম।"

হিয়া ওর দুহাত দিয়ে আমার ডানহাতটা শক্ত করে ধরল। বলল "প্লিজ, এবার সামনের দিকে তাকাই চলো। অনেক তো হল অতীত নিয়ে কচকচানি।"

আমি বললাম, "তাহলে চলো, বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি, আমার বাবা মাকে বলব ডেটটা এগিয়ে আনতে?"

হিয়া হাসল, "বলো। তোমাকে আর একা থাকতে দেওয়া যাবে না, যত একা থাকবে তত ভূত চাপবে তোমার মাথায়, কোন মাসির ভূত না, তোমার নিজের ভূত।"

১৯)

ঘরে ফিরতে দেখি সম্বিত আর উৎসা এসেছে। আজকে যদিও ওদের নেমন্তন্ন ছিল না। ওরা আমাদের নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। আজকে ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন। আসলে ওরা বুঝতে পেরেছে সারাদিন ধরে আমার ওপর কী গেছে।

অলডে খাবার জন্যই হয়তো আমার খানিকটা সুস্থ লাগছিল আগের তুলনায়। তবু সোয়েটার নিয়ে নিলাম। সম্বিতের বাংলো আমার বাংলো থেকে হাঁটা পথ। আমরা সবাই গল্প করতে করতে হেঁটেই রওনা দিলাম। হিয়ার বাবা বললেন, "যা শুনলাম, তাতে ঐ ছেলেটি আবার ঝামেলা করতে পারে তো?"

সম্বিত আমার হয়ে উত্তরটা দিল, "সে ভয় নেই। আমাদের এই বাংলোগুলি প্রোটেক্টেড এরিয়ার মধ্যে আছে। কোনও রকম বেচাল দেখলে রামধোলাই খাবে বাছাধন।"

"হ্যাঁ কিন্তু বাজার-টাজার গেলে তখন তো ঝামেলা করতে পারে।" হিয়ার বাবার এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি দিলাম, "করুক না। ভয় পাই না। ভয় পেলে তো বাড়িতেই থেকে যেতে হত সারা জীবন।"

উৎসা বলল, "হ্যাঁ আঙ্কেল অর্জুনকে যে রকম গোবেচারা টাইপ মনে হয়, একবার কলেজের বাইরের কয়েকজন আমাদের ক্লাসের একটা ছেলেকে মারতে এসেছিল। অর্জুন একা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মার খেয়েছিল। কিন্তু দিয়েওছিল। ওর প্রতিরোধ দেখে তারপর সবাই সাহস করে এগিয়ে যাওয়ায় ওরা পালায়।"

হিয়ার সাথে আর সবাই অবাক আর সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। সম্বিত বলল, “বলো কী, এটা তো জানতাম না। অর্জুনকে দেখে তো কোনওদিন মনেই হয়নি এই সব করেছে।”

হিয়া বলল, “তাই তো, সেকী, এটা তো কখনও বলোনি।”

আমি ব্যাপারটাকে হালকা করতে চাইলাম, “আরে এত বিরাট কিছু না, উৎসা বাড়িয়ে বলছে।”

উৎসা জোর দিয়ে বলল, “এক বিন্দুও বাড়িয়ে বলছি না। সেদিনের পর অর্জুন কলেজের হিরো হয়ে গেল। কিন্তু ওর কোনও অহংকার নেই সেই ব্যাপারে। এত মেয়ে ওর জন্য পাগল, আর ও সারাদিন গাঁতিয়ে যাচ্ছে।”

উৎসার কথা বলার ধরনে সবাই হেসে উঠল। হিয়া আমার কানে কানে বলল, “তোমার তাহলে সিক্রেট অ্যাডমায়ারার ছিল, কী বলো? তাহলে তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যা করার করে নিতে হবে নাহলে আমার কপাল পুড়বে।”

সম্বিতদের বাড়ি এসে গিয়েছিল। সম্বিত বলল, “আজকে যদি তুই না গিয়ে ধর সাহেবকে হাসপাতালের দিকে নিয়ে যেতিস, তাহলে হয়তো ঐ ঝগড়ার জায়গাতেই ওনার অ্যাটাকটা হত। সেটাই ভালো হত। কেস খেত সব কটা।”

আমি বললাম, “ঠিকই বলেছিস, আমিও বাঁচতাম। আমার বহুদিন মনে থাকবে আজকের দিনটা।”

হিয়ার বাবা সম্বিত আর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমরা ব্রিজ খেলো? নাকি সবাই ভালো ছেলে? তাস আছে?”

ভালোই লাগছিল অনেকদিন পর ব্রিজ খেলতে। মাথাটাও অনেক হালকা লাগছিল ক্লান্তিকর দিনের শেষে।

২০)

হিয়ারা ফিরে গেছে। আমার অফিস আবার পুরোদমে শুরু হয়েছে। ধর সাহেবের জায়গায় আরেকজন এসেছেন। ইনিও বয়স্ক। তবে ধর সাহেবের মতো অত এফিসিয়েন্ট নন। সমস্ত কাজই বারবার বলে বলে করাতে হয়। সম্বিত একদিন মিষ্টি খাইয়ে গেল। বাবা হচ্ছে। আমি বলে দিলাম, শুধু মিষ্টি খাওয়ালে চলবে না, নেমন্তন্ন করে বিরিয়ানি খাওয়াতে হবে। সম্বিত এক কথায় রাজি।

ধরসাহেবের মেয়ে শ্রাদ্ধ দিল বাবার। আমি যাইনি। আমার যদিও আলাদা করে নেমন্তন্ন ছিল, তবু আমি গেলাম না। ওরা যে দাগগুলো বাইকের উপর চালিয়েছে সেই ঘটনাটা আমি এখনও ভুলতে পারিনি। একদিন প্ল্যান্ট থেকে দেরি হয়ে গেছিল ফিরতে। দেখলাম রাস্তার ওপরেই ছেলেটাকে কয়েকজন বেধড়ক পেটাচ্ছে। কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করতে জানা গেল, সাট্টার ঠেকে সর্বস্ব খুইয়ে তারপরে দেনা করে পাওনাদারদের টাকা শোধ করতে পারেনি। কথাগুলি শুনে ধর সাহেবের সেই বিমর্ষ মুখটা মনে পড়ে গেছিল হঠাৎ। মাসিও আছে মাসির মতো। টিভি চালালে মাঝে মাঝে ছায়া দেখা যায়। আগে যে রকম দেখা যেত। এক আধটা বাংলা সিরিয়ালও দেখি মাসির অনারে। বুঝতে পারি মাসি দেখছে।

এক মাস পরে বিয়ে। দু বাড়িতে তোর জোর শুরু হয়েছে।

ভালোই আছি...

❑ ❑ ❑ ❑

লেখক পরিচিতি

সৈকত মুখোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থদপ্তরে আধিকারিক। ২০০৬ সালে 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার'-এ প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। ছোটোদের জন্যে প্রথম উপন্যাস 'শের ই সিড়িঙ্গোপুর' কিশোরভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে।

প্রকাশিত বইঃ গ্রহান্তরের গাঁজাখোর, মরণবিভা, মারাং গ্রামের পান্থশালা, রক্তকস্তুরি, নাইটির প্রতি বারমুডা।

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

লেখক, সম্পাদক, গবেষক, ভবঘুরে। নামী-অনামী কাগুজে ও অ-কাগুজে নানান পত্রপত্রিকায় প্রায় বিশ বছর ধরে লেখালেখি। শুরু অসমের সময় প্রবাহ খবরের কাগজ দিয়ে। জয়ঢাক নামে ছোটোদের ই-পত্রিকার সম্পাদক। উত্তরপূর্বের অর্থনীতির ধারা ও গুহাছবিতে চিত্রভাষার ওপরে দুটি গবেষণাপত্র যথাক্রমে কমনওয়েলথ পাবলিশার্স ও গুয়াহাটির ইন্দোলজির জার্নাল The Heritage থেকে প্রকাশিত। ভ্রমণ সাহিত্যের জন্য 'ভ্রমণ আড্ডা' জার্নালের 'কলম' পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রকাশিত বইঃ ইলাটিন বিলাটিন, বনপাহাড়ি গল্পগাথা, আগামিকালের ছড়া, দোর্দোবুরুর বাক্স, ঈশ্বরী।

মহুয়া মল্লিক

বোটানি ও এডুকেশান নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনার পর মহুয়া মল্লিক কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেন; বর্তমানে একটি স্কুলে শিক্ষিকা হিসাবে চাকরি করছেন। লেখালেখির শুরু ছোটোবেলা থেকেই। কবিতা প্রথম ভালোবাসা। বর্তমানে বেশ কিছু পরিচিত পত্রিকায় তাঁর ছোটোগল্প দেখতে পাওয়া যায়।

প্রকাশিত বইঃ তিলফুল, প্রজাপতি করিডোর, শূন্য ক্যানভাস।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পেশায় ইলেকট্রনিক্স এ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশান ইঞ্জিনীয়ার দেবাশিস একটি সরকারি বিদ্যুত উৎপাদনকারী সংস্থায় কর্মরত। চাকরিসূত্রে সময় কেটেছে রাঢ় ও ঢাঁড় বাংলায়। এই অঞ্চলের প্রকৃতি, অদ্ভুত মানুষজন, গল্পবুড়ো এবং গল্পবুড়ির সংস্পর্শে এসে গল্পকার হয়ে ওঠা। ছোটোগল্প প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে। দেশ, পরিকথা, অমৃতলোক, বর্তমান প্রভৃতি পত্রিকা এবং সংবাদপত্রে গল্প প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও কিশোরদের জন্যে লেখালেখি করছেন আনন্দমেলা, কিশোরভারতী, সন্দেশ, ঝালাপালা, হুটোপাটি, চিরকালের ছেলেবেলা, টগবগ, আমপাতা-জামাপাতা ইত্যাদি পত্রিকায়।

প্রকাশিত বইঃ ডাকাতিয়া, হাট্টিমাটিমের ডিম।

অভীক দত্ত

অভীক দত্ত-র বেড়ে ওঠা উত্তর চব্বিশ পরগনার উদ্বাস্তু নগরী অশোকনগরে। পেশায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ‘আদরের নৌকা’ ওয়েবম্যাগের সম্পাদক। মূলত গদ্যকার। গান গাইতে, ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন।

প্রকাশিত বইঃ এক কুড়ি গল্প, কেউ কোথাও যাবে না।